কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান

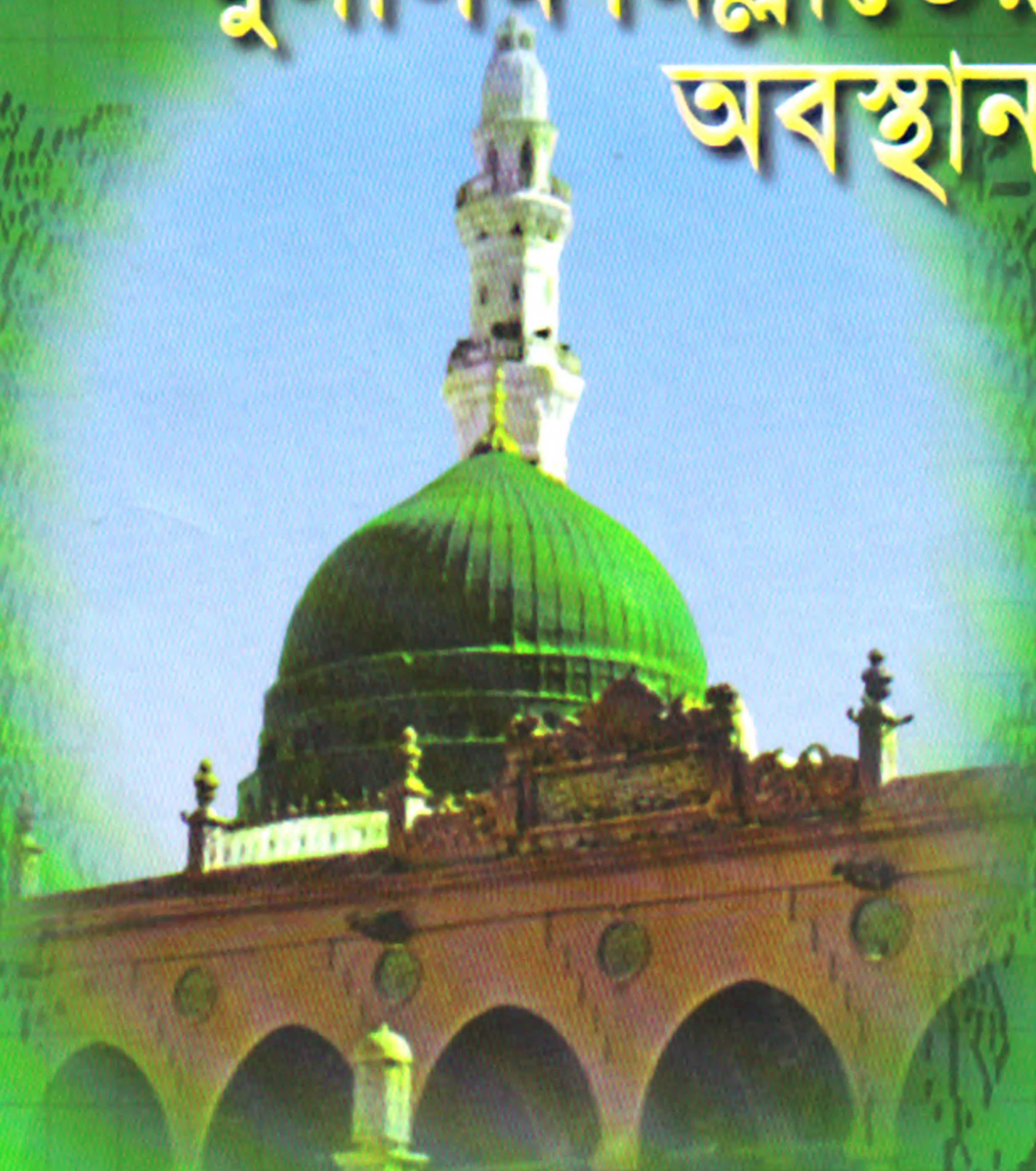

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

কাদিয়ানী ফিতনা
ও
মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান

অনুবাদ ও সংকলন

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশ

কাদিয়ানী ফিতনা
ও
মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান

অনুবাদ ও সংকলন
মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায়
আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত বাংলাদেশ
২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
মুহররম-১৪২০ হিজরী
বৈশাখ-১৪০৬ বাংলা
মে-১৯৯৯ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া
দারুত তানফীয, ফকিরাপুল, ঢাকা।

হাদিয়া ঃ ১০০.০০ (একশ) টাকা মাত্র।

QUADIANY FITNAH : Translated in Bangla, Moulana Mohammad Nurul Islam and Published by International Majlish-e-Tahaffuje Khatme Nobuot Bangladesh, 2/2, Purana Paltan, Dhaka-1000. May1999

জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীর মহাপরিচালক শায়খুল ইসলাম সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেব-এর

দোয়া

ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সার্বজনীন আদর্শ, শান্তি ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস আকীদায়ে খত্‌মে নবুওয়ত অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর সর্বপ্রকার নবুওয়ত এবং ওহীর আগমন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। হুজুর আকরাম (সঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসুল। এ মৌলিক আকীদার উপর পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা উম্মতের প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ। কিন্তু খত্‌মে নবুওয়তকে কেন্দ্র করে ইসলাম বিদ্বেষী মহল তাদের হীন ষড়যন্ত্র হাসিলের লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসে তৎপর হয়ে উঠে। এসব বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান বিধ্বংসী তৎপরতা মূলোৎপাটনের মাধ্যমে নবুওয়ত ও রিসালতের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যুগে যুগে হক্কানী-ওলামায়ে কেরাম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন।

কাদিয়ানীবাদ মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে একটি ভয়ংকর ফিৎনা। সাধারণ মুসলমান সমাজ নানাভাবে এদের চক্রান্তের শিকার। তাই কাদিয়ানীদের হাত থেকে মুসলিম জনসাধারণের ঈমান-আকীদা রক্ষা ও এদের মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করা দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একান্ত কর্তব্য।

আমাদের স্নেহভাজন আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব "কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামক পুস্তকটি অনুবাদ ও সংকলন করেছেন। বইটির মাধ্যমে সর্বসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মহল উপকৃত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দোয়া করি অনুবাদকের কলমকে আল্লাহ্ পাক আরো শক্তিশালী করে দিন। কাদিয়ানী ফিতনার মোকাবেলায় তার শ্রম ও মেহনতকে কবুল করতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের রিজামন্দী হাসিলের তৌফিক এনায়েত করুন। আ-মীন।

বান্দা আহমদ শফী
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১৫ মহররম ১৪২০ হিজরী

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব ও আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর সভাপতি হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব-এর

বাণী

সরদারে দোজাহাঁন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁহার পর কিয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তধারী অথবা শরীয়তবিহীন কোন প্রকারের নবুওয়ত কেহ পাইবে না। পবিত্র কুরআন মজীদ, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খত্‌মে নবুওয়তের আকীদাটি প্রমাণিত হইয়াছে। এই আকীদা সম্বন্ধে গোটা মুসলিম জগতের কোথাও কাহারও মতভেদ নাই। ইহার পরে যে কেহ নবুওয়তের দাবীদার হইয়া আত্ম প্রকাশ করিবে সে আসলে নবী নহে বরং সে হইবে মিথ্যুক ও দজ্জাল। যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে শেষ নবী ও রাসুল স্বীকার করিবে না তাহারা কেহই মুসলমান থাকিবে না বরং তাহারা ধর্মত্যাগী ও মুরতাদরূপে গণ্য হইবে। মুসলিম পরিচয় ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের কোন অধিকার তাহাদের জন্য নাই।

মুসলমানদের অজানা নয় যে রাসুলে পাকের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে ইসলামের শত্রুরা আমাদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস খত্‌মে নবুওয়তের উপর বার বার আঘাত হানিয়াছে এবং বহু ভন্ড নবীর প্রকাশ ঘটিয়াছে। এবং মুসলিম মিল্লাতের পক্ষ থেকে সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ তাদের নির্মূল করে দেওয়া হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, পাক-ভারক উপমহাদেশে খত্‌মে নবুওয়তের আকীদার উপর সর্বশেষ হামলা আসিয়াছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির ছত্রছায়ায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রয় করিয়া সর্বশেষ সে নবী দাবী করিয়া বসে। এই মিথ্যা নবুওয়তের উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে জিহাদী চেতনা ধ্বংস ও ইংরেজ বিরোধী স্বাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করা।

বৃটিশদের এই ফিৎনার মূলোৎপাটন, আকীদায়ে খত্‌মে নবওয়ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভারত উপমহাদেশের সংগ্রামী উলামায়ে কেরাম ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা গোটা দুনিয়ায় আজ

পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্বাকে সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় ভাবে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী তৎকালীন যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে এবং রাবেতা আলমে ইসলামীসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ১৯৭৪ ইং সনে পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণা করে।

পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত আদালতে মামলার রায় ও ফাঁসির হুকুম, কুরআন-হাদিস, যুক্তি-তর্ক, মুসলিম বিশ্বের ওলামাদের ফতোয়া সম্বলিত একটি মৌলিক গ্রন্থ উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানগণ যাহাতে উক্ত বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত হইতে পারেন এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলনা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব "কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামে অনুবাদ ও সংকলন করিয়া জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে দেশ ও জাতিকে সচেতন করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত বাংলাদেশ গঠিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা দেশব্যাপী পুরোদমে খত্মে নবুওয়তের কাজ চালাইয়া যাইতেছি। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। আশাকরি এই বইগুলো দ্বারা কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তিমূলক চক্রান্ত অপনোদনে সহায়ক হইবে।

মাওলানা হাফেজ নূরুল ইসলাম সাহেব প্রচুর শ্রম ব্যয় করিয়া বইখানি অনুবাদ ও সংকলন করিয়াছেন। দোয়াকরি আল্লাহ্ পাক তাঁর শ্রম ও মেহনতকে কবুল করতঃ বইখানি এদেশের মুসলিম জনগণের দ্বীন ঈমান আকীদা হেফাজতের উসিলায় পরিণত করুন। আমিন।

উবায়দুল হক

৬/৫/৯৯ ইং

বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাসিক মদীনা সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের

অভিমত

"কাদিয়ানী ফেতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামক বইটি নতুন ধর্মমত কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে কাদিয়ানী ফেতনার ভয়াবহ বিস্তারের প্রেক্ষিতে মূল উর্দুতে সংকলিত বইটি এদেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়তের এ দেশীয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নূরুল ইসলাম বইটি অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পান্ডুলিপি মোটামুটিভাবে দেখেছি। সব শ্রেণীর লোকের জন্যই অনুবাদ সহজবোধ্য হয়েছে।

কাদিয়ানী মতবাদের আকীদাগত দিকের মতই রাজনৈতিক দিকটাও এক কথায় ভয়াবহ। এই ফেরকাটির সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে। গোড়ার দিক থেকেই এ ফেরকার লোকেরা ইংরেজদের বিশ্বস্ত অনুচররূপে কাজ করেছে। বর্তমানে ওদের সৌহার্দ বিশ্ব-জায়েনবাদের সাথে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের ইসলামী পরিচিতি বিলুপ্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে ইহুদী ষড়যন্ত্রের কথা কারো অজানা নয়; এই ডামাডোল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ কাদিয়ানীরা গ্রহণ করেছে। এরা তাদের রাজনীতি, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, প্রচার-মাধ্যম, শিক্ষাঙ্গণ এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। নতুন উপদ্রব এন.জি.ও. ষড়যন্ত্রের সাথেও এরা তাল ঠুকছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলিম জনগণের শীতল ভূমিকা খুবই উদ্বেগজনক। এ কারণেই দেশের আলেম সমাজ এবং দ্বীনদার বুদ্ধিজীবিগণের দায়িত্ব হবে কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে কাজ করা। আলোচ্য বইটি সেই বাঞ্ছিত প্রয়াসের ক্ষেত্রে নতুন আশাবাদের সঞ্চার করবে বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্ পাক এই শুভ প্রয়াস কবুল করুন। আ-মীন।

মুহিউদ্দীন খান
৫/৫/৯৯ ইং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্বনামধন্য লেখক, কলামিষ্ট ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরীর

বক্তব্য

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ উপমহাদেশে তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য এবং খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদী শিরকী চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে মুসলমানদের তৌহিদী চেতনা ধ্বংস করে দেওয়ার বদ মতলবে এক সময় তাদের অর্থ ও অন্যান্য যাবতীয় সমর্থনপুষ্ট এজেন্ট গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দিয়ে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফরী ফিতনা হিসেবে কাদিয়ানী বা আহমদিয়া ধর্মমতের সৃষ্টি করে এবং গোলাম আহমদকে নবী রূপে দাঁড় করায়। বৃটিশদের উদযোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের ভেতর থেকে শেষ করে দেবার জন্যে, তৌহিদ এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে সরিয়ে হীনবল দাসে রূপান্তরিত করার নোংরা মতলবে খ্রীষ্টীয় শাসকগোষ্ঠী খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে গোলাম আহমদকে নবী বানিয়ে সম্পূর্ণ এক কুফর চালু করে। এই সঙ্গে তারা ইংরেজ ও কুফর বিরোধী জিহাদকে হারাম ঘোষণা করে। তারা শুরু থেকে এ যাবৎকার মুসলিম আকীদাকে ভ্রান্ত বলে ঔদ্ধত্য দেখায়। আল-কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে অস্বীকার করে গোলাম আহমদের কাদিয়ানী ফিতনা কার্যত প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ নবী হওয়ার সত্যকেই বাতিল করার অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় বৃটিশরা, গোলাম আহমদ ও তার কাদিয়ানী কুফরী মতবাদ ব্যর্থ হয়। কেননা ইহুদী নাসারাদের সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারা অতীতে এবং আজও পৃষ্ঠপোষিত কাদিয়ানী বা আহমদীরা সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর এবং তাদের উলামাদের দ্বারা চূড়ান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের আওতাবহির্ভূত। এরা ইসলামের অনুসারী নয়। এরা মুসলিম সমাজে মুসলিম নাম নিয়ে ফিতনা সৃষ্টিকারী। এরা অমুসলিম, কাফির। এদের উদ্ভব, আকীদা- বিশ্বাস, পুস্তক- পুস্তিকা, আচরণ-কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সবকিছু আল- কুরআন, হাদীস- সুন্নাহ এবং উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা বিরোধী।

কাদিয়ানীরা কুরআন-হাদীসে প্রমাণিত খত্‌মে নবুওয়তকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। অথচ আজো বাংলাদেশে এবং বাইরের কোন কোন দেশে তারা মুসলমানদের ঈমান-আকীদায় আঘাত হানছে মুসলমান নাম নিয়ে ভেতর থেকে। তারা এটা করছে ইহুদী- নাসারা আর দেশীয় নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায়। এদের এই বদমাশী অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। জিহাদ করে এদেরকে স্তব্ধ করার কাজ এখন অনস্বীকার্য দাবী। সরকারকে বাধ্য করতে হবে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্যে।

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ- এর পক্ষে ভাই মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মূল উর্দূ থেকে অনুবাদ করে "কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" শীর্ষক যে গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের উপহার দিতে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে তার ঈমানী দ্বায়িত্ব পালনে এবং সময়ের দাবী পূরণে একাগ্রতার স্বাক্ষর বহন করছে। এই বইটি কাদিয়ানী ফিতনা উৎখাতে এবং তৌহিদী জীবন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কোটি কোটি বাংলাভাষী মুসলমানকে উজ্জীবিত করবে বলে আশা রাখি। আল্লাহ সকল প্রশংসার মালিক এবং তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি আমাদের তৌফিক দিন যাতে ভাই নূরুল ইসলাম সহ আমরা সবাই পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে দাখিল হয়ে দ্বীন কায়েমে অগ্রসর হতে পারি। আল্লাহ হাফিজ।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী

২২ মহররম ১৪২০হিজরী
২৬ বৈশাখ ১৪০৬ বাংলা
০৯ মে ১৯৯৯ ঈসায়ী

অনুবাদকের আরজ

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে খাতামুন্নবীয়্যীন সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র ওহীর বার্তাবাহক এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসুলের আগমন ঘটেছে সৃষ্ট এ দুনিয়ায়। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে দ্বীনের পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাই তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁকে Seal of the Prophet বা নবুওয়তের 'সীলমোহর' বলা হয়। পবিত্র কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ "মুহাম্মদ(সঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, তবে তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল ও নবুওয়তের ক্রমধারা খতমকারী বা সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞ।"

একথা পবিত্র কুরআনে শতাধিক আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। কুরআনের সাথে প্রায় দু'শতাধিক বিশুদ্ধ হাদীস আকীদায়ে খত্‌মে নবুওয়তের স্বপক্ষে দলীলরূপে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের এ মৌলিক আকীদার উপর হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন দলমত নির্বিশেষে বিশ্বের সকল উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ খত্‌মে নবুওয়ত আকীদাটি ইসলামের সকল বিষয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এতে কোন সন্দেহ, সংশয়ের অবকাশ নেই। এ আকীদার সাথে কেউ সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করলে তার ঈমান থাকবে না। এটিই শরীয়তের বুনিয়াদী বিষয়। আর নবুওয়তের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এ বুনিয়াদী আকীদাটি হরণ করার জন্য চিরশত্রু ইহুদী-খৃষ্টান অপশক্তি ও তাবৎ খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তিগুলো ভারত উপমহাদেশ থেকে শুরু করে আফ্রিকার প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় চক্রান্ত চালিয়ে আসছে-অত্যন্ত সুক্ষ্ম-কৌশলে। এরই প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে বেশকিছু ভন্ড নবীর। মুসায়লামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদে আনসী থেকে শুরু করে ইংরেজ পোষ্য মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পর্যন্ত এ মিথ্যা নবুওয়তের ধারাবাহিক যাত্রা চলে আসছে।

ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয় যে, সুচতুর ইংরেজ জাতি প্রণীত এক সূদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও সাম্রাজ্যবাদী নীল নকশার আওতায় কাদিয়ানীদের জন্ম। ইসলামের শ্বাশত মূল্যবোধ ও লালিত ঐতিহ্যের ধ্বংস, মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য জাগরণ অগ্রযাত্রা ও জেহাদী অভিযানকে স্তব্ধ করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করাই হচ্ছে এ মতবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভাব প্রবণতা ও সংবেদনশীলতা সম্পর্কে ইংরেজ জাতি আগে থেকেই ছিল সম্যক অবহিত।

এদেশে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও উপনিবেশবাদের কাঠামোকে বিপন্ন করে দেয়ার লক্ষে মুসলমানরা যখন ঈমানী চেতনা, জিহাদী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না নিয়ে গর্জিয়ে উঠল তখন তারা ভাবলো, ইসলামী পুনর্জাগরণের এ দীপ শিখাকে অংকুরে নির্বাপিত করতে না পারলে হয়তো কালক্রমে বিদ্রোহের এ আগুন লেলিহান শিখার রূপ ধারণ করবে। ইসলামী জাগরণকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় চেতনা ও ভাব প্রবনতাকে কাজে লাগানো একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে তারা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য বৃটিশরা মুসলমানদের মধ্য থেকে ইংরেজের বিশ্বস্ত ওয়াফাদার ও ধর্মীয় ব্যক্তি খুজে বের করার জন্য গোটা উপমহাদেশে ব্যাপক জরিপ চালালো। জরিপের ফলাফলে দেখা গেল ইরানের বাহাউল্লাহ্ নামে পরিচিত মির্জা হোসাইন আলী আর ভারতের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজদের এজেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা নস্যাৎ ও গুপ্তচর বৃত্তি পরিচলনার জন্য এ দু মির্জাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে। ইংরেজদের নীল নকশা অনুযায়ী দু'জনই আন্দোলন চালাতে থাকে। বাহাউল্লাহ্ দুঃসাহস দেখিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে বিষোদগার শুরু করে দেয়। সে ঘোষণা করে তার কিতাব দ্বারা কুরআন রহিত হয়ে গেছে এবং সে হলো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়ত রহিতকারী। অতি অল্প সময়ে তার মুখোশ উম্মোচিত হয়ে যায়। জনগণ তাকে মুরতাদ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মির্জা গোলাম কাদিয়ানী প্রাথমিক অবস্থায় তার মনোভাব গোপন রাখে। পর্যায়ক্রমে মুজাদ্দিদ, মাহদী, প্রতিশ্রুত মসীহ, ঝিল্লি নবী, বরুজী নবী, সহায়ক নবী ও সর্বশেষ স্বতন্ত্র পয়গাম্বর দাবী করে স্বরূপে অভির্ভূত হয়। এবং এই ভন্ডামীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখে এভাবে মুসলমানদের সারিতে অবস্থান করে সাম্রাজ্যবাদীদের খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। বৃটিশদের বিশ্বস্ত বরকন্দাজরূপে পরিচয় দেয়। কাদিয়ানী মতবাদ খাতামুন্নবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর শান-মান-ইজ্জত ও মর্যাদার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ, মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে একটি বিষাক্ত কৃপান, একটি বিদ্রোহ।

কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" কিতাবটি কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তিমূলক চক্রান্তের জবাবে কুরআন, হাদীস, যুক্তি-তর্ক, বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া, রাবেতা আল-আলমআল-ইসলমীসহ বিশ্বের ১০৪ দেশের ইসলামী সংগঠনসমূহের সিদ্ধান্ত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সৌদি আরবসহ ইসলামী দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সরকারী সিদ্ধান্ত, আদালতের রায় ও ফাঁসির হুকুম সম্বলিত এক তথ্য নির্ভর তত্ত্বসমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ।

প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থটি উর্দূতে সংকলিত হয়েছে। এতে মির্জা গোলাম কাদিয়ানী লিখিত বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি সহকারে নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদিসহ তার কুচরিত্রের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের এই বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখা অতি ক্ষুদ্র হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কাদিয়ানীরা অত্যন্ত কলা-কৌশলে এ দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" নাম ধারণ করে ধর্মান্তকরণের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত সংগোপনে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের খত্মে নবুওয়ত বিরোধী তৎপরতার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে রিসালত ও নবুওয়তের খোদায়ী বিধানকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের মুলতান প্রদেশের মকতুবায়ে এমদাদিয়া কর্তৃক প্রকাশিত "কাদিয়ানী ফিতনা আওর মিল্লাতে ইসলামীয়া কা মওকফ" নামক উর্দু গ্রন্থখানি "কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজটি এ অধমের হাতে পরিসমাপ্ত হয়েছে বিধায় সর্বাগ্রে জানাই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শুকরিয়া।

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্মে নবুওয়ত বাংলাদেশ এই অমূল্য গ্রন্থখানা প্রকাশ করে জাতির একটি বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থখানা সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয়তার সাথে অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আশাকরি পাঠক মহোদয়গণ এ গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংগঠন, ওলামা, বুদ্ধিজীবী, আদালতের রায় ও রাষ্ট্রসমূহের সরকারী সিদ্ধান্তগুলো জেনে ভন্ড প্রতারক কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের সঠিক স্বরূপ জানতে সক্ষম হবেন এবং এ ব্যাপারে ঈমানী ফরীজাহ আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

পরিশেষে যারা এ গ্রন্থখানা অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছেন, যারা কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ সংশোধনে শ্রম ও মেহনত করেছেন এবং এ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা। কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করছি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে, তিনি এই গ্রন্থখানা কবুল করে মুসলমানদের ঈমান আকীদার হিফাজত করার তাওফিক দান করবেন। এর বদৌলতে হুজুর (সঃ)-এর খাঁটি উম্মত হিসেবে বেঁচে থাকার এবং পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে মৃত্যুবরণ করার এবং আখিরাতে হুজুর(সঃ)-এর শাফাআত নসীব করার উসিলা করবেন। আমীন!

- মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

৫/৫/৯৯ ইং

সূচীপত্র

পাকিস্তানের সংসদে গৃহীত প্রস্তাব ১৩
প্রস্তাব উত্থাপনকারী হিসাবে দস্তখত প্রদানকারীদের নাম ১৪
মির্জা গোলাম আহমদের ক্রমান্বয়ে দাবীর পরিবর্তন ১৮
মির্জা গোলাম আহমদের সর্বশেষ আক্বীদা-বিশ্বাস ২০
শরীয়তবিহীন নবীর কাহিনী ২০
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শরীয়তসহ নবী হওয়ার দাবী ২১
খতমে নবুওয়ত এ কোন প্রকারভেদ নেই ২৩
জিল্লী ও বুরুযী নবুওয়তের অলীক দাবী ২৭
মির্জা গোলাম আহমদের নবী করীম(সঃ)-হওয়ার দাবী ২৭
মির্জা গোলাম আহমদের পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী .. ২৮
কাদিয়ানীরা নবী করীম (সঃ)-কে খাতামুন নাবীঈন মানে কি? ৩০
নবী করীম (সঃ)-এর চাইতেও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ? ৩১
যে কোন লোক নবী করীম (সঃ)-এর চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে ৩৩
কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়া সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী ৩৫
কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক আলাদা মিল্লাত বলেই বিশ্বাস করে ৩৭
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য ৩৭
কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের ফতোয়া ৪০
দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ আহমদের ফতোয়া ৪০
মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্য ৪১
মুহাম্মদ আলী লাহোরীর কথা ৪২
মুসলমানদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ৪৩
অ-আহমদীর পিছনে নামায ও তাদের সাথে বিয়ে ৪৩
অ-আহমদীদের জানাযার নামায ৪৪
কায়েদে আযমের জানাযার নামায ৪৫
কাদিয়ানীরা নিজেরাই নিজেদেরকে পৃথক সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী করেছে ৪৬
মির্জায়ী বর্ণনা সম্পর্কে এক জরুরী সতর্কতা ৪৭
লাহোরী জামাতের পরিচয় ৪৯
লাহোরী জামাতের কাফের হওয়ার কারণ ৫৩
এক নজরে গোলাম আহমদের নবুওয়ত আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে .. ৫৪
মির্জার ওহী কোরআনের বরাবর ৫৫
নবী রাসূলদের সাথে দুর্ব্যবহার ৫৫
নবী করীম (সঃ)–এর সাথে দূর্বিনীত আচরণ ৫৮
সাহাবাদের প্রতি দুরাচরণ ৫৯
নবী-পরিবারের প্রতি অসদাচরণ ৬০
ইসলামী শিআ'রের অমর্যাদা ৬১
গোলাম আহমদের ইলহাম ৬৫
মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ৬৫
মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহ ৬৫
আথমের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ৬৮
কাদিয়ানে মাতম(আহাজারী) ৬৮
মুসলমানদের প্রতি গালাগাল ৭১
মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত ৭১
ফতোয়া ৭২
পাকিস্তানের ৩৩ জন আলেম কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের দাবী ৭৩
রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রস্তাব ৭৪

আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত ৭৬
পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের রায় ৮৪
কিছু কাদিয়ানী বিভ্রান্তি কয়েকটি সন্দেহের সমাধান ৮৬
কলেমা উচ্চারণকারীকে কাফের বলা প্রসঙ্গে.................................... ৮৬
দুটি রেওয়ায়েত ৯৩
কোরআনে করীমের একটি আয়াত ৯৮
কোন কোন সূফীদের ভ্রান্ত উদ্ধৃতি ১০০
দ্বীন সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের উক্তির তাৎপর্য ১০০
কাদিয়ানী ধর্মে পূর্ববর্তী মনীষী বাক্যের গুরুত্ব ১০১
সূফী মনীষীবৃন্দের পন্থা ১০২
মোজাদ্দেদে আলফে সানীর (রাহঃ) ভাষ্যে মির্জার স্পষ্ট বিকৃতি ১০৪
মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) ১০৬
শায়েখ ইবনে আরবী ও শায়খ শা'রানী ১০৬
রাজনৈতিক পটভূমি ১০৭
অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ ও ইউরোপীয় সম্প্রসার ১০৮
ইংরেজ ও উপমহাদেশ ১০৯
মির্জা সাহেবের উত্থানামল ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ১১০
একজন সহচর নবীর প্রয়োজনীয়তা ১১১
কাদিয়ানীদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য ১১৮
ইসলামী জেহাদ বাতিল কিন্তু কাদিয়ানী জেহাদ বৈধ ১২৩
মির্জা গোলাম আহমদ ও কাদিয়ানীদের তবলীগী তৎপরতার তাৎপর্য ১২৫
রচনা সম্ভার ১২৮
কাদিয়ানীবাদ ও মুসলিম বিশ্ব ১২৮
ইরাক ও বাগদাদ ১২৯
ইরাক বিজয়ের পর প্রথম কাদিয়ানী গভর্ণর ১৩০
ফিলিস্তিন সমস্যা ও ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৩১
ইসরাঈলী মিশন ১৩৫
ইহুদীবাদ ও কাদিয়ানী মতবাদের পারস্পরিক সম্পৃক্তি ১৩৮
উসমানীয় খেলাফত ও তুর্কী ১৪১
আফগানিস্তান ১৪৩
কাবুল যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্যে মির্জায়ীদের ভূমিকা ১৪৪
আফ্রীকীয় রাষ্ট্রসমূহে সাম্রাজ্যবাদী ও জায়নবাদী তৎপরতা ১৪৪
আফ্রিকায় জায়নবাদী ইহুদীদের সুসজ্জিত সেনাদল ১৪৭
লক্ষ কোটি টাকার পুঁজি ১৪৮
উপমহাদেশে মুসলমানদের উন্নয়ন ও কল্যাণকামী সংগঠনসমূহ বনাম কাদিয়ানীদের তৎপরতা ১৪৯
অখণ্ড ভারত হিন্দু এবং কাদিয়ানী উভয়েরই পারস্পরিক দায়বদ্ধতার অনুভূতি ১৫৩
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার কারণ ১৫৬
ভারত বিভাগের বিরোধী মুসলমান ১৫৭
ভ্যাটিকান ষ্টেটের আবদার এবং পাকিস্তানেরসীমানা নির্ধারণে বিশ্বাসঘাতকতা ১৬০
রাজনৈতিক অভিলাষ ও রাষ্ট্রবিরোধী পরিকল্পনা ১৬৪
ধর্মীয় নয় নিরেট রাজনৈতিক সংগঠন ১৬৫
পাকিস্তানে কাদিয়ানী রাজ্যের পরিকল্পনা ১৬৬
সমস্ত বিভাগ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদসমূহ দখল করার পরিকল্পনা ১৬৯
সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থা ১৭১
বেলুচিস্তান অধিকারের পরিকল্পনা ১৭২
জম্মু ও কাশ্মীর ১৭৩
১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ ও ফোরকান বেটালিয়ান ১৭৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আয়াতে কুরআন-এর অনুবাদ

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথবা বলে, "আমার নিকট ওহী আসে। অথচ তার নিকট মোটেই কোন ওহী পাঠানো হয়না।" - (সূরা আনআম, আয়াত-৯৩)।

হাদীসে রাসুল-এর অনুবাদ

"আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমি হলাম খাতামুন নাবীঈন—আমার পর কোন নবী আসবে না বা আমার পর কোন ব্যক্তি নবী হবে না।" - (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪, ফিতনা অধ্যায়, তিরমিজী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৫, ফিতনা অধ্যায়)।

ডক্টর ইকবালের ফরিয়াদ

আমার মতে প্রশাসনের জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হলো কাদিয়ানীদের একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে মেনে নেওয়া। সেটাই কাদিয়ানীদের স্বাতন্ত্র্য ও বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হবে। আর মুসলমানরা তাদের সাথে ঠিক সেইরূপ আচরণই করবে, যেমনটা তারা অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে করে থাকে। - (আল্লামা ডক্টর ইকবাল, হরফে ইকবাল, ১১৮ পৃঃ, লাহোর সংস্করণ)।

ইসলামী উম্মাহ্র পুরোপুরিভাবেই এ অধিকার রয়েছে যে, তারা দাবী করতে পারে, কাদিয়ানীদের পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী বলে ঘোষণা করা হোক! যদি প্রশাসন এ দাবী পূরণ না করে তাহলে সাধারণ মুসলমানের মনে সরকারের সদিচ্ছার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সনে শিখদের ভিন্ন সম্প্রদায় হিসাবে মেনে নিতে কোন দাবীর অপেক্ষা করেননি। এখন তারা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে দাবী উত্থাপনের অপেক্ষা কেন করছেন? - (হরফে ইকবাল)।

মির্জা গোলাম আহমদের পুত্র মির্জা বশীর আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য

মসীহ মাওউদ (অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)-এর দাবী, তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে আদিষ্ট ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে কথাবার্তা বলে থাকেন—দুটো পরস্পর বিপরীত অবস্থার যে কোন একটিকে আবশ্যিক করে। এক, হয়তো তিনি তাঁর দাবীতে মিথ্যুক (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে নিছক মিথ্যা কথা বলছেন। তাহলে তিনি শুধু কাফেরই নন, বরং অনেক বড় কাফের। অথবা মসীহ মাওউদ তার ওহীর দাবীতে সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তাআলা সত্যই তার সাথে কথা বলেছেন। তাহলে তাঁকে অস্বীকারকারীদের উপর কুফরের

বিধান নিপতিত হবে। এখন তোমাদের ইচ্ছা, হয় মসীহ্ মাওউদের অস্বীকারকারীদের মুসলমান বলবে এবং মসীহ্ মাওউদকে বলবে কাফের, নতুবা মসীহ্ মাওউদকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তার অস্বীকারকারীদের বলবে কাফের। তোমরা এ উভয় দলকে মুসলমান বলবে-তা কখনোই সম্ভব নয়। - ("কালিমাতুল ফাসল" বা সুস্পষ্ট বিধান, কৃত-মির্জা বশীর আহমদ, পৃঃ ১২৩)।

কাদিয়ানীদের লাহোরী জামাতের নেতা মুহাম্মদ আলী লাহোরী-এর একটি কথা ঃ আহমদীয়া আন্দোলন ইসলামের সাথে ঠিক সেই ধরনের সম্পর্ক রাখে যেমনটা খৃষ্টানদের সাথে ইয়াহুদীদের সম্পর্ক।

- (রাওয়ালপিন্ডির আলোচনা হতে উৎকলিত, পৃঃ ২৪০)।

পাকিস্তানের সংসদে গৃহীত প্রস্তাব

মাননীয় স্পীকার

পাকিস্তান জাতীয় সংসদ

আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সংসদে উথাপনের অনুমতি চাইছি।

যেহেতু এটি একটি পূর্ণ স্বীকৃত বিষয় যে, কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে, তার এ মিথ্যা দাবী কুরআন পাকের বহু আয়াতকে অস্বীকার এবং জিহাদকে মানসুখ বা রহিত ঘোষণা করার প্রচেষ্টা ছিল ইসলামের বহু হুকুম আহকামের বিপরীতে সুস্পষ্ট গাদ্দারী; তার 'নবুওয়ত' ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে সৃষ্ট, আর তাদের (ইংরেজদের) একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করা এবং ইসলামকে অস্বীকার করা;

এবং যেহেতু মুসলিম জাতির প্রতিটি ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত যে, মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারী, সে মির্জা গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস রাখুক বা তাকে নিজের জন্যে সংশোধনকারী বা ধর্মীয় পথ প্রদর্শক যাই মনে করুন না কেন, তারা ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত এবং তার অনুসারীদের যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থাকে এবং ইসলামের এক উপদল হওয়ার বাহানা করে আভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্যভাবে ইসলামের ক্ষতিসাধনে তৎপর রয়েছে। বিশ্বের মুসলিম সংস্থাগুলোর এক কনফারেন্স, যা রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর পরিচালনায় পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ১৯৭৪ সনের ৬ হতে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ এ সম্মেলনে, যাতে বিশ্বের সকল প্রান্ত হতে ১৪৪টি মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন, সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাদিয়ানী

ধর্মমত ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বের বিপরীতে একটি ধ্বংসকর আন্দোলন, যা নিজেদের ইসলামী উপদল হিসাবে মিথ্যা দাবী করে। তাই এ সংসদের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা প্রদান করা হোক যে, মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারী–তাদের যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তারা মুসলমান নয়। সেই সাথে এই জাতীয় সংসদে এই মর্মে সরকারী বিল উত্থাপন করা হোক, যেন এই ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্যে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের এক সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায় হিসাবে কাদিয়ানীদের প্রাপ্য সকল বৈধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে জরুরী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইনমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়।

প্রস্তাব উত্থাপনকারী হিসাবে দস্তখত প্রদানকারীদের নাম

১. মাওলানা মুফতী মাহমুদ
২. মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আল আযহারী
৩. মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী সিদ্দীকী
৪. অধ্যাপক গফুর আহমদ
৫. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী রেজভী
৬. মাওলানা আব্দুল হক (আকোড়াখটক)
৭. চৌধুরী জহুর এলাহী
৮. সর্দার শেরবাজ খান মাযারী
৯. মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী
১০. আব্দুল হামিদ জতুই
১১. সাহেবজাদা আহমদ রেজা খান কাসুরী
১২. মাহমুদ আ'জম ফারুকী
১৩. মাওলানা সদরুশ শহীদ
১৪. মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ
১৫. উমরা খান
১৬. মাখদুম নূর মুহাম্মদ
১৭. গোলাম ফারুক
১৮. সর্দার মাওলা বখশ সোমরু
১৯. সর্দার শওকত হায়াত খান
২০. আলহাজ্ব আলী আহমদ তালপুর
২১. রাও খুরশিদ আলী খান
২২. রঈস আতা মুহাম্মদ খান মারী

পরবর্তীতে নিম্নোক্ত সদস্যগণও তাতে স্বাক্ষর করেন-

২৩. নওয়াবজাদা মিয়া মুহাম্মদ জাকের কোরায়শী
২৪. গোলাম হাসান খান ধান্দলা
২৫. করমবখশ আওয়ান
২৬. সাহেবজাদা মুহাম্মদ নজির সুলতান
২৭. মোহর গোলাম হায়দর ভরোয়ানা
২৮. মিয়া মুহাম্মদ ইবরাহিম বরক্
২৯. সাহেবজাদা সফিউল্লাহ্ খান শানোয়ারী
৩০. সাহেবজাদা নিয়ামতুল্লাহ্
৩১. মালিক জাহাঙ্গীর খান
৩২. আব্দুস সোবহান খান
৩৩. আকবর খান মাহমন্দ
৩৪. মেজর জেনারেল (অব) জামালদার
৩৫. আলহাজ্ব সালেহ খান
৩৬. আব্দুল মালিক খান
৩৭. খাজা জামাল মুহাম্মদ কোরিজা

তাওহীদ ও আখেরাত ব্যতীত বিশ্বাস যে ইসলামের ভিত্তি মৌলিক আকীদার উপর নির্ভরশীল, সে আকিদাটি হল-আখেরী নবী হজরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর উপর নবুওয়ত ও রিসালতের পবিত্র ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাঁর পরে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারের নবী হতে পারবে না; এবং তাঁর পরে কোন ব্যক্তির উপর ওহিও আসবে না। আর এমন কোন এলহামও আসবে না, যা ইসলাম ধর্মের জন্য দলীল

হিসেবে পেশ হতে পারে। ইসলামের এ আকীদাকে খতমে নবুওয়তের আকীদা বলা হয়, হুজুর (সঃ) হতে আজ পর্যন্ত উম্মতের সর্বস্তরের লোক কোন মত বিরোধ ছাড়াই এ আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং হুজুর (সঃ)-এর অনেক হাদীস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে সর্বস্বীকৃত এবং এ বিষয়ের উপর অগণিত কিতাবাদি প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে ঐ সকল আয়াত এবং হাদীস সমূহ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, তবে যে বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন সেটা হল এই যে, হুজুর (সঃ) খতমে নবুওয়তের আকীদার উপর অনেক বর্ণনা দান করার সাথে সাথে কিছু ভবিষ্যদ্বাবাণীও উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন, "ঐ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন দাজ্জাল, কাজ্জাব সৃষ্টি না হবে । যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার দাবী করবে।" - (বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃঃ ফিতনা অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মুসলিম শরীফ ৩৯৭ পৃঃ ফিতনা অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড)

"অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমি খাতামুন্‌নাবীঈন, আমার পর আর কোন নবী নেই"। - (আবু দাউদ ২য় খণ্ড 'ফিতনা অধ্যায়, ২৩৮ পৃঃ, তিরমিজী, ২য় খণ্ড 'ফিতনা অধ্যায়, ৪৫ পৃঃ)

এ দুটো হাদীসে নবী করীম (সঃ) ভন্ড নবীদের উদ্দেশ্যে 'দাজ্জাল' ও 'কাজ্জাব' শব্দ দুটো ব্যবহার করেছেন। শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে চরম ধোঁকাবাজ' ও 'ডাহা মিথ্যুক'। এ শব্দ দুটোর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর উম্মতকে এই বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন যে, তাঁর পর যেসব ব্যক্তি নবুওয়তের দাবীদার হবে তারা প্রকাশ্যভাবে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরিবর্তে ধোঁকা ও মিথ্যার আশ্রয় নেবে। তাই, নিজেদেরকে তারা মুসলমান বলবে আর সেই সাথে নবী হওয়ার প্রচার-প্রচারণা চালাবে। তারা ইসলামের সর্বস্বীকৃত আক্বীদা বিশ্বাসে এমন সব ব্যাখ্যা বিবৃতি দিতে থাকবে যার দ্বারা কিছু অনবহিত লোককে তারা বিভ্রান্তিতে ফেলতে সক্ষম হবে। তাদের এ ধোঁকা-প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে উম্মতের সবাইকে হুজুর (সাঃ)-এর এ কথা মনে রাখতে হবে যে, "আমি হলাম 'খাতামুন নাবীঈন'। আর এর অর্থই হচ্ছে, 'আমি শেষ নবী আমার পর আর কোন নবী আসবে না।"

নবী করীম (সঃ)-এর এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে। দেখা গেছে, ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করেছে,

তাদের সকলেই ধোঁকা দিয়ে নবুওয়তের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা চালিয়েছে। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদী কুরআনের বহুবিধ আয়াত ও নবী করীম (সঃ)-এর অসংখ্য হাদীস মারফত এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছে, তাই যখনই কোন লোক নবুওয়তের মিথ্যা দাবীর দ্বারা এ আক্বীদা বিশ্বাসে চিড় ধরাবার চেষ্টা করেছে, তখনই উম্মতের সকলে একমত হয়ে তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে চিহ্নিত করেছে। তাই সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে যে কোন ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী আদালতে কোন মিথ্যুক ভন্ড নবীর বিষয় উত্থাপিত হলে কেউ এ বিষয়টিতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা করেননি। নবী দাবী করার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ আছে কিনা, তার তত্ত্ব-তালাশ নেবার কোনই প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং নবী দাবী করার কারণেই তাকে 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কাফের ও মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা আবশ্যক তাদের সাথেও সেই আচরণই করা হয়েছে। সে মুসায়লামা কাজ্জাব হোক বা আসওয়াদে আনাসী হোক, সাজাহ বা তুলায়হা বা হারেছ হোক বা অন্য কেউ।

নবী দাবী করার প্রেক্ষিতে কোন দলীল-প্রমাণ বা ব্যাখ্যা বিবৃতির অপেক্ষা না করে তাদের কাফের ও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর কারণ, খতমে নবুওয়তের আক্বীদাটি এতই স্পষ্ট ও প্রামাণ্য- প্রকাশ্য যে, তাতে কোন রকম অপব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আর এই আক্বীদাটিতে কারো কোন মতপার্থক্যও নেই। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে কেউ এতে নতুন কোন ব্যাখ্যা-বিবৃতি প্রদান করবে তা হবে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা, নবী করীম (সঃ) স্বয়ং এ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গেছেন।

যদি এই ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তা যত নিম্নস্তরেরই হোক, মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাওহীদের আক্বীদাও যথাযথ থাকবেনা এবং আখেরাতের আক্বীদা বা অন্য কোন মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসও বহাল থাকবে না। যেমন কেউ হয়তো 'খতমে নবুওয়ত' সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করতে শুরু করলো যে, শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবীর আগমন বন্ধ হলেও শরীয়তবিহীন নবীর আগমন ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাহলে তার এ কথা ঠিক এমন হবে, যেমন কেউ বললো, তাওহীদের আক্বীদা বিশ্বাস অনুযায়ী বড় খোদা তো একজনই, তবে ছোট ছোট মাবুদ আর দেবতা অনেক হতে পারে, যাদের ইবাদত করা যাবে। তাওহীদের আক্বীদা-বিশ্বাস এতই সুস্পষ্ট যে তাতে এ ধরনের অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। তেমনিভাবে খতমে নবুওয়তের মাঝেও এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফাঁক ফোকর নেই। তা না হলে এসব ব্যাখ্যা

বিবৃতিকে ইসলামের আওতায় মেনে নিলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, ইসলামের নিজস্ব কোন আক্বীদা-বিশ্বাস নেই, নিজস্ব বিধি-বিধানের কোন গন্ডি নেই এবং চারিত্রিক কোন পরিসীমা নেই। বরং ইসলাম যেন ইলাষ্টিকের টুপি, যে কোন ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাসের ধারক ব্যক্তিও এটা পরিধান করতে পারবে এবং পরিধান করার পর এটা তার মাথার সাইজে রূপ নিবে। অথচ ইসলাম কখনোই এমন নয়।

তাই, নবী করীম (সঃ)-এর অনুসারী এই উম্মত কুরআনের অকাট্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রশাসনিক নীতিমালা,আদালতের ফয়সালা এবং সম্মিলিত ফতোয়ায় এই নীতিতে আমল করেছেন যে, নবী করীম(সঃ)-এর পর যে কোন লোক নবুওয়তের দাবী করেছে, সে মুসায়লামা কাজ্জাবের ন্যায় মুসলমান পরিচয়ধারী হোক, তাকে এবং তার অনুসারীদের কাফের বলে ঘোষণা করেছে, তাতে কোন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে 'খতমে নবুওয়তের' প্রকাশ্য বিরোধিতা করুক বা মুসায়লামার মত বলুক যে, নবী করীম (সঃ)-এর পর ছোট ছোট নবী আসতে পারে, অথবা সাজাহ্-এর ন্যায় বলুক যে, পুরুষদের নবী হওয়া শেষ হয়েছে, তবে মহিলারা এখনো নবী হতে পারে। অথবা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ন্যায় এ কথা বলুক যে, শরীয়তবিহীন ছায়া নবী, বুরুজী নবী ও উম্মতী নবী হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম – কুরআন, হাদীস ও ইজমার অকাট্য দলীল দ্বারা এ কথাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ)-এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবেনা, এ বিষয়টিতে কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ নেই।

এখন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিম্নোক্ত দাবীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন –

(১) সত্যি খোদা তিনিই যিনি কাদিয়ানে তার রাসুল পাঠিয়েছেন।
- (দাফেউল বালা, ১১ পৃঃ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৬)

(২) আমি রাসুল এবং নবী; অর্থাৎ পূর্ণ ছায়াস্বরূপ। আমি ঐ আয়না, যাতে মুহাম্মদী আকৃতি এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। - (নুযূলে মসীহ, ৩য় পৃঃ, ১ম সংস্করণ)

(৩) আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম 'নবী' রেখেছেন। - (হাকীকাতুল ওহি ৬৮ পৃঃ ১৯৩৪)

(৪) আমি যখন এ সময় পর্যন্ত দেড় শতের কাছাকাছি ভবিষ্যদ্বাণী খোদার নিকট থেকে লাভ করে সেগুলো নিজে প্রত্যক্ষ করারও সুযোগ পেয়েছি, এগুলো পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তখন

আমি নিজের সম্পর্কে নবী বা রসুল হওয়া কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? আর যখন স্বয়ং খোদা তা'আলা আমার নাম রেখেছেন নবী, তখন আমি কি করে তা প্রত্যাখ্যান করবো এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবো? - (এক গলতীকা এযালাহ, ৮ম পৃঃ ১৯০১)।

(৫) আল্লাহ্ তাআ'লা আমার মাঝে সকল নবীকে প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবীর নাম আমারই দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আমিই আদম, আমিই শীস, আমিই নূহ্, আমিই ইব্রাহীম, আমিই ইসহাক, আমিই ইসমাঈল, আমিই ইয়াকুব, আমিই ইউসুফ, আমিই ঈসা, আমিই মুসা, আমিই দাউদ, আর মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নামের পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ ছায়ারূপে আমিই মুহাম্মদ ও আহ্মদ। - (হাকীকাতুল ওহী, টীকা ঃ ৭২, পৃ ঃ ১৯৩৪)।

(৬) ক'দিন হলো, আমার এক অনুসারীকে বিপক্ষ দলের এক ব্যক্তি আপত্তি হিসাবে জানালো যে, তোমরা যার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছো সে নিজেকে নবী এবং রাসূল বলে দাবী করে। এর জবাব নেতিবাচক শব্দের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ আমার অনুসারী তার জবাবে 'না' বলেছে)। অথচ এ উত্তর মোটেই ঠিক নয়। সত্য কথা তো এই যে, খোদা তাআ'লার পবিত্র ওহী যা আমার নিকট নাযিল করা হয়েছে তার মাঝে রাসূল, মুরসাল ও নবী—এই ধরনের শব্দ রয়েছে, একবার দু 'বার নয়, বরং শত শত বার। তাহলে এ (নেতিবাচক) উত্তর কি করে শুদ্ধ ও সঠিক হতে পারে? - (এক গলতি কা এযালাহ, ১ম পৃঃ ১৯০২ ও ১৯৩৪)।

(৭) আমার দাবী হচ্ছে এই যে, আমি রাসূল এবং নবী। - (দ্রষ্টব্য- হাকীকাতুন নবুওয়ত, মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ প্রণীত, ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

(৮) নবী যদিও অনেক এসেছেন, কিন্তু আমি পরিচিতিতে কারো চাইতে কম নই। - (নুযুলে মসীহ, ৯৭ পৃঃ ১ম মুদ্রণ)

এ সবই তার দাবী-দাওয়ার সামান্য নমুনা; নয়তো তার লেখা বইগুলো এ ধরনের দাবীর বহরে ভরপুর।

মির্জা গোলাম আহমদের ক্রমান্বয়ে দাবীর পরিবর্তন ঃ

কোন কোন সময় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা মুসলমানদের বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্যে তার প্রথম যুগের লেখা বই পুস্তকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে; যে লেখাগুলোতে তিনি যে কোনভাবে নবী দাবী করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কিন্তু গোলাম আহমদ স্বয়ং এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, সে মুজাদ্দিদ (নবায়ণকারী), মুহাদ্দাছ (পূর্ব আলোচিত) মসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা)

এবং মাহদীর স্তর পার হয়ে ধাপে ধাপে উন্নতি করে নবীর পদ মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। সে তার দাবীর যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে, তা আমরা বিস্তারিতভাবে তারই ভাষায় বর্ণনা করছি। তাহলে পূর্বাপর লক্ষ্য রেখে তার মর্মার্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হবে।

এক ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমদের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন, "আপনার বিভিন্ন বর্ণনায় বৈপরীত্য দেখা যায়। কোথাও আপনি নিজেকে 'নবী নই' লিখেছেন, আবার কোথাও নিজেকে মসীহ (ঈসা আঃ) হতে সবদিক থেকে উত্তম" বলেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মির্জা গোলাম আহমদ তার 'হাকীকাতুল ওহী' নামক বইটিতে লিখেছে -

"এ বিষয়টি গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করে দেখো, এটা এমন ধরনের বৈপরীত্য, যেমন আমি "বারাহীনে আহমদিয়া" বইটিতে উল্লেখ করেছিলাম যে, মরিয়ম তনয় ঈসা আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। কিন্তু আমিই পরে লিখেছি যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমি স্বয়ং। এই বৈপরীত্যের কারণ এটাই যে, যদিও খোদা তা'আলা বারাহীনে আহমদীয়াতে আমার নাম ঈসা রেখেছেন এবং একথাও এরশাদ করেছেন যে, তোমার আগমন সংবাদ খোদা এবং রাসুল (মুহাম্মদ সঃ) দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু একদল মুসলমান এ বিশ্বাসে স্থির ছিলেন এবং আমারও এ বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, সেজন্যে আমি খোদা তা'আলার এই ওহীকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে চাইনি, বরং এই ওহীতে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছি এবং আমার আক্বীদা-বিশ্বাসও তাই রেখেছি যা সাধারণ মুসলসমানদের মাঝে ছিল এবং "বারাহীনে আহমদীয়া"তে আমি সেটিকেই প্রকাশ করেছি।

কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়ে ওহী আসতে থাকে বৃষ্টির মত। বলা হলো, মসীহ মাওউদ যিনি আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তুমিই সেই ঈসা মসীহ। সেই সাথে শত শত নিদর্শন প্রকাশ পেল এবং আকাশ ও পৃথিবী এ উভয় সৃষ্টি আমার সত্যায়নে দাঁড়িয়ে গেল এবং খোদা তাআলার উজ্জ্বল নিদর্শন আমার মাঝে স্থান করে আমাকে মজবুতীর সাথে এ বিশ্বাসে নিয়ে এলো যে, শেষ যুগে পৃথিবীতে আগমনকারী ঈসা মসীহ আমিই স্বয়ং। তা না হলে আমার তো বিশ্বাস তাই ছিল যা আমি 'বারাহীনে আহমদিয়া'তে লিখেছি।

প্রথম প্রথম আমার আক্বীদা-বিশ্বাস এটাই ছিল যে, আমার কি মরিয়ম তনয় ঈসার সাথে কোন তুলনা চলে? তিনি নবী এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত সম্মানী ব্যক্তি। আর আমার যদি কোন শ্রেষ্ঠত্বের দিক প্রকাশ পেত, তাহলে আমি সেটাকে আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব বলে মেনে

নিতাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমার উপর বৃষ্টি ধারার মত যে ওহী আসতে থাকে তা আমাকে এই আক্বীদার উপর স্থির থাকতে দেয়নি। আমাকে সুস্পষ্টভাবে নবীর খেতাব প্রদান করা হলো কিন্তু তা এভাবে যে একদিকে নবী এবং অন্যদিকে উম্মতী। আমি তার পবিত্র ওহীতে ঠিক তেমনিভাবে ঈমান রাখি যেমনিভাবে খোদাতাআলার সকল ওহীর উপর ঈমান রাখি যেগুলো পূর্বে নাজিল করা হয়েছে। আমি তো খোদাতাআলার ওহীর অনুসরণ করছি। যে পর্যন্ত আমার ওহী মারফত নতুন কোন জ্ঞানলাভ না হয়েছে আমি তাই বলে চলেছি যা প্রথম জীবনে বলে এসেছি। আর যখনই ওহী মারফত খোদার পক্ষ হতে নতুন কোন জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি, তখন পূর্বের কথার বিপরীত বলেছি। - (হাকীকাতুল ওহী, ১৪৯ ও ১৫০ পৃঃ)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ উদ্ধৃতাংশ নিজ দাবীর স্বপক্ষে এতই সুস্পষ্ট যে, তাতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামান্য প্রয়োজনও নেই। এ কথাগুলোর পর যদি কোন লোক তার সে সময়কার লেখা দেখায় যে সময় সে নবী দাবী করে নাই এবং তার ধারণা মত যখন সে নবী হওয়ার ঐশীজ্ঞান লাভ করেনি, তাহলে তাকে ধোকা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?

মির্জা গোলাম আহমদের সর্বশেষ আক্বীদা-বিশ্বাস ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সর্বশেষ আক্বীদা, যে আক্বীদার উপর তার মৃত্যু হয়েছে তা এটাই ছিল যে, সে নবী। তাই সে তার সর্বশেষ লেখা চিঠি, যা ঠিক তার মৃত্যুর দিনটিতে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে লিখেছে -

"আমি খোদা তাআলার আদেশ অনুযায়ী একজন নবী। যদি আমি তা অস্বীকার করি তাহলে আমার গোনাহ হবে। আর খোদা যখন আমার নাম 'নবী' রেখেছেন তখন আমি তা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্তই এ বিশ্বাসে স্থির থাকবো"।

- (হাকীকাতুন নবুওয়ত, পৃঃ ২৭১, রাওয়ালপিন্ডি আলোচনা, পৃঃ ১৩৬)

এই চিঠিটি লেখা হয়েছে ১৯০৮ সনের ২৩শে মে এবং ২৬শে মে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেদিনই গোলাম আহমদের মৃত্যু ঘটে।

শরীয়তবিহীন নবীর কাহিনী ঃ

কখনো কখনো কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গোলাম আহমদ শরীয়তবিহীন নবুওয়তের দাবী করেছেন আর শরীয়তবিহীন নবুওয়তের দাবী করা খত্মে নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু তাদের

অন্যান্য অপব্যাখ্যার ন্যায় এই অপব্যাখ্যারও সকল কথা ভুল ও অসত্য। প্রথমতঃ একথাই ঠিক নয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ শুধুমাত্র শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার দাবী করেছে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শরীয়তসহ নবী হওয়ার দাবী ঃ

বাস্তব অবস্থা হলো এই উত্তরোত্তর দাবী করতে করতে মির্জা গোলাম আহমদ এক পর্যায়ে শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার দাবীকেও অতিক্রম করে। সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের কাছে আগত 'ওহী' এবং 'নবুওয়ত'কে 'শরীয়তযুক্ত' বলে ঘোষণা দেয়। সে জন্যেই তার অনুসারীদের মাঝে জহীরুদ্দীন আরোপীর উপদলটি তাকে প্রকাশ্যভাবে শরীয়তযুক্ত নবী বলে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে মির্জা গোলাম আহমদের বেশ কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে।

'আরবাঈন' নামক পুস্তকে সে লিখেছে, এছাড়া একথাটাও বুঝো যে, শরীয়ত কাকে বলে? যিনি তার নিকট প্রেরিত ওহীর দ্বারা কিছু আদেশ ও নিষেধ প্রকাশ করেন এবং নিজ উম্মতের জন্যে এক সুনির্দিষ্ট আইনমালা নির্ধারণ করেন তিনিই 'শরীয়তবাহী' হন। তাহলে এই সংজ্ঞার আলোকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয় অপরাধী। কেননা, আমার ওহীতে আদেশও রয়েছে, নিষেধও রয়েছে, যেমন, আমার নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ

আপনি মুমেনদের উদ্দেশ্যে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নামিয়ে রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিক পবিত্র বিধান, এটি 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে আদেশও রয়েছে এবং নিষেধও রয়েছে। আর এ ওহীতে তেইশ বছরের নবী জীবনও অতিক্রান্ত হয়েছে। এভাবেই আজ পর্যন্ত আমার কাছে যে ওহী আসছে তাতে আদেশও রয়েছে, নিষেধও রয়েছে। আর যদি বলো যে, শরীয়ত দ্বারা ঐ শরীয়ত উদ্দেশ্য যার মাঝে নতুন বিধি বিধান থাকবে, তা তো ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

'নিশ্চয় এ বিষয়টি পূর্ববর্তী গ্রন্থ ইবরাহীম ও মুসার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে'। অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষা তাওরাতেও বিদ্যমান। আর যদি একথা বলো যে, শরীয়ত হচ্ছে তা যাতে আদেশ-নিষেধের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে তাহলে তাও সঠিক নয়। কেননা, যদি তাওরাত বা কুরআনে পূর্ণভাবে আদেশ-নিষেধের বিবরণ দেওয়া থাকতো, তাহলে তো ইজতিহাদ বা গবেষণার সুযোগ থাকতো না মোটেই"।

- (আরবাঈন, ৪ খণ্ড, ৭ পৃঃ ৪র্থ মুদ্রণ)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে মির্জা গোলাম আহমদ সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের নিকট আগত 'ওহীকে' শরীয়তযুক্ত ওহী বলে দাবী করেছে। এছাড়া 'দাফেউল বালা' নামক গ্রন্থে সে লিখেছে ঃ 'খোদা তাআলা এই উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহ মাওউদ (প্রত্যাশিত মসীহ)-কে পাঠিয়েছেন, যে পূর্বতন মসীহ (ঈসা আঃ) থেকে সর্ব দিক থেকেই অগ্রগামী। তিনি এই মসীহের নাম রেখেছেন গোলাম আহমদ। - (দাফেউল বালা, ১৩ পৃষ্ঠা, ১৯০২)

আমরা জানি যে, ঈসা(আঃ) ছিলেন শরীয়তবাহী নবী। তাই যে ব্যক্তি সর্বদিক থেকে তাঁর চাইতে অগ্রগামী হবে সে কি শরীয়তবাহী নবী হবে না? তাই একথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, মির্জা গোলাম আহমদ কখনো শরীয়তবাহী নবী হওয়ার দাবী করেনি।

এ ছাড়া কাদিয়ানী সম্প্রদায় কার্যতঃ তাকে 'শরীয়তবাহী' নবী বলেই গণ্য করে। তারা গোলাম আহমদের প্রতিটি শিক্ষা ও হুকুমকে 'অবশ্য পালনীয়' হিসাবে মেনে চলে, তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের বিপরীত ও বিরোধী হলেও। যেমন মির্জা গোলাম আহমদ 'আরবাঈন' নামক পুস্তকের ৪র্থ খন্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় টীকাতে লিখেছে—'জিহাদ অর্থাৎ ধর্মীয় লড়াইয়ের তীব্রতা ক্রমে ক্রমেই খোদা তাআলা কমিয়ে এনেছেন। মুসা(আঃ)-এর যুগে জিহাদের এতটুকু তীব্রতা ছিল যে, ঈমান আনা নিহত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারতো না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও হত্যা করা হতো। পরবর্তীতে আমাদের নবী(সঃ)-এর যুগে শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের হত্যা করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আর কোন কোন জাতির জন্যে ঈমানের পরিবর্তে শুধু 'জিযিয়া' প্রদান করে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা মেনে নেয়া হয়েছে। এখন মসীহে মাওউদের সময় সম্পূর্ণভাবে জিহাদের হুকুম স্থগিত করে দেয়া হয়েছে। - (আরবাঈন, ৪র্থ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ১ম মুদ্রণ, ১৯১০)।

অথচ নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য ঘোষণা রয়েছে যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা নবী করীম(সঃ)-এর এ সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য আদেশকে বর্জন করে গোলাম আহমদের আদেশের অনুসরণ করে। এভাবে শরীয়তে মুহাম্মদীতে জিহাদ, খুমুস, ফাই, জিজিয়া এবং গনিমতের যে সকল বিধি বিধান রয়েছে-যা হাদীস এবং ফিকহের

কিতাবগুলোতে শত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচিত ও বর্ণিত হয়েছে, তারা গোলাম আহমদের উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে এ সকল বিধান বদলানো এবং রহিত করার পক্ষপাতি। এরপরও গোলাম আহমদকে শরীয়তবাহী নবী না বলার কোন সুযোগ রয়েছে কি?

খতমে নবুওয়ত এ কোন প্রকারভেদ নেই ঃ

যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শরীয়তবাহী নবী হবার দাবী করেনি, বরং শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার দাবীতে সীমিত থেকেছে, তথাপি আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি যে, খত্‌মে নবুওয়তের আকীদায় এ ধরনের কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা যে, অমুক ধরনের নবুওয়ত শেষ হলেও অমুক ধরনের নবুওয়ত এখনো বহাল রয়েছে। এটা সেই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনারই অংশ, যে সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) আমাদের হুঁশিয়ার করে গেছেন। মির্জা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীদের এই পার্থক্য বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে যে, কুরআন শরীফের কোন আয়াতে বা নবী করিম (সঃ)-এর কোন হাদীসে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, খত্‌মে নবুওয়তের যে আক্বীদা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল শত সহস্র বার আলোচনা করেছেন তা শুধু শরীয়তবাহী নবীর বেলায় প্রযোজ্য, শরীয়তবিহীন নবুওয়ত তার আওতায় আসেনি ! যদি নবী করীম (সঃ)-এর পর শরীয়তবিহীন নবীর ধারা অব্যাহত থাকতো তাহলে কুরআনের কোন আয়াত, রাসূলে আকরাম (সঃ)-এর লাখ লাখ হাদীসের মাঝে কোন এক হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য কথার মাঝে কোন একটি কথাও কেন এর স্বপক্ষে বর্ণিত হয়নি?

বরং আমরা দেখেছি এসব কিছুতে সুস্পষ্ট ভাষায় এটাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, সব ধরনের নবুওয়তই শেষ হয়ে গেছে এবং নবী করীম (সঃ)-এর পর আর কোন ধরনের কোন নবী আসবে না। 'খতমে নবুওয়ত' সম্পর্কিত বহু শত হাদীসের মাঝে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন –

(১) রিসালাত এবং নবুওয়ত শেষ হয়ে গেছে। তাই, আমার পর আর কোন রাসূলও হবে না আর কোন নবীও হবেনা। - (তিরমিজী, ২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, স্বপ্ন অধ্যায়)

এ হাদীসটিতে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক, হাদীসটিতে নবী ও রাসূলের ধারার সমাপ্তির সাথে সাথে নবুওয়ত ও রিসালতও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দুই, এখানে রাসূল এবং নবী

দুটো শব্দই একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেখানে এ দুটো শব্দ একত্রে ব্যবহার করা হয়, সেখানে রাসূল শব্দের অর্থ হয় নতুন শরীয়তের প্রবর্তক এবং আগে থেকে প্রচলিত শরীয়তের অনুসরণকারীকে বলা হয় নবী। সুতরাং এ হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে শরীয়তবাহী বা শরীয়তবিহীন উভয় ধরনের নবীর আগমনকে সব সময়ের জন্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

(২) নবী কারীম (সঃ) তাঁর শেষ জীবনে অসিয়ত হিসেবে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে –

"হে লোকেরা! নবুওয়তের সুসংবাদবাহী হিসেবে শুধুমাত্র 'সত্য স্বপ্ন' অবশিষ্ট রয়েছে, আর কিছু অবশিষ্ট নাই"। (মুসলিম, নাসাঈ ইত্যাদি)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম(সঃ) বলেছেন ঃ

"বনী ইসরাঈলের লোকদের শাসন-পরিচালনা করতেন নবীগণ। তাই যখনই কোন নবী মৃত্যুবরণ করতেন, তখনই অপর এক নবী তাঁর দায়িত্ব প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু লক্ষ্য করো, আমার পর কোন নবী হবেনা, তবে 'খলীফা' হবে। এবং তারা বিপুল সংখ্যক হবে। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ আরজ করলেন, আপনি তাদের সম্পর্কে আমাদের কি হুকুম করেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, "তোমরা একের পর এক তাঁদের বাইয়াতের হক যথাযথভাবে আদায় করো"। - (বোখারী, ৪৯১ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড, নবী অধ্যায়, মুসলিম, ১২৬ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, নেতৃত্ব অধ্যায়)।

এ হাদীসটিতে বনী ইসরাঈলের যে নবীদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা কেউ নতুন শরীয়তবাহী ছিলেন না, বরং তাঁরা সবাই হযরত মুসা (আঃ)—এর নিয়ে আসা শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। হাদীসটিতে বনী ইসরাঈলের নবীদের মত নবী না আসার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এটাই হলো যে, রাসূলে আকরাম (সঃ)-এর পর শরীয়তবিহীন বনী ইসলাঈলের নবীদের মত নবীও আসবেনা। সেই সাথে নবীর পরিবর্তে 'খলিফার' আগমন ঘটবে, নবী করীম (সঃ) এ সংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু কোন ধরনের ছায়া নবী বা উম্মতী নবীর আগমন সম্পর্কে সামান্য ইশারাও দেননি।

আশ্চর্যের ব্যাপার কাদিয়ানীদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়ায় এমন একজন উচ্চ মর্যাদার নবীর আগমন ঘটবে যিনি বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যার মাঝে নবী করীম(সঃ)-এর সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য ও সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটবে; তাকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান

করলে কাফের, বিভ্রান্ত, দূর্ভাগা এবং আল্লাহ্‌র আজাবের পাত্র হতে হবে। অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং এবং তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন আয়াত বা হাদীসে তার আগমন সম্পর্কে সামান্য কিছুও বলেননি; বরং বলেছেন, নবী করীম (সঃ)-এর পর আর কোন নবী আসবে না এবং যারা নবী দাবী করবে তারা হবে ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুক। শুধু এটুকুই নয়, তাঁর বিদায়ের পর খলীফাদের আগমন ঘটবে সে কথাও সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিশাল মর্যাদার অধিকারী উম্মতী নবীর আগমন সম্পর্কে সামান্য ইশারাও তিনি দেননি। তাহলে এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সঃ) এ উম্মতকে ইচ্ছাকৃতভাবে সব সময়ের জন্যে এক বিভ্রান্তির মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা সব ধরনের নবুওয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে বলে বুঝবে এবং আগত শরীয়তবিহীন নবীকে অস্বীকার করে কাফের, গোমরাহ ও আজাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। কোন লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সম্পর্কে মুসলমান থাকাবস্থায় এ ধারনা করতে পারে কি?

আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীও জানে যে, 'আমার পর কোন নবী আসবে না' এ হাদীসটির মূল আরবী কথাটি কালেমা তায়্যেবার প্রথমাংশের সাদৃশ্য। অতএব কেউ যদি হাদীসটিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বৈধ মনে করে, তাহলে তার নিকট কালেমার প্রথমাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বৈধ হবে। তাই, হাদীসটির ব্যাখ্যা বর্ণনা করে যদি সে বলে, শরীয়তসহ কোন নবীর আগমন যদিও ঘটবেনা, কিন্তু ছায়ারূপে উম্মতী হয়েও শরীয়তবিহীন হয়ে নবী হতে পারে। তাহলে কালেমার প্রথমাংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ কেউ এ কথাও বলতে পারবে যে, সকল ক্ষমতার অধিকারী বিশ্ব নিয়ন্তা খোদা তো একজনই, কিন্তু ছোট ছোট দায়িত্বপ্রাপ্ত ও মূল খোদার ছায়ারূপী আরো অনেক খোদা হতে পারে যারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হবে। তাহলে তাওহীদের কিছু অবশিষ্ট রইল কি? পৃথিবীর মুশরিক জাতিগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে ইসলামের কোন পার্থক্য থাকবে কি? ছোট ছোট খোদার অস্তিত্ব মেনে নিলে ইসলামের প্রথম মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস তাওহীদ যদি বিলীন হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তবিহীন ছায়া নবী ও উম্মতী নবীর অস্তিত্ব স্বীকার করার দ্বারা ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক আক্বীদা অর্থাৎ 'খতমে নবুওয়ত' কি নিঃশেষ হয়ে যাবে না?

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হলো হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) বেঁচে রয়েছেন এবং তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এ আক্বীদার সাথে 'খতমে নবুওয়ত' আক্বীদার কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলো পড়ে শুনে একজন সাধারণ মুসলমানও তাই বুঝবে যা উম্মতের সবাই এক মত হয়ে বুঝেছেন ও সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন – তা হলো, নবী করীম (সঃ)-এর পর কোন নবীর জন্ম হবেনা। নবী করীম (সঃ) - 'খাতামুন নবীঈন' বা শেষ নবী বলার অর্থ কেউ এটা মনে করেনা যে, তাঁর পূর্বের সব নবীর নবী হিসেবে যে মর্যাদা তা লোপ পেয়েছে বা তাঁরা সবাই মারা গেছেন। যেমন কেউ নিজেকে 'খাতামুল আওলাদ' বা শেষ সন্তান বললে এ অর্থ কেউ করবেনা যে,তার পূর্বের সন্তানরা কেউ আর এখন সন্তান নয় বা তারা সবাই মারা গেছে। বরং এটা বুঝবে যে, তারপর আর কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। তেমনি নবী করীম (সঃ) নিজেকে খাতামুন নবী বা শেষ নবী বলার কারণে পূর্বের নবীদের মর্যাদা বিলোপ বা মৃত্যুবরণের অর্থ বুঝা যাবে না,বরং এর অর্থ হবে, তাঁর পর আর কোন নবীর জন্ম হবে না।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'খাতামুল আওলাদ' শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করেছে যা সবার কাছে গৃহীত ও পরিচিত। সে লিখছে, "অতএব, এটাই হলো যে, যার মাঝে মানবিক সকল গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সে হবে 'খাতামুল আওলাদ'; অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর এমন পূর্ণতার অধিকারী কোন লোক মায়ের গর্ভ থেকে বের হবে না। - (তিরয়াকুল কুলুব, ২৯৭ পৃঃ ৩য় সংস্করণ, ১৯৩৮)

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্যে সে লিখেছে - "আমার পর আমার পিতামাতার আর কোন সন্তান হয়নি। অতএব আমিই ছিলাম তাদের 'খাতামুল আওলাদ'।

তাহলে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী 'খাতামুন নাবীঈন'-এর অর্থ হবে, নবী করীম(সঃ)-এর মৃত্যুর পর আর কোন নবী মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিবে না। খতমে নবুওয়তের আক্বীদার সাথে ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমনের কোন রকমের বৈপরীত্য আছে কি? মোটেই বৈপরীত্য নেই, কেননা ঈসা (আঃ) তখন মায়ের গর্ভ থেকে বের হবেন না। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, তাঁর মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে বা তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন? কখনোই নয়। অথচ, গোলাম

আহমদ 'খাতামুন নাবীঈন' বলে ঈসা(আঃ)-কে মৃত প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে।

জিল্লী ও বুরূযী নবুওয়তের অলীক দাবী ঃ

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীগণ কখনো আবার এ কথা বলে যে, মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়ত জিল্লী বা ছায়ারূপ ছিল এবং তার নবুওয়ত বুরূযী তথা প্রকাশিত নবুওয়ত ছিল। এ ধরনের নবুওয়ত নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব সদৃশ। তাই, এ ধরনের নবুওয়তে 'খতমে নবুওয়ত' আক্বীদায় কোন চিড় বা ফাটল ধরানো হয়নি। কেননা, কোন কিছুর ছায়া বা প্রতিবিম্ব মূল বিষয় হয় না। কিন্তু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, এ ধরনের নবুওয়ত মূল নবুওয়তে আক্বীদা রাখার চাইতেও অনেক বেশী কুফরী এবং বিপজ্জনক ধ্যান ধারনা। কারণ ঃ

(১) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এক সাধারণ ছাত্রও জানে ছায়ারূপ এবং বুরূয বা প্রকাশরূপ-এ দুটি ধারনাই সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় ধ্যান-ধারনা। ইসলামে এই ধরনের কোন ধারনা পোষণ করার ন্যূনতম অবকাশ নেই।

(২) জিল্লী এবং বুরূযী নবুওয়তের যে ব্যাখ্যা মির্জা গোলাম আহমদ স্বয়ং বর্ণনা করেছে তাতে এমন নবী অতীতের সকল নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী হবেন। কেননা, সে হবে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিচ্ছবি বা পুনর্জন্ম লাভকারী স্বত্তা। এ হিসেবেই মির্জা গোলাম আহমদ বেশ ক'বারই যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে এই ঘোষণা দিয়েছে যে, সে-ই নবী করীম(সঃ)। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ্য করুন।

মির্জা গোলাম আহমদের নবী করীম(সঃ)-হওয়ার দাবী ঃ

(১) আমি হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর নামের পূর্ণতম প্রকাশিত স্বত্তা অর্থাৎ ছায়ারূপে আমিই মুহাম্মদ এবং আহমদ। (হাকীকাতুল ওহী, টীকা, ৭২ পৃষ্ঠা)

(২) আমি সেই আয়না, যার মাঝে মুহাম্মদী আকৃতি এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। (নুযূলে মসীহ, ৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯০৯)।

(৩) আমিই কুরআনের আয়াত।

তাদের পরবর্তী দল, যারা তাদের সাথে মিলেনি। এর প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত রূপে খাতামুন নাবীঈন বা শেষ নবী, আর খোদা তাআ'লা এখন থেকে বিশ বছর পূর্বে 'বারাহীনে আহমদিয়া'তে আমার নাম মুহাম্মদ ও আহম্মদ রেখেছেন এবং আমাকে হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এরই সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এভাবেই আমার নবী হওয়ার দ্বারা

নবী করীম (সঃ)-এর খাতামুন নাবীঈন হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা বা ফাটল সৃষ্টি হবে না। কেননা, ছায়া তার আসল অস্তিত্ব (অর্থাৎ মূল কায়া) থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়না। আর যেহেতু আমি ছায়ারূপে মুহাম্মদ (সঃ) তাই আমার নবী হওয়ার দ্বারা 'খাতামুন নবীঈন'-এর মোহর ভাঙ্গেনি। কেননা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইলো। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-ই নবী রয়েছেন, আর কেউ নবী হয়নি। অর্থাৎ আমি যখন প্রকাশিত রূপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এরই স্বত্তা এবং বুরূযী অর্থাৎ প্রকাশিত রূপে মুহাম্মদী পূর্ণতার গুণাবলী ও মুহাম্মদী নবুওয়ত আমার ছায়ারূপ আয়নায় প্রতিবিম্বত হচ্ছে, তখন ভিন্ন কোন স্বত্তা হলো কি যে ভিন্ন ভাবে নবী দাবী করছে? - (এক গলতী কা এযালাহ, পৃষ্ঠা ১০-১১)।

এ কথাগুলো উদ্ধৃতি হিসাবে আলোচনা করতে প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর কেঁপে উঠবে। কিন্তু তথাপি কথাগুলো এ জন্যে আনা হলো যেন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, 'মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিজের ভাষায় এই হচ্ছে ছায়ারূপ ও প্রকাশিত রূপ নবুওয়তের ব্যাখ্যা যে সম্পর্কে বলা হয়, এর দ্বারা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন নবুওয়তের দাবী করা হয় না। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হচ্ছে, যদি এই ছায়ারূপ ও প্রকাশিত রূপের গোলক ধাঁধাঁর মাঝে মির্জা গোলাম আহমদ সমস্ত মুহাম্মদী গুণাবলী ও মুহাম্মদী নবুওয়ত নিজের জন্যে নির্ধারণ করে নেয়, তখন কোন নবী থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন রইলো না? এরপরও যদি ছায়ারূপ, প্রকাশিত প্রতিবিম্বিত রূপ হাল্কামানের নবুওয়তই হয়, আর এর দ্বারা 'খত্‌মে নবুওয়তের' আক্বীদায় কোন ক্ষতি সাধন না হয়, তাহলে বলতে হয় যে, খত্‌মে নবুওয়তের আক্বীদা এমন অর্থহীন আক্বীদা যে, যে কেউ যে কোন ধরনের নবুয়ত দাবী করায় তাতে কোন ক্ষতি হয়না, তা ভেঙ্গে যায় না। অথচ খত্‌মে নবুওয়তের আক্বীদা মোটেই এমন নয়।

মির্জা গোলাম আহমদের পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী ঃ

কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারীরা নিজস্ব রচনায় এ কথা স্বীকার করেছে যে, মির্জা গোলাম আহমদ পূর্ববর্তী নবীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অথচ সে নবীদের প্রত্যেকেই (ছিলেন) সরাসরি নবী, কোন ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপ নন। যেমন, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মেজো ছেলে মির্জা বশীর আহমদ এম, এ, কাদিয়ানী লিখেছে ঃ

"অনেক লোকের এ ধরনের একটা ধারনা রয়েছে যে, জিল্লী (ছায়ারূপ) বা বুরূযী (প্রতিবিম্বিত) নবুওয়ত খুব নিম্নমানের নবুওয়ত। এটা সম্পূর্ণই প্রবৃত্তির ধোঁকা, যার কোন বাস্তবতা নেই। কেননা, জিল্লী নবুওয়তের জন্যে নবী করীম (সঃ)-এর এই পরিমাণ অনুসরণ করতে হয় যে, আপন পর ভেদাভেদ লোপ পেয়ে যায়," আমি তুমি এবং তুমি আমি' স্তরে উপনীত হতে হয়। এমন স্তরে পৌছতে পারলে তার মাঝে নবী করীম (সঃ)-এর সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। এমন কি তার সাথে নবী করীম (সঃ)-এর এতো বেশী নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠে যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবুওয়তের জামাও এই ব্যক্তিকে পরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাকে বলা হবে 'জিল্লী নবী'।

যেহেতু জিল বা ছায়াতে তার মূল বস্তুর পূর্ণ আকৃতি থাকাটাই বাঞ্ছনীয় এবং সকল নবীও তাতে একমত; অতএব যে মুর্খ মসীহ মাওউদের জিল্লী নবুওয়তকে নিম্নমানের নবুওয়ত বলে মনে করে বা অসম্পূর্ণ নবুওয়ত বলে ধারণা করে, তার হুঁশজ্ঞান ঠিক করা উচিত এবং নিজের ইসলামের খবর নেয়া প্রয়োজন। কেননা, সে ঐ নবুওয়তের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে যা সকল নবুওয়তের রাজটীকা। আমি বুঝতে পারি না, মানুষের কেন মসীহ মাওউদের নবুওয়ত নিয়ে এত দ্বিধা-সংশয়, আর কেনইবা কিছু লোক তাঁর নবুওয়তকে অসম্পূর্ণ নবুওয়ত বলে ধারনা করে। কেননা, আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তিনি নবী করীম (সঃ)-এর প্রকাশিত স্বত্তা হিসাবে ছায়ানবী ছিলেন। তাই এই ছায়ানবীর মর্যাদা অনেক উঁচু।

এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, নবী করীম (সঃ)- এর পূর্বে যারা নবী হয়ে এসেছিলেন তাঁদের জন্যে এটা জরুরী ছিল না যে, তাদের মধ্যে ঐ সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে যা কিছু নবী করীম (সঃ)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। বরং তাদের প্রত্যেককে নিজস্ব যোগ্যতা ও কাজের ধারা অনুযায়ী গুণাবলী প্রদান করা হতো। তাই কাউকে অনেক ও কাউকে কম গুণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মসীহ মাওউদ-এর তো নবুওয়ত মিলেছেই তখন, যখন তিনি মুহাম্মদী নবুওয়তের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এতোটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছেন যে, তাঁকে এখন জিল্লী নবী বলা যায়। তাই, জিল্লী নবুওয়ত মসীহ মাওউদের পা-কে পিছনে টেনে নিয়ে যায়নি, বরং আগে নিয়ে এসেছে। এতো বেশী আগে এনেছে যে একেবারে নবী করীম (সঃ)-এর পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
- (কালিমাতুল ফাসল, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, ১৪ নং খণ্ড ৩য় নম্বর, ১১৩ পৃষ্ঠা ১৯১৫)

এ আলোচনাকালেই পরবর্তীতে মির্জা বশীর আহমদ পিতা গোলাম আহমদকে হযরত ঈসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান এমনকি হযরত মুসা (আঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে লিখেছে।

অতএব, মসীহ মাওউদের ছায়া নবী হওয়া কোন নিম্নমানের নবী হওয়া নয়। বরং খোদার শপথ করে বলছি, এই নবুওয়ত যেখানে মনিবের অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) এর মর্যাদা বাড়িয়েছে, সেখানে গোলামেরও (অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহ্‌মদ-এর) মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাঁকে এমন স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে যেখানে বনী ইসরাঈলের নবীরা পৌঁছতে পারেননি। তাঁকে মোবারকবাদ দেই যে, এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা সম্যকভাবে বুঝতে পারে এবং নিজকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। - (পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১১৪)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অপর পুত্র এবং দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে, "জিল্লী এবং বুরুযী নবুওয়ত কোন নিম্নমানের নবুওয়ত নয়। যদি তাই হতো, তাহলে বনী ইসরাঈলের এক নবী সম্পর্কে মসীহ মাওউদ কিভাবে এ কথা বলতে পারেন যে, "মরিয়মের পুত্রের আলোচনা বাদ দাও, গোলাম আহমদ তাঁর চাইতে উত্তম"। - (আল কাওলুল ফাস্‌ল, ১৬ পৃষ্ঠা, ১৯১৫)

কাদিয়ানীরা নবী করীম (সঃ)-কে খাতামুন নাবীঈন মানে কি?

এই হলো কাদিয়ানীদের কথিত জিল্লী এবং বুরুযী নবুওয়তের হাকীকত পরিচিতি, যার সম্পর্কে বলা হয় যে, এ ধরনের নবুওয়ত দ্বারা খতমে নবুওয়তের আক্বীদার কোন ক্ষতি হয়না। অথচ যার সামান্য পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা, ইনসাফ ও আমানতদারী আছে উপরোক্ত জিল্লী ও বুরুযী নবুওয়ত সম্পর্কিত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার ছেলেদের লেখা পড়ার পর তার কাছে কি এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবেনা যে, জিল্লী এবং বুরুযী নবুওয়তের চাইতে মারাত্মক আর কোন আক্বীদা হতে পারে না যা খত্‌মে নবুওযতের আক্বীদাকে বিনষ্ট করে খত্‌মে নবুওয়তের আক্বীদার সারবস্তুকে বিলীন করে দেয়।

জিল্লী এবং বুরুযী নবুওয়ত সম্পর্কিত আলোচনা পাঠ করার পর আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, এ ধরনের নবুওয়ত খতমে নবুওয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী। কেননা, খতমে নবুওয়তের অর্থ হচ্ছে, রাসূলে আকরাম (সঃ)-এর পর আর কোন নবী আসবেনা, কোন লোক নবী হবে না আর জিল্লী ও বুরুযী নবুওয়তের আক্বীদা বলে, তাঁর

অন্তর্ধানের পর শুধু নবী আসতে পারে, তাই নয়, বরং এমন নবী আসতে পারে যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক মর্যাদার অধিকারী। শুধু তাই নয়, নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর সমস্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে সে সকল নবীর মর্যাদাকে পিছনে ফেলে দুজাহানের সর্দার নবী করীম (সঃ)- এর পাশাপাশি অবস্থানকারী হতে পারে। এরপরও কি খতমে নবুওয়তের আক্বীদার কোন ক্ষতি করা হয় না?

নবী করীম (সঃ)-এর চাইতেও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ঃ

বরং এই মারাত্মক আক্বীদায় এ সুযোগও রয়েছে যে, কেউ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী করীম (সঃ)-এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাশালী বলে দাবী করতে পারে। কারণ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যখন নবী কারীম (সঃ)-এর দ্বিতীয় প্রকাশ পূণর্জন্মীয় রূপ, অতএব তা প্রথম প্রকাশ থেকে উত্তমও হতে পারে।

এটা শুধু বিরোধিতার খাতিরে কথা বাড়ানো বা কল্পনা মাত্র নয়। বরং কাদিয়ানীদের পত্রিকা রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স—এর প্রাক্তন সম্পাদক কাজী জহুরুদ্দীন আকমল গোলাম আহমদের প্রশংসা কীর্তন করে একটি কবিতা লিখে যা ১৯০৬ সনের ২৫ অক্টোবর 'বদর' নামক পত্রিকায় ছাপানো হয়। সে কবিতার কটি পংক্তি লক্ষ্যণীয়-

"হে প্রিয় বৎস! তিনি এ জগতের ইমাম ও নেতা, তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার ভূবনে গোলাম আহমদ নামে প্রকাশিত হয়েছেন। গোলাম আহমদ হলেন মহান রাব্বুল আলামীনের আরশ, তাঁর আবাস যেন লা'মাকান স্তরে। (যার নির্দিষ্ট আকার না থাকায় নির্দিষ্ট আধার নেই, তার অবস্থানকে লা'মাকান বলে, যেমন আল্লাহর অবস্থান)।

মুহাম্মদ (সঃ) আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন আর এখন তিনি পূর্বের তুলনায় অধিক মান মর্যাদার ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে এসেছেন। তাই, যে ব্যক্তির মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখার আগ্রহ রয়েছে সে কাদিয়ান শহরে এসে গোলাম আহমদকে দেখে নিতে পারে।

- (বদর পত্রিকা, ২৫ অক্টোবর.১৯০৬ সংখ্যা, ২য় খণ্ড, ৪৩ সংখ্যা, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

এটা নিছক 'পীর উড়েনা, মুরীদরা উড়ায়' জাতীয় বাড়াবাড়ি নয়। বরং কবি এ কবিতাটি লিখে মির্জা গোলাম আহমদকে পড়ে শোনায় এবং মির্জা গোলাম আহমদের নিকট হস্ত লিখিত কপি উপহার দেয়। গোলাম আহমদ-এর প্রত্যুত্তরে জাযাকাল্লাহ বলে অভিনন্দন ও আন্তরিক সন্তোষও প্রকাশ করছিল। এ কথাগুলো স্বয়ং কাজী জহুরুদ্দীন আকমল

আল-ফজল পত্রিকার ২২ আগষ্ট ১৯৪৪ সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে লিখেছে ঃ "এটুকু ঐ কবিতার একটি অংশ যে কবিতাটি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপস্থিতিতে পড়ে শুনানো হয়েছিল এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে তাঁর সমীপে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি নিজে সেটা বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় এ কবিতাংশের উপর কেউ কোন আপত্তি করেনি। অথচ তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে মৌলভী মুহাম্মদ আলী (লাহোরী জামাতের আমীর) এবং তার সঙ্গী সাথিগণও সেখানে হাজির ছিলেন। যতটুকু আমার স্মরণ হয়, আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তারা সবাই শুনতে ছিলেন। তারা যদি আজ যুগ পরিবর্তনের কারণে তা অস্বীকার করেন, তাহলে জেনে রাখুন, এ কবিতাটি সে সময় 'বদর' নামক পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল আর আজকাল 'আল-ফজল' পত্রিকার যে পজিশন, সে সময় 'বদর' পত্রিকা এই পজিশনে বরং এর চাইতে ভালো পজিশনে ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের সাথে লাহোরী গ্রুপের লোকজনের বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ এবং আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তিনি এখনো আল্লাহর মেহেরবানীতে বেঁচে আছেন। তাঁর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন এবং নিজেরা এ কথার উত্তর দিন যে, আপনারা এ কবিতা শোনার পর কোন আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কিনা। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই কবিতা শোনার পর এবং 'জাযাকাল্লাহ' বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পর এবং এ পংক্তিগুলোকে নিজে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাবার পর কারো কি এ অধিকার রয়েছে যে, সে কবিতার এ অংশটিতে আপত্তি করে নিজের ঈমানের দুর্বলতা এবং মারেফাতের স্বল্পতা প্রকাশ করে? - (আল-ফজল ৩২ খণ্ড,১৯৬ সংখ্যা ২২ আগষ্ট,১৯৪৪, ৬-পৃষ্ঠা।

এ আলোচনাতেই কবি আরো লিখেছে-

এই কবিতাটি 'খুতবায়ে এলহামিয়্যা' পড়ার পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগেই বলা হয়েছিল, তাঁকে শোনানোও হয়েছিল এবং ছাপানোও হয়েছিল। - (পূর্বোক্ত, ৬ পৃষ্ঠা, ২ ও ৩ কলাম)

উপরোক্ত কবিতা নিয়ে লেখা আলোচনা পড়ে স্পষ্টভাবেই এ কথা বুঝা গেল যে, এ সব শুধু কাব্যিক উচ্ছাস নয়, বরং সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জিল্লী ও বুরুযী নবুওয়তের ধ্যান-ধারণার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। কবিতাটির ভাব ও বিষয়বস্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লেখা 'খুতবায়ে এলহামিয়া' থেকেই গৃহীত হয়েছে। আর মির্জা গোলাম

আহমদ কবিতাটির শুধু সত্যায়ন করেছে তাই নয়, বরং এতে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করেছে।

'খুতবায়ে এলহামিয়া'র যে কথাগুলো থেকে কবি এ মর্মার্থ গ্রহন করেছে সে অংশটুকু হলো, গোলাম আহমদ লিখেছে যে, কেউ এ কথা অস্বীকার করবে যে, নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ষষ্ঠ সহস্রের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন তিনি পঞ্চ সহস্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, সে সত্যের এবং কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের অস্বীকার করবে তাই নয়, সত্য কথা তো এই যে, নবী করীম (সঃ)-এর রুহানীয়্যাত (আত্মিক মান মর্যাদা) ষষ্ঠ সহস্রের শেষে এই যুগে পূর্বের সে সময়ের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, অধিকতর পূর্ণ এবং অধিকতর মজবুত। বরং এটা যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই এখন আর তরবারী ও লড়াকু দলের কোনই প্রয়োজন নাই। আর এজন্যেই খোদা তাআলা মসীহ মাওউদের নবুওয়ত প্রাপ্তির জন্যে শতাব্দীর হিসাবকে রাসূলে করীম (সঃ)-এর হিজরত হতে বদরের রাতের হিসাবের মত গ্রহণ করেছেন। যেন এই হিসাব ঐ স্তর যা উন্নতির সমস্ত স্তরের পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম পর্যায় নির্দেশ করে। - (খুতবায়ে এলহামিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৭১,১৯০২)

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রকাশিত রূপের মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) হতে অধিক মর্যাদাশালী হওয়া স্বয়ং কাদিয়ানীর আক্বীদা বিশ্বাস ছিল, যা সে খুতবায়ে এলহামিয়্যাহ-এর উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে আলোচিত করেছে। এরই ব্যাখ্যা করে কাজী আকমল পূর্বে বর্ণিত কবিতা লিখেছে এবং গোলাম আহমদ নিজে তার প্রশংসা করেছে।

যে কোন লোক নবী করীম (সঃ)-এর চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে ঃ আহমদীদের ভ্রান্ত আক্বীদা এ পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং তারা বিভ্রান্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে গেছে। তারা বিশ্বাস করে শুধু মির্জা গোলাম আহমদ নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি তার আত্মিক স্তরে উন্নতি করতে করতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হতে আগে বেড়ে যেতে পারে। এ মর্মে কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা গোলাম আহমদ তনয় মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে ঃ

"এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা যে, প্রত্যেক লোকই উন্নতি করতে পারে এবং বড় হতে বড় স্তরে উপনীত হতে পারে। এমনকি নবী করীম (সঃ)

হতেও এগিয়ে যেতে পারে"। - (আল-ফজল কাদিয়ান, ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৭ জুলাই, ১৯২২, ৯ পৃষ্ঠা, শিরোনাম–খলীফায়ে মসীহ কি ডায়রী)

কাদিয়ানীরা মাঝে মাঝে সরল প্রাণ মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্যে বলে থাকে যে, তারা নবী করীম (সঃ)-কে 'খাতামুন নাবীঈন' মানে। কিন্তু তাদের এ কথা কতটুকু সত্য, তা উপরের আলোচনা থেকেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কাদিয়ানীরা তাহলে খাতামুন নাবীঈন বলে কি বুঝায়? তার উত্তর পাওয়া যায় মির্জা গোলাম আহমদের বক্তব্যে। সে লিখেছে ঃ

আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সঃ)-কে খাতামের অধিকারী বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে পূর্ণ ফয়েজের মোহর প্রদান করেছেন যা আর কোন নবীকে কখনো দেয়া হয়নি। তাই তাঁকে খাতামুন নাবীঈন বলা হয়। অর্থাৎ, তাঁর অনুসরণে নববী কামালাত হাসিল হয়ে থাকে। সেই সাথে তাঁর তাওয়াজ্জুহ রুহানীভাবে নবী সৃষ্টি করে। এই পবিত্র শক্তি আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। - (হাকীকাতুল অহী, ৯৭ পৃষ্ঠার টীকা)

এই হলো জিল্লী ও বুরুযী নবুওয়তের অদ্ভুদ আক্বীদার পাশাপাশি খাতামুন নাবীঈন-এর নতুন ব্যাখ্যা। নবী করীম (সঃ)-কে পূর্ণ ফয়েজের মোহর প্রদান করা হয়েছে এর দ্বারা তিনি অন্যকে নবী বানাতে পারেন। আর সে নবী তাঁর সমমানের বরং তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুণাবলীর ধারক হয়। খাতামুন্ নবীয়্যীন শব্দটি কুরআনে-হাদীসে আরবী ভাষায় যে অর্থ প্রকাশ করে তার ধারে কাছেও না গিয়ে এমনি অদ্ভুদ এক অপব্যাখ্যা প্রদান করার কাজটি নির্বিবাদে করে গেছে মির্জা গোলাম আহমদ। মির্জা গোলাম আহমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) তার তাওয়াজ্জুহ দ্বারা নবী বানাতে পারেন। তাহলে অনেক লোকই নবী হতে পারতো কিন্তু তা শুধু এক জনই লাভ করতে পারলো, আর সে হল মির্জা গোলাম আহমদ। তার এ অপব্যাখ্যা শুনে কেউ এ কথাও বলতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলার একক মাবুদ হওয়ার অর্থ হবে–বিশ্বজগতে তিনিই একমাত্র উপাস্য-সত্তা যার পবিত্র শক্তি খোদাসৃষ্টি করে। তাই খোদার ক্ষমতা প্রয়োগে তার সমমানের বা তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ খোদা সৃষ্টি হয়। যদি কুরআন-হাদীসের মূল বক্তব্য ও আরবী ভাষার সাথে এই ধরনের বিদ্রুপাত্মক আচরণ করার পরও কোন লোক ইসলামের গন্ডীতেই বহাল থাকে তাহলে বলতে হবে বিশ্বব্রহ্মান্ডে কোন লোকই অমুসলমান নেই।

মির্জা গোলাম আহমদ আরো লিখেছে ঃ এই প্রচুর পরিমান ওহী ও গায়েবী বিষয় জানার নেয়ামত এ উম্মতের মাঝে একমাত্র আমাকেই প্রদান করা হয়েছে। আমার পূর্বে যত অলী-আওলিয়া, গাউছ-কুতুব এসেছেন তাদের কাউকে এই পরিমান নেয়ামত দেয়া হয় নাই। তাই নবী নাম পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র আমিই আর কেউ নয়।

- (হাকীকাতুল ওহী, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

এ আলোচনা করার সময় হয়তো মির্জা গোলাম আহমদের এ কথাটাও খেয়াল হয়নি যে, নাবীঈন বহু বচনের শব্দ। তাই, তার ব্যাখ্যামাফিক নবী বানানো হলে অন্ততপক্ষে তিনজনকে নবী বানাতে হবে। কেননা, আরবী ভাষায় বহুবচনে কমপক্ষে তিন জনকে বুঝায়।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়া সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবী দাবী করা পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে। সেই সাথে কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং ইসলামের ইতিহাসের আলোকে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন লোক নবী করীম(সঃ)-এর অন্তর্ধানের পর নবী দাবী করে সে এবং তার অনুসারীরা কাফের এবং ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত।

এটা শুধু ইসলামী শরীয়তের কথা নয়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কথাও। বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, যখনই কোন লোক কোন ধর্মের প্রচার করতে নেমেছেন, তখন উপস্থিত লোকসমাজ দুটি পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল তাকে ধর্মীয় নেতা মেনে নেয়, অপর দল তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সকল ধর্মপ্রচারকের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমনি সকল নবীর বেলায়ও ঘটেছে। একদল নবীকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তাঁর আনীত ধর্ম-শরীয়তকে মেনে নেয়। অপর দল তাকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করে, তাঁর সকল কথা ও কাজকে প্রত্যাখ্যান করে, এমন কি মু'জেযাও তারা মানতে রাজী থাকেনা।

আমরা সবাই জানি, এমন পরিস্থিতিতে পরস্পর বিপরীত দুটি দলকে এক নামে পরিচয় দেওয়া হয় না, উভয়কে সত্যপন্থীও বলা হয় না। অবশ্যই এক দলকে সত্যপন্থী ও অপর দলকে বাতিলপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ উভয় দলের পৃথক পৃথক পরিচিতি থাকে। নমুনা হিসেবে আমরা কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।

হযরত ঈসা(আঃ) নবী হিসাবে বনী ইসরাঈলের মাঝে কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তারা এক দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু তিনি আসার পর তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধী দুটি দলের উদ্ভব হয়। একদলকে ঈসায়ী বলা হয় যারা তাকে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে, অপর দল ইহুদী যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এ দুটো দলের কেউ অপর দলকে নিজ দলভূক্ত ভাবেনি। তেমনিভাবে নবী করীম(সঃ) যখন দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন একদল তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেন, তাদের বলা হয় মুসলমান। অপর যে দলটি তাঁকে মানতে রাজী হয়নি তাদের কখনো মুসলমান বলা হয়নি, ইহুদী, খৃষ্টান বা মুশরিক নামে তাদের পরিচয় ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর সময় ও পরে নবী দাবী করে বেশ কয়েকজন। তন্মধ্যে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল মুসায়লামা। মুসলমানগণ তাকে এবং তার অনুসারীদের ইসলামের গন্ডী থেকে বহিস্কৃত জেনে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নামেন, তেমনি তারাও নিজেদের বিপরীত দল হিসাবে সাহাবাদের সাথে যুদ্ধ করতে নামে। তখন কোন দলের লোকই উভয় দলকে সত্যপন্থী এবং মুসলমান মনে করেনি। এমনিভাবে যখনই কোন দুরাচার নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে, তখনই তাকে মুসলিম সমাজ ধর্মচ্যুত হিসাবে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। এভাবেই আমাদের আলোচিত নীচাশয় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

একদল গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে মেনে নিয়েছে আর একদল মানেনি, বরং তাকে মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ অবস্থায় এ উভয় দলকে যেমন হকপন্থী বলা ঠিক হবে না, তেমনি উভয় দলকে মুসলমান এবং উভয়ের ধর্মকে ইসলাম বলাও সঠিক নয়। এ কথা তাদের লাহোরী দলের নেতার বক্তব্যেও সুস্পষ্ট। লাহোরী দলের নেতা মুহাম্মদ আলী লাহোরী বলে - "ইসলামের সাথে আহমদী মতবাদের ঠিক সেই সম্পর্ক, ইহুদী ধর্মমতের সাথে খৃষ্টধর্মের যে সম্পর্ক।" আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, ইহুদী ধর্মমত ও খৃষ্টধর্মকে কেউ এক বলবেনা। অতএব, আমরা কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি

ব্যতিরেকে কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েই এ ফয়সালা করতে পারি যে, আহমদী মতবাদের সাথে ইসলামের বৈপরীত্যে ভিন্ন অন্য কোন সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় তারা নিজেদের মুসলমান দাবী করা স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত নয় কি?

কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক আলাদা মিল্লাত বলেই বিশ্বাস করে ঃ কাদিয়ানীদের এ অবস্থান তারা নিজেরাই মেনে নিয়েছে যে, বিশ্বের একশত কোটির বেশী মুসলমান থেকে তারা ভিন্নও স্বতন্ত্র- এবং তাদের ধর্ম এক নয় বরং তারা অসংখ্য লেখা ও বিবৃতি ভাষণে এ কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে যে, যারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকার করেনা তারা ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত কাফের। তারা এবং কাদিয়ানীরা কখনও এক জাতি নয়।

নিচে তাদের ধর্মীয় বই পুস্তক থেকে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনা উপস্থাপন করা হচ্ছে;

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' নামক গ্রন্থে (যে বই সম্পর্কে তার দাবী, "বইটির সকল শব্দ ও বাক্য ওহী ও ইলহাম হিসাবে এসেছে)", লিখেছে ঃ

"আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রুহানিয়্যাত তাঁর প্রকাশের পূর্ণতার জন্য এবং তাঁর নূরের বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ উম্মত থেকে একজনকে প্রকাশস্থল বা প্রকাশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর এই 'মর্মে খোদা তা'আলা 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব'(অর্থাৎ কুরআন পাকে) ওয়াদা ব্যক্ত করেছেন। আমিই সেই ওয়াদকৃত প্রকাশস্থল এবং সেই প্রতিশ্রুত নূর। তাই ঈমান আনো, কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। আর ইচ্ছা হলে খোদা তাআলার এই বাণী পড়ে নাও। - (খুতবায়ে ইলহামিয়া, অনুবাদযুক্ত, ১৬৭ ও ২৬৮ পৃঃ)।

এবং "হাকীকাতুল ওহী" নামক গ্রন্থে লিখেছে ঃ

"কাফের শব্দটি মুমিনের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। কুফরী দুই প্রকার – (১) প্রথম প্রকার কুফর হলো, কোন লোক ইসলাম ধর্মকেই অস্বীকার করে এবং হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। (২) দ্বিতীয়

প্রকার কুফর, যেমন সে মসীহ মাওউদকে স্বীকার করে না আর দলীল প্রমাণ দ্বারা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে মিথ্যাবাদী বলে; অথচ তাকে নবী হিসাবে মানতে এবং সত্যবাদী হিসাবে জানতে খোদা তাআলা ও নবী করীম(সঃ) স্বয়ং তাকীদ করেছেন এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও এর তাকীদ মিলে। যেহেতু সে খোদা এবং রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছে, তাই সে কাফের। যদি গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে এ উভয় প্রকার কুফরী মূলতঃ একই প্রকারে অন্তর্ভূক্ত বলে প্রতীয়মান হবে। কেননা, যে ব্যক্তি পূর্ণ পরিচয় লাভ করার পরও খোদা ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে, সে তো সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস থাকার পরও খোদা এবং রাসূলকেই অমান্য করে, অস্বীকার করে। – (হাকীকাতুল ওহী, ১৭৯ ও ১৮০ পৃঃ)।

এ বই-এর অন্য এক স্থানে সে লিখেছে- "এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, যারা আপনাকে কাফের বলে এবং রাসূল হিসাবে স্বীকার করেনা আপনি তাদের দু ধরনের লোক বলেন, অথচ খোদার নিকট তারা এক ধরনেরই। কেননা যে লোক আমাকে মান্য করেনা সে এ কারণেই মান্য করেনা যে, সে আমাকে মিথ্যুক মনে করে।"

একটু পর সে আরো লিখেছে ঃ

"এ ছাড়া যে আমাকে মানেনা সে খোদা এবং রাসূলকেও মানেনা, কেননা, আমার সর্ম্পকে খোদা এবং রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে।"

আরো লিখেছে-"খোদা তাআলা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য হিসাবে তিন লাখেরও অধিক আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। আকাশে সূর্য গ্রহন ও চন্দ্র গ্রহন রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে লোক খোদা এবং রাসূলের বর্ণনাকে অমান্য করে, কুরআনকে অস্বীকার করে, ইচ্ছাকৃতভাবে খোদা তাআলার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে এবং শত শত নিদর্শন থাকা সত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, সে কিভাবে মুমিন হতে পারে? আর সে যদি মুমিন হয় তাহলে মিথ্যা কথা বলার জন্য আমিই কাফের। – (পূর্বোক্ত, ১৬৩ ও ১৬৪ পৃঃ)

ডাঃ আঃ হাকীম খানের কাছে লেখা চিঠিতে গোলাম আহমদ লিখেছে- "খোদা তাআলা আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করেছেন যে, যার নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছেছে, কিন্তু সে আমাকে নবী বলে স্বীকার করে নাই, সে মুসলমান নয়।" - (হাকীকাতুল ওহী,১৬৩ পৃঃ)

"মিয়ারুল আখয়ার "নামক গ্রন্থে মির্জা গোলাম আহমদ তার এক ইলহামের বিবরণ এভাবে দিয়েছে "যে লোক তোমার অনুসরণ করবেনা এবং তোমার হাতে বাইয়াত করবেনা, তোমার বিরোধিতায় লিপ্ত থাকবে সে খোদা এবং রাসূলের আদেশ অমান্যকারী ও জাহান্নামী।" - (প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ৮)

" নুযুলুল মসীহ" গ্রন্থে লিখেছে- "যে আমার বিরোধী ছিল, তার নাম খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুশরেক রাখা হয়েছে (পৃঃ ৪)। অপর একটি গ্রন্থ "আল হুদা"তে তাকে অস্বীকার করাকে নবী করীম (সঃ)-কে অস্বীকার করার নামান্তর বলে উল্লেখ করে লিখেছে-"বাস্তবিক পক্ষে দু ব্যক্তি বড়ই হতভাগা, মানুষ ও জিনজাতির মধ্যে এদের মত দূর্ভাগা আর কেউ নাই। এক, যে খাতামুল আম্বিয়া নবী করীম (সঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করেনা এবং দুই, যে ব্যক্তি খাতামুল খোলাফা (অর্থাৎ তার ধারণা মতে সে নিজে) এর উপর ঈমান রাখেনা। - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫)

"আঞ্জামে আথম" গ্রন্থে লিখেছে-"এখন এটা প্রকাশ্য যে, এ সকল ইলহামে আমার সর্ম্পকে বারবার এ কথাই বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত, খোদার পক্ষ হতে দায়িত্ব প্রাপ্ত, খোদার পক্ষ হতে আমানতদার এবং খোদার পক্ষ হতে আগত। সে যা কিছু বলে তাতে ঈমান রাখো। তার শত্রু হবে জাহান্নামী।" - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২)

বদর নামক পত্রিকার ২৪ মে, ১৯০৮ সংখ্যায় লেখা হয়েছে- "এক ব্যক্তি মসীহ মাওউদের নিকট এসে প্রশ্ন করলো, যারা আপনাকে কাফের বলেনা, তাদের পিছনে নামাজ পড়ায় কি অসুবিধা?"

মির্জা গোলাম আহমদ এর দীর্ঘ উত্তর দানের শেষ পর্যায়ে লিখে – "তাদের উচিৎ এ সকল মৌলভীদের সম্পর্কে এক লম্বা লিফলেট ছাপিয়ে প্রচার করা। তাতে লেখা থাকবে, এরা সবাই কাফের কেননা, তারা এক মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। তাহলে আমি

তাদের (অর্থাৎ লিফলেট প্রচারকারীদের) মুসলমান বলে বুঝবো একটি শর্ত সাপেক্ষে। তাহলো, তাদের মধ্যে মুনাফেকীর কোন চিহ্নও থাকবেনা এবং খোদা তাআলার প্রকাশ্য মুজেযাগুলোকে অস্বীকার করবেনা। নয়তো তাদের সম্পর্কে খোদা তাআলার এরশাদ রয়েছে- অর্থাৎ মুনাফেকদের জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হবে।"- (মজমুয়া ফতোয়ায়ে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ থেকে সংকলিত)

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের ফতোয়া ঃ

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা, যার খলীফা হওয়ার ব্যাপারে কাদিয়ানীদের উভয় গ্রুপ একমত, সেই নূরুদ্দীন বলছে- "রাসূলের উপর ঈমান যদি না আনা হয়, তাহলে কোন লোক মুমিন ও মুসলমান হতে পারেনা। আর রাসূলের উপর ঈমান আনার কোন সীমাবদ্ধতা নেই, বরং তা ব্যাপক। নবী আগে আসুন বা পরে, ভারতে আসুন বা অন্য কোন দেশে যে কোন আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে অস্বীকার করাই কুফরী। আমাদের বিরোধীরা হযরত মির্জা সাহেবের প্রত্যাদিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে। তাহলে তোমরাই বলো, এ মতপার্থক্য মৌলিক হবেনা কেন?" - (মজমুয়া ফতওয়ায়ে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ)

দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ আহমদের ফতোয়া ঃ

কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেছে- "যে লোক আহমদী ভিন্ন অন্য কারো নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় মসীহ ম্যাওউদকে বুঝতে সক্ষম হয়নি আর আহমদী হওয়ার অর্থও সে বুঝে নাই। আহমদীদের মধ্যে এমন কোন বেদ্বীন লোক কি আছে যে তার মেয়েকে কোন হিন্দু বা খৃষ্টানের নিকট বিয়ে দিয়েছে? তোমরা তাদের অর্থাৎ অ-আহমদীদের কাফের বলো, অথচ তারা এ ব্যাপারে তোমাদের চাইতে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও অন্য কাফেরের নিকট কন্যা সম্প্রদান করেনা। আর তোমরা আহমদী হয়ে কাফেরকে কন্যা প্রদান করেছো। তোমরা কি এ জন্য বিবাহ দিয়েছ যে, তারা তোমাদেরই জাতির লোক? কিন্তু যেদিন তোমরা আহমদী হয়েছো সেদিন থেকে তোমাদের জাতি হলো আহমদীয়া, পরিচিতি বা স্বাতন্ত্রতার জন্য যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করে

তাহলে তোমরা নিজেদের জাতি বা দলের পরিচয় দিতে পার তা না হলে তোমাদের জাতি, গোত্র, তোমাদের ব্যক্তিসত্তা সবই এখন আহমদী, এরপর আহমদীদের বাদ দিয়ে অ-আহমদীদের মাঝে কেন নিজ জাতির সন্ধান করো? মুমিনের কাজ তো হচ্ছে, যখন সত্য এসে পড়ে তখন বাতিল ও অসত্যকে সে ছেড়ে দেয়। - (মালাইকাতুল্লাহ্, ৪৬ ও ৪৭ পৃঃ)

"আনোয়ারে খেলাফত" নামক গ্রন্থে সে লিখছে- "আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা অ-আহমদীদের মুসলমান বলে স্বীকার করবো না এবং তাদের পিছনে নামাজও পড়বো না। কেননা, আমাদের নিকট তারা খোদা তাআলার এক নবীকে অস্বীকার করা দল। এটা সম্পূর্ণই ধর্মীয় ব্যাপার, এতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু করার কারো কোন অধিকার নেই। - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০)

"আয়েনায়ে সাদাকত " গ্রন্থে তো আরো অগ্রসর হয়ে এ পর্যন্তও লেখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গোলাম আহমদের নামই শুনে নাই, সেও কাফের। যেমন, "যত মুসলমান, যারা মসীহ মাওউদের আনুগত্যের গন্ডীতে আসেনি, তারা মসীহ মাওউদের নামও যদি না শুনে থাকে, তাহলেও তারা কাফের এবং ইসলামের আওতা বহির্ভূত। - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫)

মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্য ঃ

মির্জা গোলাম আহমদের মধ্যম পুত্র মির্জা বশীর আহমদ লিখেছে, "যে লোক মুসা (আঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করলেও ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করেনা, অথবা ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করলেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করেনা, অথবা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে স্বীকার করলেও মসীহ মাওউদকে স্বীকার করেনা, সে শুধু কাফেরই নয়, বরং পাক্কা কাফের এবং ইসলামের গন্ডীর বাইরে।" - (কালিমাতুল ফাস্‌ল, ১১০ পৃঃ)

এ বইয়ের অন্যত্র লিখেছে-"মসীহ মাওউদের এই দাবী যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন, দুটো অবস্থার সৃষ্টি করেছে হয়তো নাউজুবিল্লাহ; তিনি তার দাবীতে মিথ্যুক, আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা কথা বলেছেন, তাহলে তিনি এ অবস্থায় শুধু কাফেরই নয়, বরং বড় কাফের বলে বিবেচিত হবেন। অথবা মসীহ মাওউদ তাঁর ইলহামের দাবীতে সত্যবাদী এবং

খোদা সত্যই তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেছেন, তাহলে এ অবস্থায় অবশ্যই এই কুফরী তাঁর অস্বীকারকারীদের উপর ন্যস্ত হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে নিজেই এরশাদ করেছেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা, হয়ত মসীহ মাওউদের অস্বীকারকারীদের মুসলমান বলে মসীহ মাওউদের উপর কুফরীর ফতোয়া লাগাতে পারো অথবা মসীহ মাওউদকে সত্যবাদী বলে তাঁর অস্বীকারকারীদের কাফের বলে বিশ্বাস করবে। কিন্তু এমন কখনোই হবেনা যে তোমরা উভয় দলকে মুসলমান বলে বিশ্বাস রাখবে। কেননা, কুরআনের আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা বুঝাচ্ছে যে, যদি নবী দাবীকারী কাফের না হয় তাহলে তাকে অস্বীকারকারী অবশ্যই কাফের হবে। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে মুনাফেকী ছাড় এবং সত্যিকারভাবে কোন একটা ফয়সালা করে নাও।"
- (কালিমাতুল ফাস্ল, পৃঃ১২৩)

মুহাম্মদ আলী লাহোরীর কথা ঃ কাদিয়ানীদের লাহোরী উপদলের আমীর মুহাম্মদ আলী লাহোরী 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স' এ লিখেছে- "আহমদী আন্দোলন ইসলামের সাথে ঠিক সেই সম্পর্ক রাখে, ইহুদী ধর্মের সাথে খৃষ্ট ধর্ম যে সম্পর্ক রাখে।" – (রাওয়ালপিন্ডি বিতর্ক ২৪০ পৃঃ হতে সংকলিত)

এ বক্তব্যটিতে মুহাম্মদ আলী লাহোরী আহমদীয়াতকে ইসলাম থেকে ভিন্ন ধর্ম হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে যেভাবে খৃষ্ট ধর্ম ইহুদী ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধর্ম। 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর ৫ম খন্ডের ৩১৮ পৃঃ সে লিখছে ঃ "ঐ সব মুসলমানের জন্য বড়ই আফসোস, যারা হযরত মির্জা সাহেবের বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ঐসব আপত্তিই উত্থাপন করছে যেগুলো খৃষ্টানরা নবী করীম (সঃ)—এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করে। ঠিক সে ভাবেই যেভাবে খৃষ্টানরা নবী করীম (সঃ)-এর বিরেধিতায় অন্ধ হয়ে ঐ সব আপত্তিকে মজবুত করে তুলছে ও বার বার উত্থাপন করছে যেগুলো ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিল। সত্য নবীর এই এক বড় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন যে, তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যা সকল নবীর বিরুদ্ধেই করা হয়েছিল। ফলে কোন লোক এমন আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট

বান্দাকে অস্বীকার করার দরুণ সে নবুওয়তের ধারাকেই যেন অস্বীকার করে। - (তাবদীলিয়ে আকায়েদ, পৃঃ ৪২)।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তা হলো মির্জা গোলাম আহমদ বা তার অনুসারীদের লেখায় কোন কোন স্থানে তাদের বিরোধিতাকারীদের জন্য মুসলমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে গেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে মালিক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কাদিয়ানী 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স' গ্রন্থের এক প্রবন্ধে লিখেছে ঃ "তিনি তার বিরোধিতাকারীদের প্রকাশ্য নামের কারণে তাদের জন্য মুসলমান শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা, কারো কোন নাম ব্যাপকতা লাভ করলে তখন তাতে নামের অর্থ বিদ্যমান না থাকলেও তাকে সেই নামেই ডাক দেওয়া হয়।" - (আহমদিয়্যাত কে ইমতিয়াযী মাসায়েল, 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর প্রবন্ধ)

মুসলমানদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি

পূর্বে উল্লেখিত আক্বীদা বিশ্বাসের দরুণ কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিগণিত করে। আর তাই মুসলমানদের সাথে তারা কোন প্রকার সম্পর্কও রাখতে রাজী নয়। কোন মুসলমানের সাথে আত্মীয়তা করা বা কোন মুসলমানের পিছনে নামায পড়া ইত্যাদি যে কোন কাজে তারা মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রাখা অবৈধ মনে করে। তেমনিভাবে কোন মুসলমানের জানাযার নামায পড়তেও তারা রাজী নয়।

অ-আহমদীর পিছনে নামায

মির্জা গোলাম আহমদ লিখেছে—যারা আমাদেরকে কাফের বলে এবং অস্বীকারের রাস্তা অবলম্বন করেছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। তাই, তাদের কারো এতটুকু যোগ্যতা নেই যে, আমাদের কেউ তাদের পিছনে নামায পড়বে। জীবিত লোক কি কোন মৃত লোকের পিছনে নামায পড়তে পারে? তাই মনে রেখো, খোদা তাআলা আমাকে যেমন জানিয়েছেন, তোমাদের জন্য হারাম এবং অকাট্যভাবে হারাম যে কোন মুকাফ্ফির ও অস্বীকারকারী বা কোন দ্বিধান্বিত ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে। বরং তোমাদের জন্য করণীয় এই যে, তোমাদের নামাযে ইমাম হবে তোমাদেরই দলভুক্ত কোন লোক। বোখারী শরীফের এক

হাদীসের অংশবিশেষে এরই দিকে ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন মসীহ পৃথিবীতে এসে যাবেন, তখন অন্য যারাই ইসলামের দাবী করবে তাদের পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিতে হবে এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের লোক হবে। অতএব, তোমরা এমনটাই করো। তোমরা কি চাও যে, খোদার বিধান তোমাদের মাথায় নেমে আসুক এবং তোমাদের সকল আমল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাক?" - (তোহফায়ে গোলরুভিয়া , টীকা, পৃঃ ২৮)

অ-আহমদীদের সাথে বিবাহ

মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে ঃ "হযরত মসীহ মাওউদ ঐ আহমদী ব্যক্তির উপর অত্যধিক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন অ-আহমদীর নিকট তার কন্যার বিবাহ দেয়। এক লোক তাঁর নিকট বারবার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে এবং কতগুলো অসুবিধাও পেশ করেছে, কিন্তু তিনি তাকে এ কথাই বলেছেন যে, মেয়েকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখ তবুও অ-আহমদীর নিকট বিয়ে দিও না। তাঁর মৃত্যুর পর লোকটি অ-আহমদীর ছেলের নিকট তার মেয়েকে বিয়ে দেয়। ফলে ১ম খলীফা তাকে আহমদীদের ইমামতি করা থেকে সরিয়ে দেন এবং দল থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি তাঁর খেলাফতের ছয় বছরের মধ্যে একবারও তার তওবা কবুল করেননি। অথচ সে বারবারই তওবা করতে ছিল। (এখন আমি তার খাঁটি তওবা দেখে তা কবুল করে নিচ্ছি।) - (আনোয়ারে খেলাফত, ৯৪ পৃঃ)

এ আলোচনার শেষে সে লিখেছে ঃ "কাউকে দল থেকে বের করে দেবার অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু কেউ যদি এ হুকুম অমান্য করে তাহলে আমি তাকে দল থেকে বের করে দেবো"। - (পূর্বোক্ত)

অবশ্য মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করা তাদের জায়েয রাখা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করে মির্জা বশীর লিখেছে ঃ "যদি বলো, আমাদের তো তাদের মেয়ে নেয়ার অনুমতি রয়েছে, তাহলে আমি বলবো, খৃষ্টান মেয়েকেও বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে"। - (কালিমাতুল ফাসল, ১৬৯ পৃঃ)

অ-আহমদীদের জানাযার নামায

মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে - "এখন আরো একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে। তাহলো, অ-আহমদী ব্যক্তি যেহেতু হযরত মসীহ মাওউদকে

অস্বীকার করে অতএব, তার জানাযা না পড়া উচিত। কিন্তু যদি কোন অ-আহমদীর ছোট বাচ্চা মারা যায়, তাহলে তার জানাযা কেন পড়া হবে না? সে তো আর মসীহ্ মাওউদকে অস্বীকার করে নাই। আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করি যদি তাই হয়, তাহলে হিন্দু এবং খৃষ্টানদের বাচ্চা ও শিশুদের জানাযা কেন পড়া হয় না? তাদের জানাজা পড়ে এমন ক'জন লোক আছে? মূল কথা হলো, পিতামাতার যে ধর্ম, শরীয়ত তাদের সন্তানের জন্য সেই ধর্মই নির্ধারণ করেছে। তাই অ-আহমদীর শিশুও অ-আহমদী। সুতরাং তাদের জানাযাও পড়া হবে না।

- (আনোয়ারে খেলাফত, ৯৩ পৃঃ)।

কায়েদে আযমের জানাযার নামায

পাকিস্তানের স্থপতি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা গেলে তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রঃ)। সে সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সে কাদিয়ানী হওয়ার দরুন কায়েদে আযমের জানাযায় অংশ নেয়নি। পরবর্তীতে মুনির ইনকোয়ারি কমিশনের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে খান সাহেব উত্তর দেন "নামাযে জানাযায় ইমামতি করেছেন যিনি (শিব্বির আহমদ উসমানী) তিনি আহমদীদের কাফের, ধর্মচ্যুত এবং হত্যার যোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই যে নামাযে তিনি ইমামতি করেছেন তাতে আমি যোগ দেবার ফয়সালা করতে পারিনি।" (অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্ট, পাঞ্জাব আদালত)।

কিন্তু আদালতের বাইরে যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আপনি আমাকে কাফের প্রশাসনের মুসলমান মন্ত্রী বলে ভাবতে পারেন অথবা মুসলিম প্রশাসনের কাফের কর্মচারী।

- ('জমিনদার লাহোর' ৮ ফেব্রু, ১৯৫০ সংখ্যা)

যখন পত্র পত্রিকায় তার এ কথা প্রচারিত হলো, তখন আসন্ন নাজুক পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে বলা হলো—জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় তিনি কায়েদে আযমের জানাজা কেন পড়েন নাই। সারা দুনিয়া জানে, কায়েদে আযম

আহমদী ছিলেন না, তাই আহমদী জামাতের কোন লোক তার জানাজা না পড়া কোন আপত্তির কিছু নয়। (ট্র্যাক্ট, আহরারী উলামা কি রাস্তগুই কা নমূনা।)

কাদিয়ানীদের পত্রিকা 'আল ফজল' এ প্রশ্নের জবাবে লিখে ঃ এটা কি বাস্তব নয় যে, আবু তালেবও কায়েদে আযমের মত মুসলমানদের অনেক উপকার করেছে। কিন্তু তার জানাযা তো মুসলমান কেউ পড়েনি, এমনকি রাসূল (সঃ)ও পড়েননি। - (২৮-অক্টোবর, ১৯৫২ সংখ্যা)।

অনেকে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের এই কাজে আশ্চর্য হন। কিন্তু বাস্তবে তা আশ্চর্যজনক কোন কাজ বা সংবাদ নয়। কেননা তিনি যে ধর্মগ্রহণ করেছেন তার স্বাভাবিক চাহিদাই ছিল এরূপ। তার ধর্ম, তার বিশ্বাস, তার জীবন যাপন সব কিছুই ইসলামের বিপরীত, এ অবস্থায় শিব্বির আহমদ উসমানী (রঃ) এর ইমামতিতে জাফরুল্লাহ খান নামায পড়বে কিভাবে?

কাদিয়ানীরা নিজেরাই নিজেদেরকে পৃথক সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী করেছে ঃ উপরোক্ত আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মির্জায়ী মতবাদ মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদ, যার সাথে মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন সম্পর্ক নেই, এবং তাদের এ অবস্থান নিজেদের নিকটও স্বীকৃত, তাদের মতবাদ ও মুসলমানদের মতবাদ এক নয়। তারা মুসলমানদের সকল দল হতে ভিন্ন ও পৃথক একটি সম্প্রদায়। যেমন তারা অবিভক্ত ভারতে নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবেও মুসলিম সমাজ হতে আলাদা দল হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবী পেশ করেছিল।

মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলে, আমি আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের এক উপরস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট বার্তা পাঠিয়েছি যে, পারস্য এবং খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর মত আমাদের অধিকারও মেনে নেয়া হউক, যার প্রেক্ষিতে উক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, "তারাতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর তোমরা তো একটি ধর্মীয় গোত্র, অতঃপর আমি (মির্জা বশির) বল্লাম পারস্য এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ও একটি ধর্মীয় গোত্র যেভাবে তাদের অধিকার পৃথকভাবে মেনে নেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে আমাদের ব্যাপারেও তা মেনে নিয়া হউক। – (মির্জা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদের বয়ান, আল-ফজল, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৬।)

এর পরও কি উপরোক্ত দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির সামান্যতম সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে যে, মির্জায়ী উম্মতকে সরকারীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া যায় কিনা?

মির্জায়ী বর্ণনা সম্পর্কে এক জরুরী সতর্কতা

এখানে আরো একটি জরুরী বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহলো মির্জায়ীদের নব্বই বছরের কার্যক্রম এটাই বোঝায় যে, তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ভুল ব্যাখ্যা দিতেও দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। পূর্বে তাদের পরিস্কার লিখিত বর্ণনাসমূহ পেশ করা হয়েছে। যে সব বর্ণনায় তারা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। যত লিখিত বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে তা হতে অনেক বেশী পেশ করা যেতে পারতো কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল নিজেদের বক্তব্যে ও রচনাতে পরিস্কারভাবে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও "মনীর ইনকোয়ারী কমিশন"-এর প্রশ্নের জবাবে (কাদিয়ানীদের) উভয় দল বলেছে যে,"আমরা অ-আহ্‌মদিদের কাফের বলে ধারণা করি না"। এ কথা তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং তাদের পূর্ববর্তী উক্তির এত বিপরীত ছিল যে, "মনির ইন্‌কোয়ারী কমিশন"-এর জাষ্টিস সাহেব তা বিশ্বাস করতে পারেননি। সুতরাং তিনি তার রিপোর্টে লিখেছেন ঃ কাদিয়ানীরা অন্য মুসলমানদেরকে এমন কাফের ধারণা করে যারা ইসলামের গন্ডি বহির্ভুত? কাদিয়ানীরা আমাদের সম্মুখে সে অভিমত ব্যক্ত করেছে এসব লোকেরা কাফের নয়, আর "কুফর" শব্দ যা কাদিয়ানীদের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহার করেছে যার উদ্দেশ্য "কুফরে খফী" ইহা কখনো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না যে এসব লোক ইসলামের গন্ডি বহির্ভুত নয়। আমি এ বিষয়ের উপর কাদিয়ানীদের পূর্ববর্তী ঘোষণাসমূহ লক্ষ্য করেছি এবং আমাদের মতে এতে কাদিয়ানীদের কোন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে যারা নবী মানেনা তারা ইসলামের গন্ডি বহির্ভুত? আহ্‌মদীরা (কাদিয়ানীরা) আমাদের সামনে তাদের এ অভিমত প্রকাশ করেছে যে, এমন ব্যক্তিগণ কাফের নয়।

আর "কুফর শব্দ" যা আহ্মদী লিটারেচারসমূহে এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করছে, তার উদ্দেশ্য কুফ্রে খফী (গোপন কুফর) কিংবা অস্বীকার। এমন ব্যক্তিগণ ইসলামের গন্ডি বহির্ভুত এ উদ্দেশ্য মোটেই নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আহ্মদীদের পূর্ববর্তী অজস্র ঘোষণা দেখেছি, সুতরাং আমাদের মতে তাদের কোন বিশ্লেষণ এছাড়া হতে পারেনা যে, মির্জা গোলাম আহমদকে যারা নবী মানেনা তারা ইসলাম বহির্ভূত।

- (পাঞ্জাবে তাহ্কীকাতী আদালতের রিপোর্ট উর্দু, পৃঃ ২১২-১৯৪৪ ইং।)

অতএব যখন তদন্তের বিপদ সরে গেল তখন ঐ পূর্বের লিখা যার মধ্যে মুসলমানদের প্রকাশ্যে কাফের বলা হয়েছিল তা পুনরায় প্রকাশ আরম্ভ করে দিয়েছে। কারণ উহাতো সাময়িক একটা ধোঁকাবাজী ছিল, তাদের মূল আকীদার সাথে ঐ বিশ্লেষণের কোন সম্পর্ক নেই।

মহানবী (সঃ)-কে আখেরী নবী মানার ব্যাপারেও তাদের এ ধরনের অবস্থা দেখা যায়। মির্জায়ী নেতাদের অনেক লিখিত বক্তব্যের স্তুপ রয়েছে যার মধ্যে তারা প্রকাশ্যে বলেছে যে, মহানবী (সঃ)-এর পর নবীদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়নি বরং তার পরেও নবী আসতে পারেন। যেমন তার দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছিল, "আমার গর্দানের দুপাশে তরবারী রেখেও যদি আমাকে বলা হয় যে, তুমি একথা বল যে, মহানবী (সঃ)-এর পর কোন নবী আসবেনা তখন আমি তাকে বলব তুমি মিথ্যুক, বরং মহানবী (সঃ)-এর পরে নবী আসবেন এবং অবশ্যই আসবেন। - (আনোয়ারে খেলাফত, পৃঃ ৬৫, ১৯১৬ ইং)

বর্তমান পাকিস্তানের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর শপথ নামায় এ বাক্য সংযোজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আমি মহানবীর (সঃ) সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রতি এবং একথার উপর ঈমান রাখি যে মহানবী (সঃ)-এর পর আর কোন নবী হতে পারেনা। তখন কাদিয়ানীদের তৃতীয় খলিফা মির্জা নাছির আহ্মদ ঘোষণা দিয়েছে – আমি উক্ত শপথ নামার ব্যাপারে বড় চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, একজন আহমদীর পক্ষে এ শপথ গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নেই।

- (আল-ফজল, রবওয়া, ১৩ই মে, ১৯৭৩ ইং খণ্ড ১০৬, পৃঃ ৪-৫)

উল্লেখ্য যে, যে কথায় দ্বিতীয় খলিফার মতে মানুষকে মিথ্যুক বানিয়ে দেয়া আর যার স্বীকারোক্তি গর্দানে তরবারীর আঘাত আসলেও জায়েজ ছিল না। যখন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদ ঐ কথার উপর নির্ভরশীল

হয়ে পড়েছে তখন ঐ কথার উপর শপথ করাও তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

অতএব মির্জায়ীদের প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, যখন তারা কোন জায়গায় বেকায়দায় পড়ে যায় তখনকার বক্তব্য সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছু থাকে না, তাদের বাস্তব চেহারা দেখতে হলে তাদের মূল দলীয় রচনাবলী এবং দীর্ঘ নব্বই বছরের আচার-আচরণ সম্পর্কে অবগতি অত্যাবশ্যক।

কাদিয়ানীরা হয়তো তাদের পূর্বেকার আকীদা বিশ্বাস, লিখা এবং বয়ান বিবৃতি হতে প্রকাশ্যে তওবা করে ঘোষণা দিবে এবং তাদের কার্যক্রমে প্রমাণ করবে যে, মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর অনুসরনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা তাদের ভ্রান্ত আকীদার উপর তারা অটল বলে ঘোষণা করুক। এছাড়া তৃতীয় কোন পথ অবলম্বন করার মানেই হবে ধোঁকা এবং সাময়িকভাবে বাঁচার উপায়। এতে কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তি কিংবা কোন সত্যের অনুসন্ধানীকে ধোঁকা হতে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

লাহোরী জামাতের পরিচয়

কাদিয়ানীদের একটি উপদল, যাদের নেতা মুহাম্মদ আলী লাহোরী, তারা প্রায়শঃ এ দাবী করে যে, তারা মির্জা গোলাম আহমদকে নবী স্বীকার করে না, বরং তারা তাকে মুজাদ্দিদ, প্রতিশ্রুত মাহদী এবং মুহাদ্দাছ বা ইলহাম প্রাপ্ত বলে মান্য করে। তাই, তাদেরকে ধর্মচ্যুত এবং কাফের বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি তাই? এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার পূর্বে লাহোরী জামাতের ইতিহাস ও তাদের আক্বীদার পূর্ণ বৃত্তান্ত আলোচনা করা আবশ্যক। তাই সংক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

লাহোরী জামাতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মির্জা গোলাম আহমদ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি হয়নি, ফলে কোন উপদলও সৃষ্টি হয়নি। তাই গোলাম আহমদকে নবী বলে স্বীকার করার মধ্যেও কোন নতুন কথার উদ্ভব হয়নি। এমনকি মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর প্রথম খলীফা

হাকীম নূরুদ্দীনের আমলেও তাদের মাঝে কোন বিভক্তির জন্ম হয়নি। তখন পর্যন্ত মুহাম্মদ আলী লাহোরী এবং তার সহচর সকলেই গোলাম আহমদকে নবী এবং রাসূল বলে স্বীকার করেছে। সেই সাথে আরো যে সকল ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস আছে তারা একবাক্যে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে।

মুহাম্মদ আলী লাহোরী 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স' নামের এক পত্রিকার সম্পাদক ছিল। সে তার এই পত্রিকায় বিভিন্ন বক্তব্য প্রচার করেছে তাতে গোলাম আহমদকে নবী ও তার বিরোধিতাকারীদের কাফের বলার বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, "নবী করীম (সঃ)-এর অন্তর্ধানের পর খোদা তাআলা নবুওয়ত ও রেসালতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে যারা নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসারী, তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে তারই আখলাক চরিত্রের নূর হাছিল করে, তাদের জন্য এ দরজা বন্ধ হয়নি।" - (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, ৫ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ)

অপর একটি বক্তব্য লক্ষ্য করুন–বিরোধীরা যে অর্থই করুক, আমরা এ বিশ্বাসের উপর স্থির রয়েছি যে, খোদা নবী সৃষ্টি করতে পারেন, সিদ্দীক বানাতে পারেন এবং শহীদ ও সালেহ এর মর্যাদা দান করতে পারেন। আমরা যার হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেছি সে ছিল সত্যবাদী খোদার নির্বাচিত ও সম্মানিত রাসূল।

এটা শুধু মুহাম্মদ আলী লাহোরীর একার বক্তব্য নয়, তার অনুসারীদেরও এই একই বক্তব্য ও বিশ্বাস। তার প্রমাণ মিলে তাদের পত্রিকা 'পয়গামে সুলেহ'-এর নিম্নোক্ত বর্ণনায়। বর্ণনাটি তাদের এক ওয়াদার বিবরণ।

"আমরা হযরত মসীহ মাওউদ ও অঙ্গিকারকৃত মাহদীকে এই যুগের নবী রাসূল এবং নাজাতদাতা বলে বিশ্বাস করি। - (পয়গামে সুলেহ, ১৬ই অক্টোবর, ১৯১৩)

এই উদ্বৃতিগুলোর পর লাহোরী জামাতের আকীদা - বিশ্বাস সম্পর্কে আর কোন অস্পষ্টতা বা দ্বিধাদ্বন্দ অবশিষ্ট থাকেনা। কিন্তু প্রথম খলীফার মৃত্যুর পর যখন গোলাম আহমদের পুত্র মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ দ্বিতীয় খলীফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তখন তার

বিরোধিতা করে এ উপদলটির উদ্ভব হয়। তারা বশীরুদ্দীনের হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ভিন্ন হয়ে যায়। তারা লাহোরে ভিন্নভাবে জমায়েত হতে থাকে। মির্জা বশীরুদ্দীন খলীফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ১৯১৪ সনের ১৪ মার্চ আর লাহোরীদল তার বিরোধিতায় ভিন্নভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠান করে ২২ মার্চ। এভাবে ভিন্ন হওয়ার পর তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু নতুন নতুন আক্বীদা বিশ্বাসের আলোচনা করে। কিন্তু এতো দিন তারা নবী হিসাবে যে বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে আসছিল, তা থেকে প্রত্যাবর্তন বা তওবার কোন ঘোষণাই কখনো কোন পত্রিকায় বা পুস্তকে বা বক্তৃতায় উল্লেখ করেনি।

অতএব, আমরা নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, লাহোরী জামাতও কাদিয়ানীদের একটি উপদল হিসাবে মূল দলটির ন্যায় ভ্রান্ত ও ইসলামের গন্ডি বহির্ভুত। এছাড়া তাদের একথা যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তারা পূর্বে নবী মেনে থাকলেও এখন নবী বলে স্বীকার করেনা, অতএব এটাই তওবা। তাহলেও আমাদের বক্তব্যে কোন পরিবর্তন আসবে না। কেননা, মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে নবী ও রাসূল বলার দরুন সে আর ইসলামের আওতার ভিতর থাকেনি, বরং মুরতাদ ও কাফের হয়ে গিয়েছে। অতএব তাকে কোন ধরনের সম্মান প্রদান বা তাকে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেওয়ারও কোন বৈধতা অবশিষ্ট থাকেনি। এ অবস্থায় তারা এক মুরতাদকে মুজাদ্দিদ মেনে তার অনুসরণ ও আনুগত্য করে চলেছে। আর কোন কাফের ব্যক্তির অনুসারীরা কখনোই ইসলামের সীমার ভিতর থাকতে পারেনা। ফলে লাহোরী জামাত এধরনের নতুন নতুন বক্তব্য প্রদানের পরও মূল কাদিয়ানীদের ন্যায় কাফের ও মুরতাদ বলেই গণ্য হবে।

লাহোরী জামাত শব্দের আড়ালে নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসকে গোপন রাখতে চায়। অথচ তাদের মুজাদ্দিদ শব্দের ব্যাখ্যা ঠিক তাই বুঝায় যা জিল্লী ও বুরুযী বলে দাবী করা হয়েছে। লাহোরী দলটি ভিন্ন হওয়ার বহু পরের লেখা পুস্তক "আন নুবুওয়ত ফিল ইসলামে" মুহাম্মদ আলী লাহোরী কি লিখেছে দেখুন- "নবুওয়ত তো শেষ তবে তার

একটি প্রকার এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। সে প্রকারটি হচ্ছে সুসংবাদ প্রাপ্তি । আর এ প্রকারের নবুওয়ত ঐ সব লোকের ভাগ্যে রয়েছে যারা নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করে এবং রসূলের মাঝে আত্মবিলোপের স্তরে পৌঁছে যায়।"

মূল দলের সাথে পার্থক্য সৃষ্টির অপচেষ্টায় শব্দের কিছু হেরফের করা ব্যতীত আকীদায় কোন পরিবর্তন তারা করেনি। তাদের শব্দের হেরফের লক্ষ্য করুন ঃ "হযরত মসীহ মাওউদ তাঁর পূর্বের ও পরের সব লেখায় একই মূলনীতি বর্ণনা করে গেছেন। তাহলো নবুওয়তের দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে, তবে এক প্রকার নবুওয়ত এখনো মিলতে পারে। এ কথা বলা হবে না যে, নবুওয়তের দরজা খোলা, বরং এ কথা বলা হবে যে নবুওয়তের দরজা বন্ধ। তবে এক প্রকার নবুওয়ত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্তই তা বহাল থাকবে। এভাবে বলা হবে না যে, কোন লোক এখনো নবী হতে পারে, বরং এ কথা বলা হবে যে, এখনো এক ধরনের নবুওয়ত নবী করীম (সঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর নাম কোথাও সুসংবাদ প্রাপ্তি, কোথাও আংশিক নবুওয়ত, কোথাও মুহাদ্দাছ বা ইলহাম প্রাপ্তি আর কোথাও খোদার সাথে কথা বলা রাখা হয়েছে, যে নামই রাখা হোক না কেন, এর বড় নিদর্শন হচ্ছে কোন মহান ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)- এর অনুসরণের মাধ্যমেই তা লাভ করতে পারে। রাসূলের মাঝে আত্মনিমগ্ন হওয়ার ফলে তা মিলে, মুহাম্মদী নবুওয়ত থেকেই তার প্রাপ্তি। এটা নবীর বাতির আলো, এটা মৌলিক কোন বিষয় নয় বরং জিল্লী।

এভাবে শব্দের হেরফের করলেও তাদের মূল আকীদা অনুধাবনে কারোরই কোন অসুবিধা হয় না। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তারাও মূলদলের ন্যায় মির্জা গোলাম আহমদকে জিল্লী বলে স্বীকার করে। এজন্যেই কবি ইকবাল মন্তব্য করেছেন-"আহমদী আন্দোলন দুটো দলে বিভক্ত যা কাদিয়ানী এবং লাহোরী নামে পরিচিত। প্রথম দলটি আহমদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে নবী বলে স্বীকার করে আর দ্বিতীয় দলটি বিশ্বাস হিসাবে অথবা অন্য কোন কারণে এ মতবাদটিকে কিছুটা হাল্কাভাবে উপস্থাপন করা উচিৎ বলে মনে করে। - (হরফে ইকবাল, ১৪৯ পৃঃ)

উপরোক্ত বক্তব্যে কবি ইকবাল লাহোরীদের কাদিয়ানীদের সমপর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। আর বাস্তব অবস্থাও তাই। তারাও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যুক বা মিথ্যাবাদী বলা হলে তাকে কাফের বলে অভিহিত করে, যেমন মূল দলটিও কাফের বলে দিতে বিলম্ব করেনা। এর সপক্ষে নীচের উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট।

"যেহেতু কাফের বলা ও মিথ্যুক বলা এক বরাবর অর্থ প্রকাশ করে, তাই তারা দু'দলই নবী দাবীকারীকে কাফের বলছে। তাই এই হাদীসের আওতায় এ দুটো দলই স্বয়ং কুফরীর নীচে এসে যাবে।"

- (রদ্দে তাকফিরে আহলে কিবলা, মুহাম্মদ আলী লাহোরীর লিখিত গ্রন্থ ২৯ ও ৩০ পৃঃ)

অ-আহমদীদের কাফের বলার মাঝে তাদের দুটো দলের বক্তব্য একই রয়েছে। কাদিয়ানীরা সকল মুসলমানকে আহমদী না হওয়ার দরুন কাফের বলে, অপরদিকে লাহোরীরা বলে মির্জা গোলাম আহমদকে মিথ্যাবাদী ও কাফের বলার কারণে কাফের। তাহলে পরিণতিতে উভয় দলের বক্তব্য একই, কেবল প্রকাশের ভাব ও ভাষা ভিন্ন।

লাহোরী জামাতের কাফের হওয়ার কারণ

এসব কিছু আলোচনার পর এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাদিয়ানী এবং লাহোরী এ উভয় দলে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তাই, কাদিয়ানীদের ন্যায় এরাও কাফের। এদের কুফরীর কারণ সংক্ষেপে নীচে লেখা হলো।

(১) মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবী দাবী করা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে সে ইসলামের সীমা থেকে বহির্গত মুরতাদ ও কাফের। এ অবস্থায় লাহোরীরা তাকে মসীহ, মাহদী ও মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দেয়ায় তারাও ধর্মচ্যূত কাফের।

(২) কিয়ামতের পূর্বে যে ঈসা মসীহ অবতরণ করবেন এবং মাহদীর আগমন ঘটবে, তার সাথে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সামান্যতম সামঞ্জস্যও নেই। গোলাম আহমদের নিজস্ব জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলে এবং কোরআন, হাদীস ও ইজমার

প্রতি মনোনিবেশ করলে তার এ দাবীর অসারতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এ অবস্থায় তাকে মসীহ বা মাহদী বলা হলে কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করা হয়। অথচ লাহোরীরা তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী স্বীকার করে কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করছে। ফলে তারা কাফের হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৩) মির্জা গোলাম আহমদ হাজারো কুফরী কথাবার্তা বলার পরও লাহোরীরা তাকে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতিচ্ছবি, তাঁর মাঝে আত্মনিমগ্ন ইত্যাদি বলে তার জন্যে নবুওয়ত স্থির করেছে। এ আকীদা থাকা অবস্থায় লাহোরীরা কখনোই মুসলমান হতে পারে না।

(৪) মির্জা গোলাম আহমদের বই পুস্তকে হাজারো কুফরী কথাবার্তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। লাহোরীরা তার এসব কথাকে অস্বীকার করার পরিবর্তে সকল কথাকে অনুসরণীয় এবং শরয়ী দলীল বলে স্বীকার করে। এসব কথাকেই তারা বিশ্বাস করে ও সত্য বলে গ্রহণ করে। এ অবস্থায় লাহোরীরা মুসলমান থাকে কি করে?

এক নজরে গোলাম আহমদের নবুওয়ত

খতমে নবুওয়তের আকীদার প্রকাশ্য বিরোধিতা করা ছাড়াও মির্জা গোলাম আহমদের লেখা আরও বহু কুফরী কথাবার্তায় ভরপুর। এখানে সবগুলো কথা তো আর আনা সম্ভব নয়, তবে নমুনা হিসাবে কিছু কিছু বর্ণনা করা হবে।

আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে

মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে হুযুর আকরাম(সঃ)-এর বহিঃপ্রকাশ বলে পরিচয় দিয়েছে বহুবার। সেই সাথে আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ বলেও নানা স্থানে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। যেমন ১৯০৬ সনের ১৫ মার্চের মনগড়া ইলহামের মাঝে একটি ইলহাম হলো, "তুমি আমার নিকট আমার বহিঃপ্রকাশের মর্যাদায় রয়েছো"।

- (রিভিউ অব রিলিজিয়ান্স, ৫ম খণ্ড সংখ্যা-এপ্রিল, ১৯০৬ সংখ্যা ৬২ পৃঃ)

(২) "আঞ্জামে আথম" গ্রন্থে তার ইলহামের বর্ণনা দিতে গিয়ে একস্থানে সে লিখে ঃ 'তুমি আমার নিকট আমার একত্ববাদ ও লা'শরীকত্বের ন্যায়"। - (আরবাঈন, ৩য় খণ্ড, ২৭ পৃঃ)

(৩) সে আগে লিখেছে - "আমি কাশফে দেখলাম আমিই স্বয়ং খোদা এবং আমি বিশ্বাস করলাম যে আমি তাই"। - (কিতাবুল বারিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ৭৮ পৃঃ - আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, ৫৬৪ পৃঃ)

(৪) দেখুন সে আরো কি লিখেছে - "দানিয়েল নবী তাঁর কিতাবে আমার নাম মীকাঈল রেখেছেন। হিব্রু ভাষায় মীকাঈল শব্দের অর্থ খোদার তুল্য। ঠিক এ যেন 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে উল্লেখিত ইলহাম (২ নং ইলহাম) এর সমার্থক শব্দ। - (আরবাঈন, ৩০ পৃঃ এর টীকা)

মির্জার ওহী কোরআনের বরাবর

মির্জা গোলাম আহমদের ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির এখানেই শেষ নয়। তার দাবী হচ্ছে, তার উপর যে তথাকথিত ওহী নাজিল হয় (যার মধ্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ধরনের কুফরী কথাবার্তা ও অর্থহীন বা অসার কথামালা) তা নাকি পবিত্র কোরআনের বরাবর। ফার্সী এক কবিতাতে সে বলেছে - "খোদার ওহী থেকে যা কিছু আমি শুনি, তা খোদার কসম, ভুলভ্রান্তি থেকে পাক ও পবিত্র বলে জানি। এর সবকিছুই কোরআনের মত নির্ভুল, পবিত্র এবং ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, এটাই আমার ঈমান। - (নুযূলুল মসীহ, ১ম মুদ্রণ, ৯৯ পৃঃ)

গোলাম আহমদ আরো দাবী করেছে, তার কাছে আগত ওহী কোরআনের ন্যায় মুজেযার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এই দাবীর পক্ষে সে একটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছে যা তার কিতাব 'এজাযে আহমদী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

নবী রাসূলদের সাথে দুর্ব্যবহার ঃ ইসলামী উম্মাহ সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করাকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সঃ) সকল নবীর চাইতে অধিক মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ--এতে কারো সামান্য সন্দেহও নেই। অথচ তিনিও অন্য কোন নবী বা রাসূল সম্পর্কে তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী বা মর্যাদা হ্রাসকারী একটি শব্দও কখনো বলেননি।

অপরদিকে মানবতার নিকৃষ্টতম স্তরে নেমে যাওয়া মির্জা গোলাম আহমদ নবীদের মর্যাদার বিপরীত নানা ধরনের কটুক্তি করে গেছে। কিছু নমুনা দেখুন–

১। ইউরোপের লোকদের মদ যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি করেছে তার কারণ তো এই যে, হযরত ঈসা(আঃ) মদপান করতেন কোন রোগের কারণে বা বরাবরের অভ্যাস হিসাবে। (কাশতিয়ে নূহ, টীকা, ১২০ পৃঃ)

২। কয়েক বছর ধরে আমার ডায়াবেটিস রোগের কারণে প্রতিদিন পনের বিশবার প্রসাব হয়। কোন কোন সময় তো একদিন একশবার করে পেসাব হয়। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিল, ডায়াবেটিসের জন্য আফিম বেশ উপকারী আর চিকিৎসার জন্য আফিম ব্যবহার কোন দোষ নাই। আমি উত্তরে বললাম, "আমি যদি ডায়াবেটিসের জন্য আফিম খাওয়ার অভ্যাস করি তাহলে আমার আশংকা, লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বলবে, প্রথম মসীহ (অর্থাৎ হযরত ঈসা-আঃ) তো ছিলেন মদ্যপ আর দ্বিতীয় মসীহ হলো আফিমখোর। - (নাসীমে দাওয়াত, ৬৯ পৃষ্ঠা, কাদিয়ান)

৩। এক কবিতায় সে লিখেছে -

'মরিয়ম তনয় (ঈসা-আঃ)-এর আলোচনা বাদ দাও, গোলাম আহমদ তার চেয়ে উত্তম।

পরবর্তীতে সে লিখেছে- "এ কথাগুলো নিছক কবিতার বাগাড়ম্বর নয়, বরং বাস্তব। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যদি খোদার সাহায্য সহযোগিতা মরিয়ম পুত্র মসীহ থেকে আমার বেশী না হয়ে থাকে, তাহলে আমি মিথ্যুক। - (দাফেউল বালা, ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা, ৩য় মুদ্রণ)

৪। "ইযালায়ে আওহাম" নামক গ্রন্থে গোলাম আহ্মদ এক ফার্সী কবিতাতে লিখেছে–

"আমি সেই যে পূর্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণ হিসাবে এসেছি। ঈসার কি যোগ্যতা রয়েছে যে সে আমার মিম্বরে পা রাখবে।" - (ইযালায়ে আওহাম, ১ম মুদ্রণ, ১৫৮ পৃষ্ঠ)

৫। খোদা এই উম্মতের মধ্য থেকে একজনকে মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হিসাবে পাঠিয়েছেন। ... যে পূর্বের মসীহ (অর্থাৎ

হযরত ঈসা-আঃ) থেকে বহু উন্নত ও মর্যাদার অধিকারী যার নাম রেখেছেন তিনি গোলাম আহমদ। - (দাফেউল বালা, ১৩ পৃঃ)

৬। আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমার এ যুগে মসীহ ইবনে মরিয়ম থাকতেন, তাহলে আমি যতটুকু কাজ করেছি তিনি কখনোই ততটুকু করতে পারতেন না এবং আমি যে নিশান-পতাকা উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি, তা তিনি কখনোই প্রকাশ করতে পারতেন না। - (হাকীকাতুল ওহী, ১৪৮ পৃঃ কাদিয়ান)

৭। মসীহ ইবনে মরিয়মের সত্যবাদিতা বর্তমান যুগের মসীহের সত্যবাদিতার চাইতে অধিক নয়। বরং ইয়াহইয়া(আঃ) তার চাইতে উত্তম ছিলেন। কেননা, তিনি মদপান করতেন না। আর এ কথাও কখনো শোনা যায়নি যে, কোন বেহায়া বাজারী মহিলা তার অর্জিত অর্থের বিনিময়ে কেনা আতর নিয়ে এসে ইয়াহইয়া(আঃ)-এর মাথায় লাগিয়েছে বা হাত দিয়ে বা মাথার চুল দিয়ে তাঁর শরীর ছুয়েছে অথবা কোন প্রকার আত্মীয়তাহীন যুবতী নারী তার খেদমত করেছে। এ জন্যেই খোদা তাআলা পবিত্র কুরআনে ইয়াহইয়া (আঃ)-কে 'হাসূর (পবিত্র)' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মসীহকে সে উপাধি দেননি। কেননা, এসব কাহিনী তার এ উপাধি প্রাপ্তির বিপরীতে সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল। - (দাফেউল বালা-এর ভূমিকা)

৮। সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে সে বলেছে—"আমি দাবী করে বলতে পারি আমার এমন শত শত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টভাবে সেগুলো ফলেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এসবের সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু যদি অতীত নবীদের মাঝে এমন কোন নমুনা তালাশ করা হয়, তাহলে নবী করীম (সঃ) ব্যতীত আর কোন স্থানে এবং কোন নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। - (কাশতিয়ে নুহ, ১৪ পৃঃ)

টীকা ঃ—

(ক)এ পর্যায়ে মির্জা গোলাম আহমদের সত্যবাদিতার নমুনা হিসাবে তার জীবনের দু'চারটি দিক ও ঘটনার উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। তাই প্রামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা তার সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করছি।

(১) মির্জা গোলাম আহমদের বিশিষ্ট মুরীদ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক গোলাম আহমদ যে সব সময় চোখ নীচু করে রাখতো তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছে ঃ

"হযরত মসীহ মাওউদের ভিতর বাড়ীতে আধাপাগলা ধরনের এক মহিলা সেবিকা হিসাবে থাকতো। একবার সে করলো কি, যে কামরায় বসে হযরত মসীহ মাওউদ লেখা-পড়া করতেন সে কামরার কোণায় গিয়ে দাঁড়ালো যে কোণায় পানির কলসী রাখা থাকতো। এখানে তার কাপড়-চোপড় সব খুলে আদুল গায়ে বসে বসে সে গোছল করতে লাগলো। হযরত (গোলাম আহমদ) কিন্তু তখনো নিজের কাজেই ব্যস্ত, সে যে কি করছে সেদিকে তার বিন্দুমাত্র লক্ষ্যই ছিল না। - (জিকরে হাবীব, ৩৮ পৃঃ কাদিয়ান)

(২) আয়েশা নামের এক যুবতী নারী মির্জা গোলাম আহমদের পা দাবাতো। তার স্বামী গোলাম মুহাম্মদ লিখছে, "দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী আমার স্ত্রী যে, হযরতের পা দাবাতো, তা তিনি খুব পছন্দ করতেন। - (আল ফজল, ২০শে মার্চ, ১৯২৮ সংখ্যা, ৮ পৃঃ)

(৩) এছাড়া যে সকল বেগানা মহিলা তার বাড়ীতে থাকতো এবং নানা ধরনের খেদমতে নিয়োজিত ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে মির্জা বশীর আহমদ কৃত "সীরাতুল মাহদী" নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় ও ৩য় খন্ডের ২১,৩৫,৮৮,১২৬,২১৩ ও ২৭৩ পৃষ্ঠায়)। অথচ সাধারণ লোকদের জন্য মির্জার ফতোয়া ছিল–বৃদ্ধার সাথে হাত মিলানোও জায়েয নয়।" - (পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

(৪) মুফতী সাদেক লিখেছে -"একবার রাত দশটার কাছাকাছি বাজে, আমি থিয়েটার দেখতে চলে গেলাম, যা একেবারে বাসার অতি নিকটেই ছিল। হযরত বললেন, "একবার আমিও গিয়েছিলাম, যাতে জানা যায় ওখানে কি হয়। - (জিকরে হাবীব, ১৮ পৃঃ)।

নবী করীম (সঃ)–এর সাথে দূর্বিনীত আচরণ

সকল নবীর চেয়ে নিজেকে অধিক মর্যাদার অধিকারী বলে দাবী করেও মির্জার আত্মতৃপ্তি হয়নি। বরং নবীশ্রেষ্ঠ রাসূলে মকবুল (সঃ)-এর

মর্যাদার মিনারেও সে তার নাপাক হাত বাড়াবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে লিখেছে ঃ

"খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, এখন মুহম্মদ নামের তেজোদীপ্ততা প্রকাশ করার আর সময় থাকেনি। অর্থাৎ তেজোদীপ্তি নামের কার্যকারিতা এখন আর অবশিষ্ট নেই। কেননা, নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত তার তেজ প্রকাশ পেয়েছে। এখন সূর্যের কিরণ সহ্য করার সময় আর থাকেনি, বরং এখন প্রয়োজন চাঁদের ঠান্ডা আলো। আর আহমদ নামের মাধ্যমে এখন আমি তাই।" - (আরবাঈন, ৪র্থ খণ্ড, ১৭ পৃঃ)

এছাড়া 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' গ্রন্থের বিভিন্ন উদ্ধৃতি তো এই পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সে নিজেকে নবী করীম (সঃ)-এর দ্বিতীয় ও পূনর্জন্ম বলে দাবী করেছে এবং তার ভাষ্যমতে এই নব প্রকাশ প্রথম প্রকাশের চাইতে অধিকতর মজবুত, ভারী ও অধিকতর পূর্ণতার অধিকারী। - (খুতবায়ে ইলহামিয়া, ২৭২ দ্রঃ)

'কাসীদায়ে ইজাযিয়া' যাকে মির্জা কুরআনের বরাবর বলে দাবী করেছে তার একটি চরণ হচ্ছে ঃ

তাঁর (অর্থাৎ নবী করীম সঃ-এর) জন্য চন্দ্রগ্রহণ ঘটেছিল আর আমার জন্য সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিতে গ্রহণ লেগেছে। এরপরও কি তুমি অস্বীকার করবে? - (ই'জাযে আহমদী, ৭১ পৃঃ)

সাহাবাদের প্রতি দূরাচরণ

যে দূরাচার নবী করীম(সঃ)-এর সাথে বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য আচরণ প্রকাশ করে, নবীর প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের সাথে তার আচার-আচরণ যে কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। তবুও নমুনা হিসাবে আমরা কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি ঃ

(১) যে লোক আমার দলভুক্ত হবে, সে প্রকৃতপক্ষে নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর সাহাবার অন্তর্ভূক্ত হবে। – (খুতবায়ে ইলহামিয়া, ২৫৮ পৃঃ)

(২) আমিই সেই মাহদী, যার সম্পর্কে ইবনে সীরিনের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, "সে কি হযরত আবুবকর(রাঃ)-এর মর্যাদায় রয়েছে? ইবনে

সীরিন তার জবাবে বলেছেন, "আবু বকর কেন, তিনি তো অনেক নবীর থেকেও উত্তম"। - (ইশতিহার মিয়ারুল আখয়ার, ১১ পৃষ্ঠা)

(৩) পুরানো খেলাফত নিয়ে বিতর্ক করোনা, নতুন খেলাফত নিয়ে আলোচনা করো। তোমাদের মাঝে এক 'জীবিত আলী' রয়েছে, আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে 'মৃত আলী' খুঁজে বেড়াচ্ছো"। - (মালফুজাতে আহমদিয়া, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)

(৪) কতক মূর্খ সাহাবী, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সামান্য অংশও মিলেনি, তারা এই আকীদা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। - (বারাহীনে আহমদিয়া, ৫ম খণ্ড, পরিশিষ্ট, ১২০ পৃঃ)

এখানে মির্জা 'মূর্খ সাহাবী' শব্দটি হযরত উমর ও আবু হোরায়রা(রাঃ)-এর জন্য ব্যবহার করেছে। - (খুতবায়ে ইলহামিয়া, ১৪৯ পৃঃ ও হাকীকাতুল ওহী, ৩৩ ও ৩৪ পৃঃ)

নবী-পরিবারের প্রতি অসদাচরণ

(১) মির্জা গোলাম আহমদ বেয়াদবী ও দুশ্চরিত্রতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে তার নিম্নোক্ত কথায়। সে লিখেছে-"হযরত ফাতেমা(রাঃ) কাশফের হালতে তাঁর উরুতে আমার মাথা রেখেছেন এবং দেখায়েছেন যে আমি তারই গর্ভ থেকে এসেছি"। - (এক গালতীকা ইযালা, টীকা, ১১ পৃঃ)

(২) "আমি খোদার হাতে নিহত, আর তোমাদের হুসাইন(অর্থাৎ হুসাইন (রাঃ) শত্রুর হাতে নিহত। সুতরাং পার্থক্য তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য"। - (এজাযে আহমদী, ৮১ পৃঃ)

(৩) তোমরা খোদার মাহাত্ম ও সম্মান ভুলে কেবল হুসাইন নিয়ে ব্যস্ত, তোমরা কি তা অস্বীকার করতে পার? ইসলামের জন্য এটা এক মুসিবত বৈকি। কস্তুরী সুগন্ধির পাশেই গুইসাপের স্তুপ"। -(পূর্বোক্ত, ৮২ পৃঃ)

(৪) প্রতি মূহূর্তে আমি কারবালা সফর করে চলেছি। শত শত হুসাইন আমার জামার ভিতরেই অবস্থান করছে। - (নুযুলুল মসীহ, ৯৯ পৃঃ)

(৫) হুজুর(সঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের মানহানি করে সে নিজের সন্তানদের 'পাক পাঞ্জাতন' বলে সম্মানিত হওয়ার দাবী করে এক কবিতায় সে লিখেছে "আমার সন্তান-সন্ততি, সব তোমারই দান, তোমারই সুসংবাদে তারা জন্মগ্রহণ করেছে। এ পাঁচজন যারা উত্তম

বংশের - এরাই পাঞ্জাতন, যাদের উপর সম্মানিত বংশের ভিত্তি প্রোথিত"। - (দুররে ছামীন, উর্দু, ৪৫ পৃঃ)

ইসলামী শিআ'রের অমর্যাদা

মির্জা বশিরুদ্দীন মাহ্মুদ লিখেছে, বর্তমান যুগে খোদা তাআ'লা কাদিয়ান শহরকে সারা দুনিয়ার আবাদ এলাকাগুলোর মা করে দিয়েছেন। তাই এখন ঐ এলাকা পূর্ণ রুহানী জীবন লাভ করতে পারবে যা এই শহরের স্তন থেকে দুধপান করবে"। - (হাকীকাতুর রুইয়া, ৪৫ পৃঃ)

পরবর্তীতে আরো লিখেছে- "হযরত মসীহ মাওউদ এ ব্যাপারে খুবই তাকীদ করেছে। সে বলেছে, "যে বারবার এই শহরে না আসবে তার ঈমানের ব্যাপারে আমি আশংকা বোধ করছি"। তাই যে কাদিয়ান শহরের সাথে সম্পর্ক না রাখবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তোমরা খুবই সতর্ক থাকবে। এই তাজা দুধ কতদিন আর থাকবে? মায়ের দুধও এক সময় শুকিয়ে যায়। মক্কা ও মদীনার স্তনের দুধ শুকিয়ে যায় নাই কি? - (হাকীকাতুর রুইয়া, ৪৫ ও ৪৬ পৃঃ কাদিয়ান)

অন্যত্র হজ্জ্ব সম্পর্কেও অবমাননাকর উক্তি উল্লেখিত হয়েছে। "আজ জলসার দিন এবং আমাদের জলসা হজ্জ্বের ন্যায়।" হজ্জ্বের স্থানগুলো এখন এমন লোকের দখলে যারা আহমদীদের হত্যা করাও জায়েয বলে মনে করে। তাই খোদা তাআলা কাদিয়ানকেই এখন এই কাজের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। - (বারাকাতে খেলাফত, ৫ম পৃঃ কাদিয়ান)

মির্জা গোলাম আহমদ কবিতাকারে বলেছে-"কাদিয়ান-ভূমি এখন সম্মানিত এলাকা, মানুষ ও জীবজন্তুর ভীড় ও চলাচলের ব্যাপারে এটি হারাম শরীফের ন্যায় পবিত্র"। - (দুররে ছামীন, ৫২ পৃঃ)

ইসলাম এবং মুসলমানদের পরম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) সাহাবায়ে কেরাম, নবী পরিবারের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব — এদের সবার সাথে এমন খোলাখুলি বেয়াদবী করার পরও মির্জা গোলাম আহমদের মত নীচাশয় ব্যক্তিকে নবী, রাসূল, আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছায়া, নবীদের খাতাম বা সীলমোহ্‌র এবং মুহাম্মদ(সঃ)-এর উন্নততর দ্বিতীয় প্রকাশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার

অনুসারীদেরকে সাহাবায়ে কেরাম বলা হয়েছে আর তাই তাদের নামের পর 'রাদ্বিআল্লাহু আনহু' ব্যবহার করা হয়েছে। গোলাম আহমদের স্ত্রীকে উম্মুল মোমেনীন বলা হয়েছে, মির্জা গোলাম আহমদের স্থলাভিষিক্তদের 'খোলাফা' এবং 'সিদ্দীক' লকব দেওয়া হয়েছে, কাদিয়ান শহরকে 'হারাম শরীফ' এবং 'উম্মুল কোরা' (সব শহরের মা বা কেন্দ্রবিন্দু) বলা হয়েছে, বার্ষিক জলসাকে বলা হয়েছে হজ্জ্ব, এরপরও তাদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করতে হবে; কি অদ্ভুত ও আশ্চর্য দাবী।

গোলাম আহমদের ইলহাম

পাঠকবর্গের নিকট আমরা মির্জা গোলাম আহমদের কিছু ইলহাম এবং তার জীবন বৃত্তান্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করছি, যাতে খত্‌মে নবুওয়তের আকীদার প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র তার দাবীকৃত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করেই বুঝা যাবে যে, এ ধরনের ব্যক্তি আদৌ নবী হতে পারে কিনা। যেমন এক স্থানে সে লিখেছে "সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন কোন ইলহাম আমার নিকট এমন ভাষায় করা হয় যার সম্পর্কে আমার সামান্যতম অবগতিও নেই। যেমন,ইংরেজী, সংস্কৃত বা হিব্রু ভাষা ইত্যাদি"। - (নযুলুল মসীহ, ৫৭ পৃঃ)

অথচ কুরআনে পাকে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন-"আমি যে কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তাঁর জাতির ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছি যেন সে তার জাতিকে বিস্তারিতভাবে বুঝাতে পারে"। স্বয়ং গোলাম আহ্মদ অন্যত্র বলেছে-"এটা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ ও অর্থহীন যে মানুষের মুখের ভাষা এক আর ইলহাম হবে অন্য ভাষায় যা সে নিজেই বুঝতে পারবে না। এটা এজন্যই যুক্তিবিরুদ্ধ যে তাহলে বান্দাকে অসম্ভব কাজের আদেশ প্রদান করা হবে"। আর এ ধরনের ইলহামে কিইবা ফায়দা যা মানুষের বোধশক্তির উর্দ্ধে"।

এখন নিম্নে তার কিছু ইলহাম বর্ণিত হলো। এর মাঝে কুরআনে পাক ও নিজের ফায়সালার বিপরীত ঐ সব ভাষাতেও ইলহাম হয়েছে যেগুলো সে নিজেও বুঝতে সক্ষম নয়।

(১) হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! আমাকে কেন ছেড়ে দিলেন? এর পরবর্তী অংশ ওহীর দ্রুততার কারণে এর অর্থ স্পষ্ট হয়নি।
- (আল-বুশরা, ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃঃ)

(২) খোদা তাআলা এই ইলহামে আমার নাম মরিয়ম রেখেছেন। যেমন 'বারাহীনে আহমদিয়া'তে বর্ণিত হয়েছে। দুবছর পর্যন্ত আমি মরিয়মী বৈশিষ্ট্যে লালিত-পালিত হয়েছি এবং পর্দার অন্তরালে বাড়তে থেকেছি। এভাবে দুবছর অতিক্রান্ত হবার পর মরিয়মের ন্যায় ঈসার প্রাণ আমার মাঝে ফুঁকে দেয়া হয়েছে। রূপকভাবে আমাকে গর্ভবতী সাব্যস্ত করা হয়েছে, দরজা আমাকে খেজুর ডালের দিকে নিয়ে গিয়েছে এবং শেষ কয়মাসের পর যা দশ মাস থেকে বেশী নয়, আমাকে মরিয়ম থেকে ঈসায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। আর এইভাবে আমি মরিয়ম-তনয় হলাম। - (কাশ্‌তিয়ে নুহ, ৪৬ ও ৪৭ পৃঃ)

(৩) বাবু এলাহী বখশ তোমার হায়েয(ঋতুস্রাব) দেখতে চায় বা অন্য কোন নোংরামী বা নাপাকী সম্পর্কে জ্ঞাত হতে চায়, কিন্তু খোদা তাআলা তোমাকে নিজ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন যা ধারাবাহিক হতে থাকবে। আর তোমার ঋতুস্রাব তো হবে না, কেননা গর্ভে সন্তান এসে গেছে, এমন সন্তান যা আল্লাহ্‌র সন্তানতুল্য। - (হাকীকাতুল ওহী, পরিশিষ্ট, ১৪৩ পৃঃ)

(৪) আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। এ শব্দটির অর্থ কি তা এখনও জানা যায়নি। - (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, ৫৫৬ পৃঃ)

(৫) ১৯০৫ সনের মার্চ মাসে লঙ্গরখানার আমদানী অপ্রতুল হওয়ার কারণে ব্যয় নির্বাহে খুব সমস্যার সৃষ্টি হলো। মেহমান ছিল প্রচুর অথচ আমদানী ছিল কম। এজন্য দোয়া করা হলো। ১৯০৫ সনের ৫ মার্চ আমি স্বপ্নে দেখলাম এক লোক যাকে ফেরেশতা বলে মনে হচ্ছিল আমার সামনে এলো এবং বহু টাকা-পয়সা আমার আঁচলে ঢেলে দিল। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বললো "কোন নাম নেই"। আমি বললাম, অবশ্যই কিছু একটা নাম তো থাকবে। সে বললো, আমার নাম টেচী, টেচী। - (হাকীকাতুল ওহী, ৩৩২ পৃঃ)

লক্ষ্য করুন, গোলাম আহমদের নিকট আগত ফেরেশতা হয় প্রথমে মিথ্যা বলেছে অথবা পরে। সুতরাং বলতে হয়, যে নবীর ফেরেশতাই মিথ্যুক সে নবী কি করে সত্যবাদী হতে পারে?

(৬) ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ সনে কাশফের হালতে যখন হযরতের শরীর তেমন ভালো ছিল না, একটা শিশি দেখা গেল, যাতে লেখা ছিল, "খাকসার পিপারমেন্ট"। - (মুকাশাফাতে মির্জা, ৩৮ পৃঃ এবং তাজকিরা ৫২৫ পৃঃ)

(৭) মির্জা গোলাম আহমদের এক বিশিষ্ট অনুসারী কাজী ইয়ার মুহাম্মদ তার লিখিত 'ইসলামী কোরবানী'র গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছে-"যেমন হযরত মসীহ মওউদ একবার নিজের অবস্থা এরূপ প্রকাশ করলেন যে, কাশফের অবস্থা তার এমন হয়েছে যে, তিনি যেন নারী এবং আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে পৌরুষের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।" জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

(৮) এরপর খোদা তাআলা ইরশাদ করেছেন, এ দুটো শব্দ সম্ভবতঃ হিব্রু। এগুলোর অর্থ এখন পর্যন্ত এ অধমের বোধগম্য হয়নি। এরপর দুটো ইংরেজী কথা যেগুলো ওহীর দ্রুত আগমনের ফলে শুদ্ধভাবে শব্দ নির্ণয় করার পরও বোধগম্য হয়নি। সেগুলো হচ্ছে-I love you, I shall give you large party of Islam. - (বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় মুদ্রণ, ৫১৬ পৃঃ)

(৯) এক সময়ের কথা মনে এসেছে যে, ইংরেজীতে প্রথম ইলহাম হলো, I love you, I am Video, I shall help you, I can what I will do. এরপর বেশ জোরে ইলহাম হলো, যার তীব্রতায় শরীর কেঁপে উঠেছিল, We can what we will do. তখন এমন উচ্চারণ ও সুর শোনা গিয়েছে ঠিক যেন এক ইংরেজ মাথার উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাতে ভীতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এক স্বাদের ছোঁয়া ছিল যার ফলে অর্থ অনুধাবনের পূর্বেই অন্তরে এক সমবেদনা ও সহমর্মিতা অনুভূত হতো। আর ইংরেজীতে ইলহাম প্রায়ই হতো।
- (তাজকিরা মজমুয়া ইলহামাত, ২য় মুদ্রণ, ৬৪ ও ৬৫ পৃঃ)

(১০) কাশফের অবস্থায় একবার এক লোককে দেখানো হলো, সে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, হে রুদ্রগোপাল! তোমার স্তোত্র গীতায় লেখা হয়েছে"। - (পূর্বোক্ত, ৩৯০ পৃঃ)

(১১) আমার নিকট যে সব ইলহাম এসেছে, তন্মধ্যে একটিতে আমাকে বলা হয়েছে, হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লেখা হয়েছে। - (পূর্বোক্ত, ৩৯১ পৃঃ)

(১২) যখন আর্যজাতি কৃষ্ণের আগমনের অপেক্ষা করছে, তখন আমিই সেই কৃষ্ণ। এটা শুধু আমিই দাবী করছিনা বরং খোদা তাআলা বারবার আমাকে জানিয়েছেন যে, শেষ যুগে যে কৃষ্ণ আসার কথা ছিল সে তুমিই আর্যদের বাদশাহ্। - (পূর্বোক্ত, ৩৯১ পৃঃ)

(১৩) মির্জা বশীরুদ্দীন লিখেছে, খোদা তাআলা মসীহ মাউদের নাম রেখেছে আমিনুল মুলক জয়সিংহ বাহাদুর"। - (আল ফজল, ৫ এপ্রিল, ১৯৪৭ সংখ্যা) - (পূর্বোক্ত তাজকিরা, ৬৬৬ পৃঃ)

মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা গোলাম আহমদ একস্থানে লিখেছে, আমার সম্পর্কে যারা সু-ধারণা পোষণ করে না, তাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, আমার সত্যবাদিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর চাইতে বড় কোন কষ্টিপাথর নেই। - (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, ২৮৮ পৃঃ, লাহোর)

আমরা তাই এখানে নমুনা হিসাবে তার মাত্র দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করছি। যেগুলো পূর্ণ করার জন্য সে যারপর নাই চেষ্টা চালিয়েছে, তাবিজ-তুমার করেছে, এমনকি ঘুষের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু হা হতোস্মি। তার এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ হয়নি।

মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহ

মির্জা সাহেবের চাচাতো বোনের এক মেয়ে ছিল। নাম তার মুহাম্মদী বেগম। এই মেয়ের পিতা কোন এক প্রয়োজনে মির্জা সাহেবের নিকট এলে প্রথমে নানা কথা বলে তাকে বিদায় দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি তবুও বিদায় না হয়ে বরং আরো বেশী পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তখন মির্জা গোলাম আহমদ ইলহামের উদ্ধৃতি দিয়ে এক ভবিষ্যদ্বাণী করে—খোদা তাআলার পক্ষ হতে, আমার নিকট ইলহাম

হয়েছে যে, তোমার এ কাজটি পূর্ণ হবে একটি শর্ত সাপেক্ষে। তা হলো, তুমি তোমার বড় কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিবে।
- (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, ২৩০ পৃঃ)

লোকটির মর্যাদাবোধ ছিল। একথা শুনে লোকটি আর দেরী না করে চলে গেল। এরপর মির্জা গোলাম আহমদ নরম সুরে, শক্তভাবে, ধমকি দিয়ে, আজাব-গজবের ভয় দেখিয়ে কোন ভাবেই আর মেয়ের পিতাকে রাজী করতে পারলো না। অবশেষে সে চ্যালেঞ্জ করে বলল, "আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমার সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা দিচ্ছি এবং তা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ পাওয়ার পরই বলছি, সকল বাধা দূর করে খোদা তাআলা এই মেয়েকে অধমের বিবাহে সম্পাদন করবেন। - (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, ৩১ পৃঃ)

কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো, মুহাম্মদী বেগমের বিবাহ মির্জার সাথে হলো না, হলো সুলতান মুহাম্মদ নামের অন্য এক ব্যক্তির সাথে। তথাপি গোলাম আহমদের ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা বন্ধ হয়নি। সে এ অবস্থায় আবারো বললো—এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ এই মেয়ের এ অক্ষম বান্দার বিবাহে আসা তকদীরের ফয়সালা, যা কোনভাবেই টলতে পারে না। পরে সে নিম্ন বর্ণিত শব্দে তার ইলহাম বর্ণনা করলো "আমি এ মেয়েকে তার এ বিবাহের পর ফিরিয়ে এনে তোমাকে দেবো, আর আমার তকদীর কখনো বদলায় না"। - (মজমুয়া ইশতিহারাত, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)

এক সময়ে সে এই ভবিষ্যৎবাণী পূরনের জন্য দোয়াও করে, "আর আহমদ বেগের ছোট কন্যা পরিশেষে এই অধমের বিবাহে আসা এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি তোমার পক্ষ থেকেই হয় তাহলে তুমি তা এমনভাবে প্রকাশ করো যেন তা সকল সৃষ্টি জগতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায়। আর হে খোদা! যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী তোমার পক্ষ থেকে না হলে তুমি আমাকে অপমান ও হতমান অবস্থায় ধ্বংস করে দাও।"– (মজমুয়া ইশতিহারাত, ২য় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ)

কিন্তু এতকিছুর পরও মুহাম্মদী বেগম তার স্বামীর ঘরেই রইলেন। মির্জা গোলাম আহমদের বিবাহে আসার প্রয়োজন ছিল না তাই

আসেনি। আর এ অবস্থায় ১৯০৮ সনের ২৬শে মে উদরাময়ে আক্রান্ত হয়ে গোলাম আহমদ মৃতুবরণ করে। - (হায়াতে নাসের, ১৪ পৃঃ)

মির্জা গোলাম আহমদ মুহাম্মদী বেগমকে বিয়ে করার জন্য কি অপচেষ্টা চালিয়েছে তার কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় তারই মধ্যম পুত্র মির্জা বশীর আহমদ এম,এ,-এর লেখায়

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

আমার নিকট নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন মিয়া আবদুল্লাহ্ সানুবী। একবার মির্জা সাহেব (গোলাম আহমদ) জলন্ধর শহরে গিয়ে প্রায় একমাস অবস্থান করেন। সে সময় মুহাম্মদী বেগমের এক আপন মামা তাকে হযরতের নিকট বিয়ে দিতে চেষ্টা করে অবশেষে ব্যর্থ হয়। এটা সে সময়ের কথা যখন মুহাম্মদী বেগমের পিতা মির্জা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরী বেঁচে আছেন এবং তখনো মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে মির্জা সুলতান মুহাম্মদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়নি। মুহাম্মদী বেগমের এই মামা জলন্ধর এবং হুশিয়ারপুরের মাঝে ঘোড়াগাড়ীতে যাতায়ত করতো। সে হযরতের কাছ থেকে এই বিয়ে বাবদ কিছু পুরস্কারের আশাও করেছিল। মুহাম্মদী বেগমের বিয়ের ব্যাপারটা এই লোকটার হাতেই অধিকতর ন্যস্ত ছিল বিধায় হযরত (গোলাম আহমদ) তাকে কিছু দেয়ার ওয়াদাও করেছিল।

এ প্রসঙ্গে এ অধমের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ঐ লোকটি এ ব্যাপারে শুধুই কুমতলব এটেছিল। হযরতের নিকট থেকে কিছু খসানো ও তার উড়ানোই শুধু তার মতলব ছিল। কেননা, পরবর্তীতে দেখা গেছে, এই লোকই তার সাথীদের নিয়ে মুহাম্মদী বেগমকে অন্যত্র বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। - (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, ১৯২, ১৯৩ পৃঃ)

অথচ মির্জা গোলাম আহমদ অন্যত্র লিখেছে—আমরা এমন পীর এবং সেই সাথে এমন মুরীদকে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অপবিত্র জীবন যাপনকারী বলে ধারনা করি, যারা নিজের ঘরে বসে ভবিষ্যদ্বাণী তৈরী করে তা নিজের হাতে, নিজের প্রবঞ্চনা ও নানা অপচেষ্টার মাধ্যমে তা পূরণ করতে চেষ্টা করে ও করায়। - (সিরাজে মুনীর, ২৩ পৃঃ, কাদিয়ান)

তাহলে তারই বক্তব্যে সে কোথায় নেমেছে, চিন্তা করুন। অপরদিকে মুহাম্মদী বেগম নিজ স্বামী মির্জা সুলতান মুহাম্মদের ঘরে প্রায় চল্লিশ বছর সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করে, লাহোরে যুবক মুসলমান পুত্রদের নিকট অবস্থান করে ১৯ নভেম্বর '৬৬ ইং সনে মারা যান (ইন্না......রাজেউন)। - (সাপ্তাহিক আল-ই'তেসাম, লাহোর, ২৫ নভেম্বর '৬৬ সংখ্যা)

আথমের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা গোলাম আহমদ অমৃতসরে আব্দুল্লাহ্ আথম নামক পাদ্রীর সাথে পনের দিন পর্যন্ত লিখিত বিতর্ক চালিয়ে যায়। যখন এ বিতর্ক অর্থহীন প্রমাণিত হয় তখন মির্জা গোলাম আহমদ ১৮৯৩ সনের ৫ই জুন আব্দুল্লাহ্ সম্পর্কে একগাদা ভবিষ্যদ্বাণী করে। তার এ ভবিষ্যদ্বাণীর সারকথা ছিল "বিতর্কের এক দিন এক মাস বুঝাবে। অর্থাৎ পনের মাসের মধ্যে সত্যের বিপক্ষ দল যে কোন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকবে। (যদি আমি হই) আমাকে অপমানিত করা হবে, মুখে চুন-কালি দেয়া হবে, আমার গলায় রশি বেঁধে টেনে নেয়া হবে, আমাকে ফাঁসী দেয়া হবে। এ ধরনের যে কোন শাস্তির জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি"।

– (জংগে মুকাদ্দাস, ১৮৩ ও ১৮৪ পৃঃ)

অর্থাৎ মির্জার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ আথমের মৃত্যুর শেষ দিন ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ হয়। সেদিন পর্যন্তই আথমের মৃত্যু বা কোন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। উল্লেখিত শেষ দিনের কি অবস্থা, এর বিবরণ গোলাম আহমদের পুত্র মির্জা মাহমুদ আহমদের মুখে শুনুন।

কাদিয়ানে মাতম(আহাজারী)

আথম সম্পর্কে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তখন আহমদী জামাতের যে অবস্থা ছিল তা আমাদের কারো নিকট গোপন নেই। আমি তখন ছোট এক বাচ্চা, পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছরের, কিন্তু সেদিনের দৃশ্য আমার এখনো খুব ভালোভাবেই মনে আঁকা যেদিন ছিল আথম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ দিন। সেদিন কত যে কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা হয়েছে। আমি মোহররমের মাতমও এই পরিমাণ তীব্রতার সাথে কখনো হতে দেখিনি। হযরত মসীহ মাওউদ (মির্জা গোলাম আহমদ) একদিকে দোয়ায় নিমগ্ন, অন্যদিকে কিছু তরুন যুবক (যাদের কৃতকর্মের

পরবর্তীতে সমালোচনা ও নিন্দাও করা হয়েছিল) সে জায়গায় যেখানে ১ম খলিফা চিকিৎসার জন্যে বসতেন এবং যেখানে আজকাল মৌঃ কুতুবুদ্দীন সাহেব বসেন, সেখানে একত্রিত হলো। মহিলারা যেভাবে সুর করে বিলাপ করে তেমনিভাবে বিলাপ করে দোয়া করতে লাগলো। বহু দূর দূরান্ত থেকে তাদের কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। তাদের প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল এই দোয়া–হে আল্লাহ্! আথম মরে যাক। হে আল্লাহ্! আথম মরে যাক। কিন্তু এই কান্নাকাটি ও বিলাপের পরও আথম মারা গেলো না। – (মির্জা মাহমুদ আহমদের ভাষণ, আল-ফজল, ২০ জুলাই, ১৯৪০ সংখ্যা)

কাদিয়ানীদের সেদিনের অস্থিরতার আরো বিবরণ পাওয়া যায় মির্জা গোলাম আহমদের মধ্যম পুত্র মির্জা বশীর আহমদ এম,এ-এর আলোচনায়। আথমের মৃত্যু কামনায় গোলাম আহমদ কি কি তদবীর গ্রহণ করেছিল আর কিভাবে তাবীজ-তুমারের আশ্রয় নিয়েছিল তার সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে এই বিবরণীতে।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার নিকট মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানুবী বর্ণনা করেছে। যখন আথমের নির্ধারিত দিনের মাত্র একদিন বাকী, তখন মসীহ মাওউদ আমাকে (আবদুল্লাহ্কে) এবং মিয়া হামেদ আলীকে বললেন, এতোগুলি ছোলা-দানা আনো (তিনি কতগুলো দানা বলেছিলেন, তা এখন মনে নাই)। এবং দানাগুলোর প্রত্যেকটিতে অমুক সুরা এতোবার করে পড়ে ফুঁ দাও (আমার সে সংখ্যাটিও মনে নেই)। মিয়া আব্দুল্লাহ্ বলেন, কোন সুরা পড়তে বলেছিলেন তাও এখন মনে পড়ছে না। তবে এতটুকু মনে পড়ছে যে তা আলাম তারার ন্যায় কোন ছোট সুরা হবে। আমরা প্রায় সারা রাত জেগে সেই তদবীর শেষ করলাম। পড়া শেষ হলে আমরা সেই দানাগুলো হযরতের নিকট নিয়ে গেলাম। কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন, পড়া শেষ হলে দানাগুলো আমার নিকট নিয়ে আসবে। এরপর তিনি আমাদের কাদিয়ান শহর থেকে সম্ভবতঃ উত্তর দিকে বাইরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, দানাগুলো কোন অনাবাদ কূপে নিক্ষেপ করা হবে। আরো বললেন, আমি যখন দানাগুলো ফেলবো, তখন আমাদের সবাইকে খুব

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে নজর রেখে পিছনে মোটেই না তাকিয়ে সে স্থান ছেড়ে চলে আসতে হবে। হযরত এক অনাবাদ কূপে দানাগুলো ফেললেন আর জলদি করে সে স্থান ছেড়ে চলে এলেন, পিছনের দিকে তাকালেন না। - (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, ১৭৮ পৃঃ)

কিন্তু শত্রু বড় শক্ত আত্মার অধিকারী। এতোকিছু করার পরও ৫ তারিখ চলে গিয়ে ৬ তারিখের সূর্যোদয় হলো এবং সূর্য ডুবেও গেলো তবুও আথম মরলো না"। এখানে তার এ ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হলো।

তোমরাই বল, এটা কি ধরনের কথা?

নবী (আলাই .....গণ) সম্পর্কে একথা প্রমানিত যে, তাঁরা কখনো গালাগাল করতেন না। গালাগালের উত্তরে তারা কখনো গালি দেননি। এই মানদন্ড অনুযায়ী মির্জা সাহেবের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যগুলো লক্ষ্যণীয় ➢

আলেমগণের প্রতি গালাগাল ঃ

(১) হে বজ্জাত মওলবী সম্প্রদায়, তোমরা আর কতকাল সত্যকে গোপন করে রাখবে। এখন সে সময় এসে যাচ্ছে যে, তোমাদেরকে ইহুদীজনোচিত আয়েশ পরিহার করতে হবে। হে জালেম মৌলবীরা, তোমাদের উপর অক্ষেপ, তোমরা সেই বে-ঈমানীর পেয়ালা পান করেছ, তাই পশুজনোচিত জনসাধারণকেও পান করাচ্ছ।" - আথমের পরিণতি, ২১ পৃঃ)

(২) কোন কোন মূর্খ গদিনশীন, ফকীরী ও মৌলবিত্বের উটপাখি।
- আথামের পরিণতি-এর উপসংহার, ১৮ পৃঃ)

(৩) কিন্তু এরা কি কসম খেয়ে নেবে? কক্ষনো নয়। কারণ, এরা মিথ্যাবাদী এবং কুকুরের মত মিথ্যার মরা ভক্ষন করে যাচ্ছে।
- উপসংহার আথমের পরিণতি, পৃঃ ২৫)

(৪) আমাদের দাবীর প্রতি আকাশ থেকে সাক্ষ্যদান করা হয়েছে কিন্তু এ যুগের জালেম মৌলবীরা তাও অস্বীকার করেছে। বিশেষ করে দাজ্জালকুল সর্দার আবদুল হক গজনভী ও তার দল। তাঁদের প্রতি জুতা, হাজার হাজার বার তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। - (উপসংহার আথমের পরিনতি, পৃঃ ৫০)

(৫) হে বদমাশ, খবিস, বজ্জাত।

(৬) এখানে ফেরাউন বলতে মুহাম্মদ হুসাইন বটালভী ও হামান বলতে নওমুসলিম সা'দুল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়েছে। - (উপসংহার আথমের পরিনতি, পৃঃ ৫০)

(৭) জানিনা এই মূর্খ ও বর্বর সম্প্রদায় এখনো কেন লজ্জা শরমের ধারধারছে না। বিভিন্ন মৌলবীর মুখে চুনকালি পড়েছে।
- (উপসংহার আথমের পরিনতি, পৃঃ ৫৮)

মুসলমানদের প্রতি গালাগাল

(৮) আমার এসব গ্রন্থকে প্রতিটি মুসলমান ভালবাসার নজরে দেখে, এগুলোর তত্ত্বজ্ঞান থেকে উপকৃত হয় এবং আমাকে গ্রহণ করে। কিন্তু বেশ্যার সন্তানরা যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ মোহর এঁটে দিয়েছেন তারা আমাকে গ্রহণ করে না।

(৯) অর্থাৎ আমার শত্রুরা বনের শুয়োর হয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীরা কুকুরী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। - (মির্জা গোলাম আহমদ রচিত নাজমুল হুদা, পৃঃ ১০)

(১০) যে লোক নিজে দুষ্টামী করে বলবে যে, পাদ্রী আথম বেঁচে থাকলে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং খ্রীষ্টানদের বিজয় সূচিত হয়েছে এবং নিজের লজ্জাবোধকে কাজে লাগাবে না এবং আমার এই সিদ্ধান্তের ন্যায়সঙ্গত উত্তর না দিয়ে অস্বীকার কিংবা মন্দ বলা থেকে বিরত না হবে অথবা আমার বিজয় মেনে না নেবে, তবে পরিস্কার বুঝতে হবে যে, তার জারজ সন্তান হওয়ার আগ্রহ রয়েছে তথা সে সৎসন্তান নয়। - (মির্জা গোলাম আহমদ রচিত আনোয়ারুল ইসলাম, পৃঃ ৩০)

নিম্নের মধুর বচনটি লক্ষ্য করুন এবং মির্জাবাদী তথা কাদিয়ানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন ঃ 'অর্থাৎ আমার উম্মত পথভ্রষ্টতায় কখনো সমবেত হবে না। - (হাদীস) ইবনে মাজাহ্‌, ২৯২ পৃঃ কিতাব অধ্যায়)

মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে যেসব অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর প্রেক্ষাপটে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, মির্জাবাদ তথা কাদিয়ানী মতবাদের অনুসারীরা কাফের এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। আমরা আমাদের এই স্মারক পুস্তিকাটির সাথে আলেম সমাজের যে সমস্ত ফতোয়া এবং আদালতী মামলা-মোকদ্দমার রায়সমূহের মুদ্রিত উদ্ধৃতিগুলো উপসংহার হিসাবে

সংযোজন করছি যা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন সমিতি-সংগঠন প্রকাশ করেছে। তারই সার-সংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হল ঃ-

ফতোয়া

মির্জাবাদী কাদিয়ানীদের কাফের হওয়া এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত হওয়া সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে যেসব ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা নির্ধারন করাও কঠিন। তবুও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া সংকলনের কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল -

(১) ১৩৩৬ হিজরী রজব মাসে উপমহাদেশের সর্বস্তরের আলেমদের কাছ থেকে একটি ফতোয়া নেয়া হয় যা "কাদিয়ানীদের কুফরীর ফতোয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন, রায়পুর, দিল্লী, কোলকাতা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মুরাদাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পেশোওয়ার, রাওয়ালপিন্ডী, মুলতান, হুশিয়ারপুর, ঝিলাম, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, গুজরাট, হায়দরাবাদ ডেকান, ভূপাল ও রামপুরের সমস্ত মতের এবং সমস্ত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের আলেমগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে মির্জাবাদী কাদিয়ানীদেরকে কাফের এবং ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

- (কাদিয়ানীদের কুফরীর ফতোয়া, প্রকাশক কুতুবখানা আজিজিয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত দ্রষ্টব্য)

(২) এমনি ধরনের আরেকটি ফতোয়া "মির্জাবাদীদের বিয়ে বাতিল" নামে ১৯২৫ সালে অমৃতসরের আহলে হাদীস দফতর থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে উপমহাদেশের সর্বমতের আলেমদের স্বাক্ষর রয়েছে।

(৩) বাহাওয়ালপুর মোকাদ্দমা উপলক্ষ্যে যে সব ফতোয়া আদালতে পেশ করা হয় তাতে উপমহাদেশ ছাড়া আরব বিশ্বের ফতোয়াও অন্তর্ভূক্ত ছিল। - (মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত, লাহোর, মুলতান কর্তৃক প্রকাশিত "হুজ্জতে শরীয়ত" দ্রষ্টব্য)

(৪) আরেকটি ফতোয়া "মুতয়াস্সাতু মক্কা লিত্তাবাআতি ওয়াল এ'লাম"-এর পক্ষ থেকে সাউদী আরবে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে হারামাইন শরীফাইনসহ হেজাজ ও সিরিয়ার সর্বস্তরের ওলামাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ-

(আল কাদিয়ানিয়্যাহ ফি নজরে ওলামাইল উম্মতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ১১, প্রকাশিত মক্কা মোকাররমা) "অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সকল অনুসারী তা কাদিয়ানীই হোক বা লাহোরী সবাই কাফের।"

পাকিস্তানের ৩৩ জন আলেম কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের দাবী

১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের সংবিধান পুনর্বিবেচনার জন্য সমস্ত মত ও পথের সমর্থিত ওলামা প্রতিনিধিদের যে বিখ্যাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে একটি সংশোধনী ছিল কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে পাঞ্জাব সংসদে তাদের জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের কাদিয়ানীদেরকেও এই নির্দিষ্ট আসনের জন্য দাঁড়ানোর এবং ভোট দেয়ার অধিকার দান। এই সংশোধনীটি ওলামায়ে কেরাম নিম্নলিখিত ভাষায় উপস্থাপন করেছিলেন।

সংশোধনী

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী যেটি আমরা পুরোপুরি দৃঢ়তার সাথে পেশ করছি। দেশের সংবিধান রচনাকারীদের পক্ষে নিজের দেশের অবস্থা ও বিশেষ সামষ্টিক সমস্যা ও বিষয়াদি উপেক্ষা করে নিজেদের ব্যক্তিগত মতবাদ ও মনোবৃত্তির ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করতে থাকা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। তাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, দেশের যেসব অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক কাদিয়ানী মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে বাসবাস করছে, সেখানে এই কাদিয়ানী সমস্যা এক নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের বিগত আমলের-বহিরাগত সরকারসমূহের মত হলে চলবে না যারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার জটিলতা সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত সংযুক্ত ভারতের প্রতিটি অঞ্চল এ দুটি সম্প্রদায়ের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেনি। যেসব সংবিধান প্রণেতা মহোদয় স্বয়ং এদেশেরই অধিবাসী তাদের জন্য এমনি ভুল করাটা সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক হবে যে,যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানে কাদিয়ানী ও মুসলমানদের দাঙ্গা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে না দেখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা

একথা বিশ্বাস করতে না পারেন যে, এখানেও কাদিয়ানী-মুসলমান সমস্যা রয়েছে যার সমাধান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সমস্যাকে মূলতঃ যে বিষয়টি অধিকতর নাজুক তথা জটিল করে তুলেছে তা হল এই যে, কাদিয়ানীরা একদিকে মুসলমান সেজে মুসলমানদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং অপর দিকে আকিদা-বিশ্বাস, এবাদত-উপাসনা ও সমষ্টিগত আচার-আচরণে মুসলমানদের থেকে শুধু পৃথকই নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে তৎপরও বটে। ধর্মীয় ভাবে এরা সমস্ত মুসলমানকে প্রকাশ্যে কাফের সাব্যস্ত করে। কাজেই এই দোষের প্রতিকার আজও এই এবং পুর্বেও এই ছিল(যেমনটি বলেছেন মরহুম ডঃ ইকবাল আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে) যে, কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে দেয়া উচিত।

রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রস্তাব

ইসলামের কেন্দ্র ভূমি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় ১৩৯৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক এপ্রিল ১৯৭৪ সালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দ্বীনি সংস্থা – সংগঠনসমূহের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ইসলামী রাষ্ট্র তথা মুসলিম জনপদসমূহের ১৪৪টি সংগঠন-সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এটি ছিল মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন। তাতে মির্জাবাদী তথা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় যেটি কাদিয়ানী মতবাদের কুফর হওয়া সংক্রান্ত সর্বশেষ এজমায়ে উম্মত তথা বিশ্ব মুসলিম ঐকমত্য হিসাবে পরিগণিত।

সেই প্রস্তাবের মূল পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

অর্থাৎ কাদিয়ানীবাদ একটি বাতিল ফেরকা যেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামের পোষাক পরে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চায়। ইসলামের অকাট্য মূলনীতিসমূহের সাথে তার বিরোধ নিম্নোক্ত কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট ঃ

(ক) এর প্রবর্তক কর্তৃক নবুওয়ত দাবী;

(খ) কোরআনের আয়াতে বিকৃতি সাধন;

(গ) জেহাদ বাতিল হওয়ার ফতোয়া দান।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই কাদিয়ানীবাদের পত্তন করে এবং একে লালন করে। এটি সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই তৎপর হয়ে উঠে। কাদিয়ানীরা ইসলামের শত্রুদের সাথে সংযুক্ত থেকে মুসলমানদের স্বার্থের সাথে গাদ্দারী তথা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সেসব শক্তির সহায়তায় ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে বিকৃতি-বিবর্তন ও মূলোৎপাটনের কলা কৌশল ব্যবহার করে। উদাহরণত ঃ

(ক) পৃথিবীর নানা জায়গায় মসজিদের নামে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিসমূহের সহায়তায় ধর্মান্তকরণের আখড়া প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) স্কুল, মাদ্রাসা, এতীমখানা ও সাহায্যসংস্থার নামে অমুসলিম শক্তির সহায়তায় তাদেরই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন।

(গ) পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোরআন করীমের বিকৃত কপি প্রচার প্রভৃতি। এসব আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ইসলামী সংগঠন ও দলের ফরয হল কাদিয়ানী মতবাদ ও তার ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতা, তাদের (তথাকথিত) উপাসনালয়, মিলন কেন্দ্র, এতীমখানা প্রভৃতির প্রতি কড়া নজর রাখা এবং তাদের যাবতীয় গোপন রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অতঃপর তাদের বিছানো জাল, পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলিম বিশ্বের সামনে সেগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। তদুপরি-

(ক) এ দলকে কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করতে হবে এবং এ কারণে তাদেরকে পবিত্র স্থানসমূহ হারামাইন প্রভৃতিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না। মুসলমানরা কাদিয়ানীদের সাথে কোন রকম লেনদেন করবেন না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করবেন।

(খ) সম্মেলন, সমস্ত ইসলামী মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি দাবী জানায় যাতে তারা কাদিয়ানীদের যাবতীয় তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমগুলো বাজেয়াপ্ত করেন, এবং কোন কাদিয়ানীকে যেন কোন রকম দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ না দেন।

(৫) কোরআনে করীমে কাদিয়ানীদের বিকৃতি সাধন সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করণ, তাদের কৃত কোরআনের যাবতীয় তরজমা-অনুবাদ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসমূহ সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং সে সমস্ত তরজমা-অনুবাদের প্রচার বন্ধ করতে হবে।

আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত

এখন যে সমস্ত আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে যাতে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের এবং ইসলাম বহির্ভূত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ভাওয়ালপুর মোকদ্দমার রায়

জনাব মুন্সী মোহাম্মদ আকবর খান, বি,এ; এল,এল,বি; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাওয়ালপুর-এর এজলাসে দায়েরকৃত মুসাম্মত গোলাম আয়েশা পিতা মওলবী এলাহী বখশ সাং পূর্ব আহমদপুর, ভাওয়ালপুর কর্তৃক আবদুর রাজ্জাক পিতা মওলবী জান মোহাম্মদ গ্রাম মুহান্দ, মহকুমাঃ আহমদপুর, বাহাওয়ালপুর-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। বিষয়-স্বামীর ধর্মান্তরণের দরুন উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রাপ্তির আবেদন। তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ খ্রীঃ।

মহামান্য আদালত মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করার পর নিম্নলিখিত ভাবে রায় দান করেন।

উপরোল্লিখিত সমস্ত বাহাস প্রমাণ করে যে, খত্‌মে নবুওয়তের বিষয়টি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এই অর্থে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার না করার দরুন বিশ্বাসীর ধর্মান্তরণ প্রতীয়মান হয়ে যায় এবং ইসলামী আকীদা অনুযায়ী কোন লোক কুফরী বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমেও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

বিবাদী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আকীদার প্রেক্ষাপটে নবী বলে মান্য করে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বাস করে যে, মোহাম্মদী উম্মতে কেয়ামত পর্যন্ত নবুওয়তের ধারা অব্যাহত রয়েছে অর্থাৎ সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করে না। মহানবী (সঃ)-এর পর অপর কোন ব্যক্তিকে নতুন নবী স্বীকার করার দরুন যেসব অনিষ্ট অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় তার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উদ্বৃত

হয়েছে। সুতরাং বিবাদী সেই সমন্বিত ইসলামী আকীদা বিশ্বাস থেকে ফিরে যাবার কারণে ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হবে। আর ধর্মত্যাগ অর্থ যদি কোন ধর্ম মতের নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখতাকে বুঝায় তবুও বিবাদী মির্জা সাহেবকে নবী মানার দরুন একটি নতুন ধর্মমতের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এমতাবস্থায় তার জন্য কোরআনের তফসীর ও সম্পাদ্য বিষয় হবে মির্জা সাহেবের ওহি; মহানবী(সঃ)-এর হাদীস কিংবা ফেকাহ্‌বিদগণের মতামত নয় যেগুলোর উপর এ পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এছাড়া আহমদী তথা কাদিয়ানী ধর্মমতে এমন কোন কোন হুকুম আহকাম রয়েছে যা শরীয়তে মোহাম্মদী তথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কোন কোনটি তার বিরোধীও বটে। যেমন, মাসিক চাঁদা দেয়া যাকাতের উপর একটি অতিরিক্ত নির্দেশ। তেমনিভাবে কোন অ-কাদিয়ানীর জানাযা না পড়া, কোন কাদিয়ানী কন্যাকে অ-কাদিয়ানী পুরুষের সাথে বিয়ে না দেয়া এবং কোন অ-কাদিয়ানীর পেছনে নামায না পড়া প্রভৃতি মোহাম্মদী শরীয়তের বিরোধী কাজ বটে।

বিবাদীর পক্ষ থেকে এসব বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কেন তারা অ-কাদিয়ানীর জানাযা পড়ে না কিংবা কেন তাদের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয় না, কিন্তু এ সব ব্যাখ্যা এ কারণে কার্যকর নয় যে, এসব বিষয় তাদের গুরুব্যক্তিদের নির্দেশাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। অতএব সে তাদের দৃষ্টিকোন থেকে শরীয়তের অংশ বিবেচিত হবে যা কোন অবস্থাতেই মোহাম্মদী শরীয়তের অনুকূল বলে মনে করা যেতে পারে না। সাথে সাথেই যখন লক্ষ্য করা যায় যে, তারা অ-কাদিয়ানীদেরকে কাফের গণ্য করে, তখন তাদের ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক সাব্যস্ত করতে কোন সন্দেহই থাকে না। তাছাড়া বিবাদীর সাক্ষী মৌলবী জালালুদ্দীন শাম্‌স তার বর্ণনায় মুসায়লামা প্রভৃতি নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদারদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, তাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত সাক্ষীর দৃষ্টিতে নবুওয়তের মিথ্যা দাবী ধর্মত্যাগের অন্তর্ভূক্ত এবং মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারকে যে বিশ্বাস করে তাকেও ধর্মত্যাগী মুরতাদ গণ্য করা হয়।

বাদীনীর পক্ষ থেকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মির্জা সাহেব একজন মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার বিধায় বিবাদীকেও তাকে নবী মানার কারণে মুরতাদ সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখে পূর্ব আহমদপুর মুন্সেফ আদালত প্রাথমিকভাবে যে মতামত নির্ধারণ করেছিলেন, তাকে বাদীনীর পক্ষে বহাল রেখে এ রায় দিচ্ছে যে, বিবাদী কাদিয়ানী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ বা অবলম্বন করার দরুন মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। সুতরাং তার সাথে বাদীনীর বিয়ে বিবাদীর মুরতাদ বা ধর্মত্যাগের তারিখ থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। বিবাদীর আকীদা-বিশ্বাসকে যদি উল্লেখিত পর্যালোচনার আলোকে বিচার করা হয়, তা হলেও বিবাদীর দাবী অনুসারে বাদীনী একথা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পর আর কোন উম্মত নবী হতে পারে না। এছাড়াও অন্যান্য যে সব আকীদা-বিশ্বাসের সাথে বিবাদী নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করছে সেগুলো যদিও সাধারণ ইসলামী আকীদারই অনুরূপ কিন্তু এসব আকীদার উপরও সে এ অর্থেই আমল করে বলে বুঝতে হবে, যে অর্থ মির্জা সাহেব বর্ণনা করেছেন। আর এ অর্থগুলো যেহেতু সে সব অর্থের বিরোধী যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ আজ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সুতরাং সে কারণেও তাকে (বিবাদীকে) মুসলমান গণ্য করা যায় না। আর এ তদুভয় অবস্থায় সে মুরতাদই বটে। বস্তুতঃ মুরতাদের বিয়ে এর্তেদাদ তথা ধর্মত্যাগের দরুন ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে বাদীনীর পক্ষে ডিক্রি দেয়া গেল যে মুরতাদ হওয়া তথা ধর্মত্যাগের তারিখ থেকে সে বিবাদীর স্ত্রী রয়নি। মুকদ্দমার খরচাদিও বাদীনি বিবাদীর নিকট থেকে পাবার অধিকারী বটে।

এ প্রসঙ্গে বিবাদীর পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ (বাদীনী স্ত্রী ও বিবাদী স্বামী) যেহেতু কোরআনে করীমকে আল্লাহ্র কালাম মনে করে এবং যেহেতু আহলে কিতাবদের বিয়ে বৈধ, সেহেতু বাদীনীর বিয়েকে বাতিল বা বিচ্ছিন্ন সাব্যস্ত করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে বাদীনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, উভয় পক্ষই যখন পরস্পকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে, তখন নিজ নিজ আকীদার দিক দিয়েও তাদের বিয়ে বহাল থাকে না। তাছাড়া আহলে কিতাব

মহিলাদের সাথে বিয়ে জায়েয, কিন্তু পুরুষদের সাথে নয়। বাদিনীর দাবীর ভিত্তিতে যেহেতু বিবাদী মুরতাদ হয়ে গেছে, সেহেতু আহলে কিতাব হওয়ার প্রেক্ষিতেও তার সাথে বিয়ে বহাল থাকতে পারে না। বাদীনীর এই যুক্তিটি যথেষ্ট ভারি হওয়ার কারণেও সে ডিক্রী পাবার যোগ্য বটে।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট প্রভৃতির রায়ের উত্তর

মির্জাবাদী অর্থাৎ কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের উদ্ধৃতি একান্ত বলিষ্ঠতার সাথে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞ জজ তার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'বিবাদীর পক্ষ থেকে তার পক্ষে কয়েকটি আইনগত নজীর পেশ করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে পাটনা ও পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফয়সালাগুলোকে চীফ কোর্ট প্রথমতঃ ঘটনাগুলোকে আলোচ্য এ মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে মনে করেনি এবং মাদ্রাজ হাই কোর্টের ফয়সালাকে উচ্চ আদালতের বিশেষ বৈঠক অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেনি। রয়েল চীফ কোর্ট বাহাওয়ালপুরের জান্দোডি বনাম করীম বখশের মোকদ্দমার ফয়সালার বিষয়। তার অবস্থা এই যে, এই ফয়সালা চীফ কোর্টের মহামান্য জজ উধ দাস সাহেবের এজলাস থেকে জারী হয়েছিল। জজ মহোদয় এই মোকদ্দমার ফয়সালাকে শুধুমাত্র মাদ্রাজ হাই কোর্টের ফয়সালা পর্যন্ত সীমিত রেখে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন এবং নিজে ফয়সালায় উল্লেখিত বিতর্কিত বিষয়গুলোর কোন পর্যালোচনা করেননি। কারণ, মোকদ্দমাটি যেহেতু দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রলম্বিত হচ্ছিল তাই বিজ্ঞ জজ মহোদয় একে আর অনিশ্চয়তার গহ্বরে ফেলে রাখা পছন্দ করেননি বলে উল্লেখিত ফয়সালার অনুসরণে শেষ করে দিয়েছেন। উচ্চতর এজলাস যেহেতু সেই ফয়সালাকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেননি যে ফয়সালার ভিত্তিতে পরবর্তী ফয়সালা জারী হয়েছে, সেহেতু আলোচ্য ফয়সালাটি অনুসরণযোগ্য থাকে না।

উভয় পক্ষের মধ্যে বাদীনীর উকিল উপস্থিত রয়েছেন। তাকে নির্দেশ শোনানো হয়। বিবাদী মোকদ্দমা চলাকালীন অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ

করেন। তারই বিরুদ্ধে এই হুকুম অর্ডার নং ২২-এর ৬ নং দেওয়ানী ধারা হিসাবে গণ্য হবে। কাগজপত্র তৈরী করে নথিবদ্ধ করা হোক।

- (৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ মোতাবেক ৩রা জিলক্বদ ১৩৫৩ হিজরী, মোকাম-বাহাওয়ালপুর)

স্বাক্ষর ঃ- মোহাম্মদ আকবর, জেলা জজ, বাহাওয়ালনগর জেলা, বাহাওয়ালপুর প্রদেশ।

রাওয়ালপিন্ডি মামলার ফয়সালা

এজলাস ঃ অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব শেখ মোহাম্মদ আকবর, রাওয়ালপিন্ডি, সিভিল, আপিল-১৯৫৫।

আমাতুল করীম, পিতা করম এলাহী রাজপুত সাং বাড়ী নং-৫০০, মহল্লা তরৎ বাজার, রাওয়ালপিন্ডি(কাদিয়ানী)।

বনাম

লেফটেন্যান্ট নাজীর উদ্দীন মল্লিক, পিতা-মাষ্টার মোহাম্মদ দীন, সাং মহল্লা কৃষ্ণপুরা, রাওয়ালপিন্ডি(মুসলমান)। ফয়সালার তারিখ ৩রা জুন, ১৯৫৫ ইং।

উল্লেখিত আদালত মোকদ্দমা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত রায় লিপিবদ্ধ করে এবং শোনায় ঃ

উল্লেখিত অবস্থার আলোকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি-

(১) মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

(২) মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের নবী(সঃ) কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করবেনা সে মুসলমান নয়।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। মির্জা গোলাম আহ্মদ নিজেই নিজের ঘোষণাদি মোতাবেক দাবী করেছেন যে, তিনি নিজের নবুওয়ত দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।

(৪) মির্জা গোলাম আহমদ স্বীয় ঘোষণা মোতাবেক এ দাবী করছে যে, তার নিকট এমন ওহী অবতীর্ণ হয় যা নবুওয়তের ওহী সমতুল্য।

(৫) মির্জা গোলাম আহমদ নিজে তার প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং নিজেই তার নবুওয়তের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।

(৬) তিনি তার পরিপূর্ণ পয়গাম্বর হওয়ার দাবী করেছেন। জিল (ছায়া) ও প্রতিচ্ছবির কাহিনী হল একটি ছলনা মাত্র।

(৭) নবী করীম(সঃ)-এর পর কারো উপর নবুওয়তের ওহী নাজিল হতে পারে না। যে লোক এমন কোন দাবী করবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

উপরোক্ত যুক্তি-প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, প্রাথমিক শুনানি গ্রহণকারী আদালতের ফয়সালা শুদ্ধ ও নির্ভুল এবং আমি সে সমস্ত ফয়সালার প্রত্যয়ন করছি।

আমাতুল করীমের আপিলের কোন মূল্য নেই এবং আমি আপিলটি খারিজ করে দিচ্ছি।

লেফটেন্যান্ট নাজীরুদ্দীনের আপিল সম্পর্কেও এডভোকেট জাফর মাহমুদ আমাকে যথাযথ অবহিত করেননি। আমাতুল করিমের যৌতুকের মালামাল তারই অধিকারে পাওয়া গেছে। সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তার আপিলেও কোন ওজন বা গুরুত্ব নেই। সুতরাং সেটি খারিজ করছি যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের আবেদনই খারিজ হয়ে গেল, তাই খরচ বাবদ কোন নির্দেশ দেয়া গেল না।

স্বাক্ষর ঃ
শেখ মোহাম্মদ আকবর
সেশন জজ রাওয়ালপিন্ডি
তাং ঃ ৩রা জুন ১৯৫৫ ইং

জেমস আবাদ মোকদ্দমার রায়

ফেমিলী স্যুট নং-৯/১৯৬৯ ইং

মুসাম্মৎ আমাতুল হাদী, পিতা সর্দার খাব বাদিনী বনাম হাকীম নাজীর আহমদ বার্ক বিবাদী

উপরোক্ত বিতর্কের ফল দাড়াল এই যে, বাদিনী যে একজন মুসলমান মহিলা তার বিয়ে বিবাদীর সাথে যে বিয়ের সময় নিজের কাদিয়ানী

হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেয় তার সাথে সম্পন্ন হয়। আর তাতে সে নিজে অমুসলিম সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং এ বিয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং এর কোন আইনানুগ অস্তিত্ব থাকে না। বাদীনি ইসলামী আকীদা অনুযায়ী বিবাদীর স্ত্রী নয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বাদীনির আবেদনের রায় তার পক্ষে দেয়া গেল এবং বিবাদীকে নিষেধ করা হল যাতে সে বাদীনিকে নিজের স্ত্রী গণ্য না করে। বস্তুতঃ বাদীনি এ মোকদ্দমার খরচও পেতে পারবে।

এই রায়টি ১৩ই জুলাই ১৯৭০ সালে জেমস আবাদ ফ্যামিলি কোর্টের মাননীয় শায়খ মোহাম্মদ রফীক গ্রেজার স্থলাভিত্তিক জজ জনাব কায়সার আহমদ হামীদী প্রকাশ্য আদালতে পড়ে শুনান।

মোরিশাস সুপ্রিম কোর্টের সর্ব বৃহৎ মোকদ্দমা

রোজহিল মসজিদের মোকদ্দমাকে মোরিশাসের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় মোকদ্দমা বলা হয়। কারণ পুরো দুই বছর ধরে সুপ্রিম কোর্ট এর শুনানী নিয়েছে, সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে এবং প্রথম বার এ ফয়সালা দিয়েছে ঃ মুসলমান পৃথক উম্মত এবং কাদিয়ানী পৃথক উম্মত।

এই মোকদ্দমা চালানোর জন্য মুসলমান ও কাদিয়ানী উভয় পক্ষই অন্য দেশ থেকে বিখ্যাত উকিল-ব্যারিষ্টার আনিয়েছে। কাদিয়ানীদের কাছ থেকে মসজিদের দখল ফেরৎ নেয়ার জন্য রোজহিলের যেসব মুসলমান বিশেষ তৎপরতা চালিয়েছে তাদের মধ্যে মাহ্মুদ ইসহাকজী, ইসমাঈল হাসানজী, ইবরাহীম হাসানজী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা সেখানকার ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। এরা যে মোকদ্দমা দায়ের করেন তার ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ

দাবী ঃ রোজহিলের সে মসজিদটিতে মুসলমানদের হানাফী (সুন্নী) সম্প্রদায় নামায আদায় করত সেটি তারা নিজেরাই নির্মাণ করে, এবং বরাবরই এটি তাদের অধিকারে ছিল। এটি কাদিয়ানীরা দখল করে নেয়, মুসলমানদের সাথে যাদের কোন সম্পর্কই নেই। কাদিয়ানীরা আমাদের মুসলমানদেরকে মুসলমান মনে করে না। এরা আমাদের পেছনে নামাযও পড়ে না। সুতরাং এদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করা হোক।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে এ মামলা দায়ের হয়। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ২১টি সাক্ষী উপস্থিত করা হয়। এদের মধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহ্ রশীদ নওয়াবের সাক্ষী ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মহামান্য আদালতের সামনে অত্যন্ত নির্ভিকতার সাথে কাদিয়ানীদের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং শত শত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা উপস্থাপন করে আদালাতকে অবহিত করানোর সার্থক প্রচেষ্টা চালান যে, কাদিয়ানী এবং মুসলমান পৃথক পৃথক উম্মত। মির্জা গোলাম আহমদের পুস্তকাদির উদ্ধৃতিও মাওলানা রশীদ পেশ করেন।

কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে মৌলবী গোলাম মোহাম্মদ বি,এ উকীলদের সাহায্য করেন এবং দাবীর উত্তর তৈরী করেন। মৌলবী গোলাম মোহাম্মদ এই উদ্দেশ্যে কাদিয়ান গমন করেন। মুসলমানদের উকীলদের মধ্যে ছিলেন মিঃ রোলার্ড কে,সি ইসুয়েজ কে, সি, ই, স্নোফ এবং আই নেয়ারিক প্রমুখ। অপর পক্ষে কাদিয়ানীদের উকীল ছিলেন মিঃ আর পাজানী।

মহামান্য আদালতের কাজ চলাকালে হাজার হাজার মুসলমান এসে উপস্থিত হত এবং দেশে প্রথম বারের মত একথা জানা যায় যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, বরং মুসলমানদের বেশ ধরে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে।

সুতরাং ১৯শে নভেম্বর ১৯২০ সালে চীফ জজ সারাকে হারচিজোডর এভাবে ফয়সালা পড়ে শুনান ঃ

ফয়সালা ঃ

মহামান্য আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিবাদী (কাদিয়ানী)-এর কোন অধিকার নেই যে, তারা রোজহিল মসজিদে নিজের পছন্দসই ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে। এ মসজিদে শুধুমাত্র বাদী (মুসলমানরাই) নামায পড়তে পারবে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের আলোকে। একই আদালতের অপর জজ টি,ই, রোজলীও এই ফয়সালার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের রায়

সব শেষে শায়েরে মাশরিক ও পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের কিছু বাণী পেশ করা হল। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা উপলব্ধি করতে পেরে সমগ্র উম্মতকে এই ভয়াবহ শঙ্কা থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেন। সে সমস্ত রচনাবলী এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। অবশ্য কয়েকটি জরুরী উদ্ধৃতি পেশ করা হল। তিনি ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার ১০ই জুন ৩৯৩৫ সংখ্যায় বলেন ঃ "ইসলাম অবশ্যই একটি ধর্মীয় দল যার সীমা নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস, নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস এবং রাসূলে করীম (সঃ)-এর খত্মে নবুওয়তে বিশ্বাস। প্রকৃত পক্ষে এই সর্বশেষ বিশ্বাসটিই একটি বাস্তব সত্য যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়। এরই দ্বারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত কি নয়। উদাহরণতঃ ব্রাহ্মরা খোদাকে বিশ্বাস করে এবং রাসূলে করীম কেও (সঃ) নবী মানে, কিন্তু তাতে তাদেরকে ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যাবে না। কারণ কাদিয়ানীদের মত তারাও নবীদের মাধ্যমে ওহী (ঐশী প্রত্যাদেশ)-এর ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী, রাসূলে করীম (সঃ)-এর খত্মে নবুওয়তে বিশ্বাসী নয়। আমার জানামতে কোন ইসলামী ফের্কা বা সম্প্রদায় এই সীমারেখা অতিক্রম করার সাহস করতে পারেনি। ইরানে বাহাঈ সম্প্রদায় খত্মে নবুওয়তের মূলনীতিকে পরিস্কারভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, কিন্তু সাথে সাথে তারা একথাও বলেছে যে, তারা পৃথক একটি দল; মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমার মতে কাদিয়ানীদের সামনে শুধুমাত্র দুটি পথই খোলা থাকে–হয় তারা বাহাঈদের অনুসরণ করবে কিংবা খত্মে নবুওয়তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিহার করে এই মূলনীতিকে যথার্থভাবে গ্রহণ করে নেবে। তাদের নতুন বিশ্লেষণ শুধু এজন্য যাতে তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত গণ্য করা হয় এবং যাতে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে পারে। - (হরফে ইকবাল, পৃঃ ১২৭-১২৮, মুদ্রণ-লাহোর, ১৯৫৫)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, (মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত, লাহোর, মুলতান কর্তৃক প্রকাশিত "হুজ্জতে শরীয়ত" দ্রষ্টব্য)তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানেরা খত্মে নবুওয়তের সাংস্কৃতিক দিকটি সম্পর্কে কখনো লক্ষ্য করেনি এবং পাশ্চাত্যের হাওয়া তাদেরকে আত্মরক্ষার প্রেরণা থেকেও বিমুখ করে দিয়েছে। এমনি কোন কোন তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমান নিজেদের ভাইদেরকে সহানুভূতির পরামর্শ দিয়েছে। - (হরফে ইকবাল, পৃঃ ৬১১)

অতঃপর ভারতের অমুসলিম সরকারকে সম্বোধন করে লিখেছেন, সরকারকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতার আন্দাজ করা কর্তব্য। যদি কোন জাতির একত্ব শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না যে, তারা বিদ্বেষী শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা করবে। প্রশ্ন উঠে, প্রতিরক্ষার পন্থাটা কি হবে? সে পন্থা এটাই হবে যে, আসল জমাত যে কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের সাথে উপহাস করতে দেখলে তার দাবী দাওয়াকে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে খণ্ডন করতে থাকবে। তাছাড়া মূল দলের ঐক্য ও অস্তিত্বের আশংকা সত্ত্বে এবং বিদ্বেষী দলের মিথ্যা প্রচার-প্রপাগান্ডার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মূল দলের প্রতি সহানুভূতির উপদেশ দেয়াটা কি সংগত হতে পারে?

যদি কোন দল যেটি আসল দলের দৃষ্টিভঙ্গির বিদ্রোহী হয়ে সরকারের জন্য উপকারী হয়, তাহলে সরকার তার সেবার প্রতিদান পরিপূর্ণভাবেই দিতে পারে; এতে অন্যান্য দলের আপত্তি করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে এমন আশা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে এমন আশা পোষণ করা অর্থহীন যে, আসল দলও এ ধরনের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করেই বসে থাকবে, যা তার অস্তিত্বের জন্য আশংকার কারণ।

কথিত আছে যে, মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকায় কোন কোন লোক পরস্পরকেই কাফের প্রতিপন্ন করতে থাকে। কাজেই তাদের ফতোয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর উত্তর প্রসঙ্গে শায়েরে মাশরেক লিখেছেন, "এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এ বিষয়টি পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন

নেই যে, মুসলমানদের অসংখ্য উপদল বা ফেরকার ধর্মীয় বিবাদের কোন প্রতিক্রিয়া তাদের মৌলিক বিষয়ের উপর হয় না যার উপর সকল দলই একমত, যদিও পরস্পরকে ধর্মহীন বলে থাকে। - (হরফে ইকবাল, ৬১১)

অতঃপর শায়েরে মাশরেক কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমার মতে সরকারের পক্ষে সর্বোত্তম পন্থা হবে কাদিয়ানীদেরকে একটি পৃথক সম্প্রদায় স্বীকার করে নেয়া। এটা কাদিয়ানীদের পলিসিরও অনুকূল হবে এবং মুসলমানরাও তাদের প্রতি তেমনি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে যেমনটা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে করে থাকে। এটা হল সেই দাবী যা ডঃ ইকবাল মরহুম ইংরেজ সরকারের প্রতি জানিয়েছিলেন। এখন যে দেশ শায়েরে মাশরেকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং তারই নামকরণে অস্তিত্ব লাভ করেছে তার সর্ব প্রথম কর্তব্যই হবে এই যে সে কবির সে আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করবে।

উপসংহার ঃ
কিছু কাদিয়ানী বিভ্রান্তি
কয়েকটি সন্দেহের সমাধান

মুসলমানদের পক্ষ থেকে যখন কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করার দাবী উত্থাপিত হয়, তখন কাদিয়ানীরা নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এখানে সংক্ষেপে সে সব বিভ্রান্তির একটা পর্যালোচনা পেশ করা হচ্ছে।

কলেমা উচ্চারণকারীকে কাফের বলা প্রসঙ্গে

কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, যে ব্যক্তি কলেমা উচ্চরণ করে এবং নিজের মুসলমানিত্ব স্বীকার করে এমন ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করার অধিকার কারোই নেই। এখানে সর্ব প্রথম লক্ষ্যাণীয় যে, একথাটি সে সব লোকের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যারা পৃথিবীর সোয়া শ' কোটি মুসলমানকে প্রকাশ্যভাবে কাফের বলে থাকে এবং যারা কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' সহ এর যাবতীয় দাবীর উপর যথার্থভাবে ঈমান আনয়নকারীদেরকে ইসলামের আওতা বহির্ভূত, হতভাগ, অসৎ এমনকি বেশ্যার সন্তান সাব্যস্ত করতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ

করে না। বলতে গেলে 'কলেমা উচ্চরণকারী'কে মুসলমান বলাটা যেন এমন এক তরফা হুকুম যা শুধুমাত্র অকাদিয়ানীদের উপরই আরোপিত হয়। আর কাদিয়ানীদের প্রতি কেন লাগামহীন ছাড় দেয়া হয়েছে যে, তারা মুসলমানদেরকে যত কঠিন ভাষায়ই কাফের বলতে থাকুক, তাদেরকে যতই অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিতে থাকুক কিংবা তাদের মহান ব্যক্তিবর্গকে যে ভাবেই অপমান করুন এদের ইসলামের কোনই ব্যতিক্রম ঘটবে না কিংবা এদের উপর কলেমা উচ্চারণকারীকে কাফের বলার দোষ আরোপিত হতে পারবে না। এটাই হল কাদিয়ানী ধর্মের বিচার যা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে নিজেকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূহানিয়াতের দ্বিতীয় প্রকাশ প্রতিপন্ন করছে।

তাছাড়া আল্লাহ্ই জানেন, এ মূলনীতি আবার কোথা থেকে দাঁড় করানো হয়েছে যে, এমন প্রতিটি লোকই মুসলমান যে, কলেমা পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে স্বীকার করে এবং তাকে কেউ কাফের বলতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, মুসায়লামাতুল কায্যাব কি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করত না? তার পরেও কেন মহানবী (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ) তাকে কাফের সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে কেন জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন? স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদই বা জায়গায় জায়গায় মুসায়লামাতুল কায্যাবের পর বরং মহানবী (সঃ)-এর পর নিজেকে ছাড়া যে কোন নবুওয়তের দাবীদারকে কাফের ও মিথ্যাবাদী কেন বলে? যদি কোন নয়া নবুওয়তের দাবীদার কলেমা পাঠ করতে করতে উঠে আসে এবং মহানবী (সঃ)কে ছাড়া সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখেরাতের আকীদা নিয়ে উপহাস করে, কোরআনে করীমকে আল্লাহ্র কালাম মানতে অস্বীকার করে, নিজেকে সর্বোত্তম নবী সাব্যস্ত করে, নামায-রোযাকে বাতিল করে দেয়, মিথ্যা, মদ, ব্যভিচার, সুদ ও জুয়াকে বৈধ বলে এবং কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাড়া ইসলামের প্রতিটি হুকুমকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে, তাহলেও কি তাকে 'কলেমা পাঠকারী' হওয়ার কারণেই মুসলমান মনে করা যাবে? ইসলাম যদি এমনি একটা ঢিলে ঢোলা জামা হয় যার ভেতরে কলেমা পাঠ করার পর পৃথিবীর যে কোন কুবিশ্বাস ও কুকর্মই

স্থান পেতে পারে, তাহলে খামাখাই ইসলাম সম্পর্কে এমন দাবী করা হয় যে, যেটি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম, সুদৃঢ়, সুসংহত ও সুসংবদ্ধ ধর্ম।

যারা প্রত্যেক কলেমা পাঠকারীকেই মুসলমান বলতে বাড়াবাড়ি করে, তারা কি একথাই বুঝে যে, এই কলেমাটি (নাউযুবিল্লাহ্) কোন মন্ত্রতন্ত্র কিংবা টোটকাটোনা যে একবার সেটি পাঠ করে নিলেই "কুফরপ্রুফ" হয়ে যায় এবং অতঃপর মন্দের চেয়ে মন্দ আকীদা-বিশ্বাসও আর তাকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করতে পারে না?

যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায় বিচার যদি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে উঠে গিয়ে না থাকে, তবে ইসলামের মত যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বীন সম্পর্কে এমন ধারণা কেমন করে করা যেতে পারে যে, কয়েকটি মাত্র শব্দ মুখে উচ্চারণ করার পর মানুষ জাহান্নামী থেকে জান্নাতী এবং কাফের থেকে মুসলমানে পরিণত হয়ে যায়, তার আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহ্ ও রাসূলের ইচ্ছার যতই পরিপন্থী হোক?

বস্তুতঃ এই কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) কোন যাদু-মন্ত্র কিংবা ভোজবাজী নয়, এবং এটি হল একটি চুক্তিনামা ও স্বীকৃতি মাত্র। এতে আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র উপাস্য-মা'বুদ সাব্যস্ত করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহ্র রাসূল বলে স্বীকার করার মর্মার্থ হল এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল(সঃ)-এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সত্যায়ন করব। কাজেই আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রাসূলের বাতলানো যে সমস্ত কথা আমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে বিশুদ্ধতার সাথে এসে পৌঁছেছে সেগুলোকে যথাযথ বলে স্বীকার করা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান আনার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার অপরিহার্য দাবী। যদি কেউ এসব ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ বিষয়সমূহের যে কোন একটি বিষয়কেও যথার্থ বলে মানতে অস্বীকার করে, তাহলে প্রকৃত পক্ষে সে কলেমায়ে তাওহীদের উপর ঈমান আনল না। মুখে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যতই পাঠ করুক সে জন্য তাকে মুসলমান বলা যাবে না। খত্মে নবুওয়তের আকীদা যেহেতু কোরআনে করীমের

বহু আয়াত এবং রাসূলে করীম (সঃ)-এর অসংখ্য হাদীসের দ্বারা ধারাবাহিকতার সাথে প্রমানিত, কাজেই মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যানুযায়ী সেটিও সে সমস্ত অকাট্য বিষয়েরই অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর উপর ঈমান আনা কলেমা তায়্যেবার অপরিহার্য অংশ। এর অবর্তমানে মানুষ মুসলমান হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে এমন কিছু হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে মহানবী (সঃ) মুসলমানের লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করেছেন, "যে লোক আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে সে মুসলমান"। যার কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতা রয়েছে যে হাদীসের বাচন ভঙ্গির দ্বারা বুঝতে পারে যে, এখানে মুসলমানের কোন আইনগত ও ব্যাপক সংজ্ঞা বলা হয়নি, বরং মুসলমানদের সেই সামাজিক চিহ্ন বা লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ অন্যান্য ধর্ম ও সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যে ব্যক্তির বাহ্যিক লক্ষণাদি তার মুসলমান হওয়ার স্বাক্ষ্য দেবে তার প্রতি খামোখা সন্দেহ করা কিংবা অহেতুক তার দোষ খুজে বেড়ানো জায়েজ নয়। কিন্তু এর এই অর্থ কোথা থেকে বেরিয়ে এল যে, যদি সে নিজে অন্যান্য মুসলমানের সামনে প্রকাশ্যভাবে কুফরী বিষয় স্বীকার করতে থাকে বরং সারা দুনিয়াকে সে সব কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের অনুসারীদেরকে ছাড়া সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করে, তা হলেও সে শুধুমাত্র মুসলমানের জবাইকৃত প্রাণী খাবার কারণে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা ও তার আনুসাঙ্গিক দাবী-দাওয়ার প্রতি স্বীকৃতি না দিলেও মুসলমান বলে কথিত হওয়ার অধিকার লাভ করবে?

আসলে উল্লেখিত হাদীসে মুসলমানের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়নি, বরং তাদের বাহ্যিক চিহ্ন ও লক্ষণাদি বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা মহনবী (সঃ)-এর নিম্ন লিখিত হাদীসে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আমাকে হুকুম করা হয়েছে যেন আমি মানুষের সাথে জেহাদ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দান করে যে,

আল্লাহ্‌কে ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে সমূদয়সহ যা আমি সাথে নিয়ে এসেছি।

এতে মুসলমানদের পূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেয়া হয়েছে যে,নবী করীম (সঃ)-এর নিয়ে আসা প্রতিটি শিক্ষাকে মেনে নেয়াই আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌-এর অপরিহার্য অংশ। মহানবী (সঃ)-এর এ বাণীটি কোরআনে করীমের যে আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ অতএব না, তোমার পালনকর্তার কসম এরা ঈমান আনবে না যতক্ষণ না এরা তোমাকে তাদের প্রতিটি বিরোধীয় বিষয়ে বিচারক সাব্যস্ত করে নেবে এবং অতঃপর তোমার ফয়সালায় নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব না করবে এবং তা স্বানন্দচিত্তে স্বীকার করে না নেবে।

সম্প্রতি কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। নাম "আমরা অকাদিয়ানীদের পেছনে নামায পড়ি না কেন?" এতে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও মতের মধ্যকার মতবিরোধ ও ফতোয়াদিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে ছাড়িয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে যেগুলোতে একে অপরকে কাফির প্রতিপন্ন করে থাকে। কিন্তু একে তো এ পুস্তিকায় এমন কিছু কিছু ফতোয়ার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে পরিস্কারভাবেই বলা যেতে পারে যে, এগুলোর প্রবক্তার প্রতি একান্তই মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ পুস্তিকায় যদিও যথেষ্ট পরিশ্রম করে পরস্পরের প্রতি আরোপকৃত কঠিন বিষয়সমূহ একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা পারস্পরিক মতবিরোধের দরুন সাধারণ মানুষের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু এসব উদ্ধৃতির বহরে বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে আরোপিত ফতোয়া রয়েছে মোট পাঁচটি। বাকীগুলো ফতোয়া নয়, বরং বিভিন্ন কঁটুক্তি যা তারা তাদের দুঃখজনক ঝগড়ার সময় নিজেদের কলম বা মুখে উচ্চারণ করে থাকে। এতে পরস্পরের বিরুদ্ধে কঠিন ভাষা তো অবশ্যই প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়।

তৃতীয়তঃ এই পাঁচটি ফতোয়াও নিজ নিজ দলমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। অর্থাৎ এমন নয় যে, যে মতের সাথে যেটি সংশ্লিষ্ট সমগ্র সেই মতাবলম্বীরা এ ফতোয়ার সাথে একমত হবে। পক্ষান্তরে, যে কোন মতাবলম্বী মুসলমানদের বিজ্ঞ ও মধ্যপন্থী আলেমগণ সর্বদাই এসব অসর্তকতা ও বাড়াবাড়ির প্রতি কঠিন মত বিরোধ পোষণ করেছেন যা সে সব ফতোয়ায় রক্ষিত হয়েছে। কাজেই এসব ফতোয়া উদ্ধৃত করে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ ভুল, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর যে, এ সমস্ত মতাবলম্বীরাই পরস্পরকে কাফের সাব্যস্ত করে। বরং আসল সত্য হল এই যে, প্রত্যেক মতেই একটি উপাদান এমন রয়েছে যা অন্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এমন কঠোরতা অবলম্বন করেছে যা কুফরীর পর্যায়ে চলে যায় কিন্তু একই মতের বড় বড় বহু আলেম-ওলামা রয়েছেন যারা শাখাগত মতবিরোধগুলোকে সর্বদাই সীমার ভেতরে রেখেছেন। শুধু যে সীমার ভেতরেই রেখেছেন তাই নয়, বরং এর নিন্দাও করেছেন এবং কার্যতঃ এই সতর্ক ও মধ্যপন্থী উপাদানটিই প্রবল ছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই যে, যখনই মুসলমানদের কোন অভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত মতাবলম্বীরা মিলে বসতে কোন কোন লোকের এসব ফতোয়া কখনোই অন্তরায় হয়নি।

মুসলমানদের এসব ফেরকা বা দল যাদের দলাদলীর অপপ্রচার সারা বিশ্বে করা হয়েছে এবং যাদের মতানৈক্যের ঢোল বাজিয়ে যে সব লোক নিজেদের বাতিল মতাদর্শের বেসাতী জাঁকিয়ে তুলেছে, তারাই ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল এবং সামান্য মতবিরোধ ছাড়াই ইসলামী সংবিধানের মৌলিক নীতিমালা স্থির করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ এদেরই বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল, এ ধরনের ঐকমত্য একটি অসম্ভব বিষয়। অতঃপর ১৯৫৩ সালে যখন সেই প্রস্তাবিত সংবিধানে নির্দিষ্ট কিছু কিছু ইসলামী সংশোধনীর প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন তারাই সম্মিলিতভাবে সুপারিশ পেশ করেন। অথচ এ কাজটি পূর্বাপেক্ষা জটিল বলে মনে করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালেই তারা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা এবং একটা অভিন্ন ধারণা স্থির করেন। ১৯৭২ সালে

সংবিধান প্রণয়নের সময় তারা একাত্মতার সাথে এই মৌলিক কাজটি সম্পন্ন করেন। অথচ সারা দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় হচ্ছিল যে, এরা মিলে মিশে মুসলমানের কোন সমন্বিত সংজ্ঞা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারবে না। কিন্তু ১৯৭২ সালে সেই লোকগুলোই পরিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধতার দ্বারা যে অপপ্রচারের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। এখন পুনরায় এই কাদিয়ানীদের প্রকাশ্য কুফরীর মোকাবেলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, যখনই ইসলাম ও মুসলমানের কোন অভিন্ন ও সমন্বিত ধর্মীয় বিষয় এসেছে, তখনই তাদের নিজেদের মতবিরোধ সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণে কখনো অন্তরায় হয়নি। কিন্তু এ ধরণের কোন সমাবেশে কোন কাদিয়ানীকে আমন্ত্রণ জানাতে কি কখনো কেউ দেখেছে?

এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে ফুটে উঠে ঃ-

(এক) তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কুফরীর ফতোয়ার কোন সামগ্রিক গুরুত্ব নেই এবং কোন মতাবলম্বীদলের প্রতিনিধিত্ব করে না, তা হলে এই মতাবলম্বীরা কখনো মুসলমান হিসাবে সমবেত হতে পারত না বা হতো না।

(দুই) প্রত্যেক মতাবলম্বীর মধ্যে প্রবল উপাদান সেটিই যা আনুসাঙ্গিককে আনুসঙ্গিকের আওতায় রাখে এবং আপোষের বিরোধকে তাকফীরের কারণ বানায় না। তাহলে এ ধরণের সমাবেশ জনসমর্থন লাভ করতে পারত না।

(তিন) ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যা যথার্থই ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করে, তাতে এরা সবাই একমত।

সুতরাং যদি কিছু কিছু লোক একে অপরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করেও থাকে, তাতে কিন্তু একথা প্রতীয়মান হয় না যে, এখন আর দুনিয়াতে কোন লোক কাফের হতেই পারে না। এরা সবাই মিলেও যদি কাউকে কাফের সাব্যস্ত করে, তবুও কাফের হবে না।

এ পৃথিবীতে কি তথাকথিত হাতুড়ে ধরনের লোকেরা চিকিৎসার মাধ্যমে লোকদের উপর উৎপীড়ন চালায় না? বিজ্ঞের চেয়ে বিজ্ঞ ডাক্তারদেরও কি ভুল-ভ্রান্তি হয় না? কিন্তু তাই বলে কি একান্ত নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া

একথা বলতে পারে যে, এসব বিচ্ছিন্ন ভুল-ভ্রান্তির শাস্তি হিসাবে ডাক্তার শ্রেণীর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোর্ট-কাছাড়িতে রায়ে কি জজ সাহেবের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে না? কিন্তু তাই বলে কি কেউ কোন দিন ভেবেছে যে, বিচ্ছিন্ন সে সব ভুল-ভ্রান্তির কারণে আদালত কক্ষগুলোতে তালা লাগিয়ে দিতে হবে? কিংবা জজদের কোন রায়ই গ্রহণ করা যাবে না? ঘর-বাড়ী সড়ক বা দালান-কোঠা নির্মাণ করতে গিয়ে কি প্রকৌশলী কখনো ভুল করে না? কিন্তু তাই বলে কি কোন সুস্থ মস্তিস্ক লোক এমন প্রস্তাব করেছে যে, এসব ভুলের দরুন নির্মানে ঠিকাদারী প্রকৌশলীর পরিবর্তে গোরকুন্‌কে তথা কবর খোদাইকারীকে দিতে হবে? সুতরাং কয়েকটি ফতোয়ার ক্ষেত্রে যদি ভুল-ভ্রান্তি বা অসতর্কতা হয়েও থাকে, তাই বলে কি তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, এখন ইসলাম ও কুফরীর ফয়সালা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিবর্তে কাদিয়ানী বিকৃতির প্রেক্ষাপটে করাই উচিত?

শায়েরে মাশরেক আল্লামা ইকবাল মরহুম কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার দাবী জানিয়ে যথার্থই করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানদের অসংখ্য ফেরকা বা উপদলের ধর্মীয় বিবাদের কোন প্রভাবই সেই মৌলিক বিষয়ের উপর পড়ে না, যে সব বিষয়ে সমস্ত উপদলই একমত যদিও তাদের একে অপরকে কাফের ফতোয়া দেয়। - (হরফে ইকবাল, পৃঃ ১২৭, প্রকাশক, আল মানার একাডেমি, লাহোর, ১৯৪৭)

দুটি রেওয়ায়েত

কাদিয়ানীরা লক্ষ লক্ষ রেওয়ায়েত ভান্ডার থেকে দুটি দুর্বল ও ক্রুটিযুক্ত রেওয়ায়েত খুঁজে নিয়ে সেগুলোকে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিজেদের স্বকথিত নবুওয়তের আশ্রয় বানানোর চেষ্টা করেছে। কাজেই এখানে সেগুলোর উপরও আলোকপাত করা প্রয়োজন। এই অসমর্থিত রেওয়ায়েতটি 'দুররে মনসুর' থেকে নেয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেছেন, তোমরা সর্বশেষ নবী বল, এবং বলোনা যে, তাঁর পর কোন নবী আসবে না। প্রথমত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা দরকার যে, এ রেওয়ায়েতটি কোত্থেকে নেয়া হয়েছে। যদি পাঠকবর্গ হাদীসের কোন প্রামান্য গ্রন্থে এর সন্ধান করেন, তবে

আপনাকে নিরাশই হতে হবে। কারণ রেওয়াতেটি বুখারী, মুসলিমে তো দূরের কথা নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারমী, মুসনাদে আহমদ তথা হাদীসের কোন প্রাপ্ত গ্রন্থে নেই। তবে এটি নেয়া হয়েছে কোত্থেকে? আল্লামা সুয়ুতী প্রণীত 'দুররে মনসুর' থেকে যার সম্পর্কে সামান্য একজন তালেবে এলমও জানে যে, এতে সর্ব প্রকার কাচা-চিটা, দুর্বল ও মওজু রেওয়ায়েতও কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই সন্নিবেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, হাদীসের বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণভাবেই তার সনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর আলোচ্য এ রেওয়ায়েতের কোন সনদই কারো জানা নেই। কাজেই মহানবী (সঃ)-এর শব্দাবলীতে নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদারদের অপসংযোজন ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? কারণ, একদিকে কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে কোরআনে করীমের পরিস্কার ও প্রকৃষ্ট আয়াত ও মহানবী (সঃ)-এর শত শত বিশুদ্ধ ও মুতাওয়াতের হাদীসের কোনই গুরুত্ব নেই, কিন্তু অপর দিকে সনদ না জানা এই রেওয়ায়েতটি এলমে হাদীসের দিক দিয়ে যার আদৌ কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই, এমনি অকাট্য ও নিশ্চিত যে, একে খত্মে নবুওয়তের মত মুতাওয়াতের, নিশ্চিত ও সামগ্রিক আকিদাকে ভাঙ্গার জন্য পেশ করা হচ্ছে। কোন নবীর নবুওয়ত কি এমন ধরনের রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমানিত হয়? কিন্তু এ বিষয়টি সে লোকের সাথেই বলা যেতে পারে যে কোন জ্ঞানগত কিংবা যুক্তিসম্মত নিয়মবিধির অনুসারী। পক্ষান্তরে যার কাছে যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান ও চরিত্রভিত্তিক প্রতিটি কথার উত্তর স্বকপোল কল্পিত এলহাম ছাড়া অন্য কিছুই নেই, তার কাছে যুক্তি প্রমাণের যত বড় স্তুপই তুলে ধরা হোক মির্জা সাহেবের ভাষায় তার উত্তর একটাই পাওয়া যাবে যে, "খোদা আমাকে সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এ সমুদয় হাদীস যা পেশ করা হয় সবই অর্থগত কিংবা শব্দগতভাবে বিকৃত কিংবা সম্পূর্ণভাবেই মওজু। তাছাড়া যে ব্যক্তি বিচারক হয়ে এসেছে তার এ অধিকার রয়েছে যে, খোদার কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যেই স্তুপকে ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যে স্তুপকে ইচ্ছা খোদার কাছ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করবে।" - (আরবাঈন, পৃঃ ১৮ (হাশিয়া) মুদ্রণ, ১৯০০)

তাছাড়া এ রেওয়ায়েতে যে বিষয়টি বলা হয়েছে তার সাথে মির্জা সাহেবের আকীদা-বিশ্বাসের দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং এ রেওয়ায়েতটি তো হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ সংক্রান্ত আকীদায় কাদিয়ানী মতবাদের সরাসরি বিরোধিতা করে। এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে সংযুক্ত এই উক্তির বিশ্লেষণ স্বয়ং "দুররে মনসূরেই" রয়েছে। তাহল এই ঃ অর্থাৎ সম্মানিত তাবেঈ হযরত সা'বী বলেছে যে, হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বাহ (রাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন যিনি সর্বশেষ নবী এবং যার পরে কোন নবী আসবে না। হযরত মুগীরাহ বললেন, "সর্বশেষ নবী" বলাই যথেষ্ট ছিল। কারণ, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা(আঃ) অবতীর্ণ হবেন। যখন তিনি অবতীর্ণ হবেন, তখন মহানবীর পূর্বেও এলেন এবং পরেও আসবেন। - (দুররে মনসুর ৫ পৃঃ ২০৪)

সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বাহ (রাঃ)-এর এই হেদায়েতকে সনদের দিক দিয়ে প্রমানিত বলে ধরে নিলেও হযরত আলী (রাঃ)-এর সে বাণীরই অনুরূপ যাতে তিনি বলেছেন, মানুষকে এমন কথাই বল যা তারা বুঝতে পারে। - (বুখারী-১, পৃঃ ২৪)

বস্তুতঃ এ রেওয়াতের দ্বারা শুধু যে কাদিয়ানী মতের কোন সমর্থনই হয় না, তা নয়, বরং এটি সরাসরিভাবে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বল (রঃ)-এর মুসনাদে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণিত আছে যে, "হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমার পরে নবুওয়তের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না, মুবাসসারাত ছাড়া। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, মুবাস্সারাত কি জিনিস ইয়া রাসূলুল্লাহ্? তিনি (সঃ) বললেন, মুবাস্সারাত হল, কোন মুসলমানের সুস্বপ্ন যা নিজে দেখবে, কিংবা তার ব্যাপারে অন্য কেউ দেখবে।" সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে একমাত্র সুস্বপ্ন ছাড়া নবুওয়তে যাবতীয় প্রকার ও সমস্ত অংশ মহানবী(সঃ)-এর উপর শেষ হয়ে গেছে।

(২) দ্বিতীয় দুর্বল রেওয়ায়েতটি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, যতদিন মহানবী (সঃ)-এর পুত্র ইবরাহীমের ইন্তেকাল হয়, তখন মহানবী(সঃ) বলেন, যদি সে বেঁচে থাকত, তবে সত্যবাদী নবী হত।

এ হাদীসের অবস্থাও এই যে, এর পর্যালোচনাকারী ইমামগণ একে দুর্বল এবং বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নববী (রাহঃ)-এর মত উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস এ প্রসংগে বলেছেন যে, এ হাদিসটি বাতিল।
- (মওজুয়াতে কবীর, পৃঃ ৫৮)।

এ হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী আবু শাইবাহ ইবরাহীম ইবনে ওসমান সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল(রাহঃ) বলেছেন যে, "লোকটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।" ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেছেন, "লোকটি মুনকেরুল হাদীস।" ইমাম নাসায়ী (রাহঃ) বলেন, 'মতরুকুল হাদীস'। ইমাম জাউযানী (রাহঃ) বলেন, এর কোন বিশ্বাস নেই। ইমাম আবু হাতেম (রাঃ) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস। - (তাহযীবুত্ তাহযীব-১, পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

অবশ্য এ রেওয়ায়েতের শব্দাবলী সহীহ বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আওফা(রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে যদি কোন নবীর আগমন নির্ধারিত হত, তাহলে তাঁর পুত্র জীবিত থাকত, কিন্তু তার (সঃ)-এর পরে কোন নবী নেই।

এ শব্দাবলী ইবনে মাজাহর দুর্বল যে রেওয়ায়েতের তাৎপর্যও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এর আসল উদ্দেশ্য কি ছিল। আর সেটি খত্‌মে নবুওয়তের বিরোধী তো নয়ই বরং আসলে এতে খত্‌মে নবুওয়তের আকীদা অধিকতর বলিষ্ঠ ও অকাট্য হয়ে যায়।

এটি একটি অলংঘনীয় বাস্তব যে, সহীহ বোখারী কোরআনে করীমের পর সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কিতাব। সুতরাং আরো কোথাও যদি কোন দুর্বল রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়ে থাকে কিংবা তার বিশ্লেষণ সহীহ্ বোখারীর শব্দের মাধ্যমেও জানা যায় এবং অতঃপর যদি সেগুলোর সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে দুর্বল রেওয়ায়েতটি পরিহার করে বোখারীর রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে হবে। মির্জা সাহেবের অবস্থা হলো এই যে, তিনি সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসকে শুধুমাত্র এ কারণে

বর্জন করেন যে, ইমাম বোখারী এটি উল্লেখ করেননি। 'এযালাতুল আওহাম' পুস্তকে তিনি লিখেছেন, এটি সেই হাদীস যেটি সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইমাম মুসলিম লিখেছেন যাকে দুর্বল মনে করে রাঈসুল মুহাদ্দেসীন ইমাম মোহাম্মদ ইসমাঈল বোখারী (রাহঃ) পরিহার করেছেন। - এযালাতুল আওহাম ১, পৃঃ ৯৩, ৫ম সংস্করণ।

অথচ সহীহ মুসলিম নিজেই একখানি অতি বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ এবং শুধু ইমাম বোখারী কর্তৃক কোন রেওয়ায়েত ছেড়ে দেয়া তার দুর্বলতার প্রমাণ নয়। পক্ষান্তরে ইবনে মাজাহর এই রেওয়ায়েত বস্তুতঃই দুর্বল এবং সহীহ বোখারীতে এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা উদ্ধৃত রয়েছে।কিন্তু কাদিয়ানী ভদ্রলোকেরা ঐটিকে বার বারই নিজেদের দলীল হিসাবে পেশ করে যাচ্ছেন। এর কারণ সুস্পষ্ট; কোন যথার্থ দলীল থাকলে তো তারা পেশ করবেন। এমন রেওয়ায়েতে যদি পরিস্কারভাবে খত্‌মে নবুওয়তের আকীদাকে রদ করা হত, তবুও একটি মুতাওয়াতের তথা ধারাবাহিক আকীদার ব্যাপারে কখনও গ্রহণযোগ্য হতো না। অথচ এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই যে, যদি একে যথার্থ বলে মেনে নেয়া হয়, ও তথাপি এতে একটা ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র যার বাস্তবতার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। যদি হযরত ইবরাহীমের জীবনে কথাটি বলা হতো, তাহলে হয়তো বলা যেতে পারত যে, মহানবী (সঃ)-এর পরে নবুওয়তের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশাতেই মহানবী (সঃ) এমন ধরনের কথা বলেছিলেন। সেক্ষেত্রে যেহেতু নবুওয়ত অব্যাহত থাকার সন্দেহ হতে পারত, তাই মহানবী (সঃ) সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং সর্বকালের জন্য খত্‌ম করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, "আমার পরে যদি কেউ নবী হত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব হত। - তিরমিযী।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার পরে যেহেতু নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই হযরত ওমর নবী হতে পারবেন না। এমনিভাবে মহানবী (সঃ) গযওয়ায়ে তাবুকের সময় মদীনা তায়্যেবায় হযরত আলী(রাঃ)-কে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করতে গিয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি কি এতে সম্মত নও যে, তুমি আমার সাথে এমন হয়ে যাবে যেমন

মূসা(আঃ)-এর সাথে হারুন(আঃ) (অর্থাৎ, তুর পাহাড়ে যাবার সময় হযরত মূসা হযরত হারুনকে প্রতিনিধি করে রেখে গিয়েছিলেন)। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবুওয়ত নেই। - (বোখারী ও মুসলিম)।

এখানে হযরত আলীকে শুধু সহকারী নির্ধারণের ব্যাপারে হযরত হারুনের সাথে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এতে খত্‌মে নবুওয়তের বিরুদ্ধে ভুল-বুঝাবুঝি হতে পারত, তাই তিনি (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে "ইল্লা আন্নাহূ লা নবুওয়াতা বা'দী(আমার পরে কোন নবুওয়ত অবশিষ্ট নেই) বলে সে সংশয়ের অবসান করে দিয়েছেন।

অবশ্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে এই কথাটি তার ইন্তেকালের পরে বলা হচ্ছিল এবং তার জীবিত থাকার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট ছিলনা, তাই শব্দগুলো এমন ব্যবহার করা হয়েছে যে, "যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে সিদ্দীক নবী হতেন।" কিন্তু যেহেতু বেঁচে থাকেননি তাই নবী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।" সুতরাং এ বিষয়টিও ঠিক তেমনি, যেমন কোরআনে আছে, আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আরো কিছু মা'বুদ থাকত, তাহলে আকাশও পৃথিবীময় হাঙ্গামা বেধে যেত। বলাই বাহুল্য যে, এটি একটি রূপক মাত্র। যদি কেউ এর দ্বারা কোন প্রমান উপস্থাপন করতে শুরু করে, তবে এটা হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে।

এই ছিল মহানবী(সঃ)-এর লাখো হাদীস ভান্ডারের মধ্য থেকে কাদিয়ানী প্রমানের সর্বস্ব, যার ভিত্তিতে নাকি কোরআনের অসংখ্য আয়াতকে মহানবী (সঃ)-এর হাজার হাজার সুস্পষ্ট ও মুতাওয়াতের হাদীসকে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র অকাট্য এজমাকে ছেড়ে মির্জা গোলাম আহমদকে নবী বলে মানতে হবে, নয়তো তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

কোরআনে করীমের একটি আয়াত

মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে মির্জা সাহেবের নবুওয়তের জন্য কোরআনে করীম থেকেও একটি আয়াত খুঁজে বের করা দরকার হয়ে পড়েছিল, যাতে অন্ততঃ কথার কথা হলেও বলা যেতে পারে যে, কোরআনের দ্বারাও 'প্রমাণ' করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে কোরআনে

করীমের যে আয়াতটি কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে খুঁজে আনা হয়েছে তার অর্থ হল এই, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে, সে সমস্ত লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা ও কৃপা করেছেন। অর্থাৎ নবীদের সঙ্গে, সিদ্দীকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে এবং সৎলোকদের সঙ্গে। বস্তুতঃ এরা হল উত্তম সঙ্গী।"

এ আয়াতটি বার বার মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে দেখুন, অনুবিক্ষন লাগিয়েও কি এতে কোথাও এ বিষয়টি দেখা যায় যে, নবুওয়তের ধারা অব্যাহত রয়েছে কিংবা আজো কেউ নবী হতে পারে? কিন্তু যে ধর্ম 'দামেশক বলতে 'কাদিয়ান' বুঝতে পারে, যে কাদিয়ানের উল্লেখ কোরআনে দেখতে পায় এবং যে 'খাতেমুন নবিয়্যীন-এর এমন অর্থ বের করতে পারে যাতে সমস্ত "নবুওয়তের শিরোমনি" নবুওয়তের দরজা খোলা থাকে, যে এ আয়াত দ্বারাও নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে ?

এ আয়াতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যশীল ব্যক্তি আখেরাতে নবী, সিদ্দীক,শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সাথী হবে। কিন্তু কাদিয়ানীরা এর অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে যে, এরা নিজেরাই নবী হয়ে যাবে। বলা হয় যে, এখানে (সঙ্গ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার এ অর্থও নেয়া যেতে পারে যে, মানুষ শুধু নবী প্রমুখের সাথেই থাকবে না, বরং তাঁদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু যে লোক এ আয়াতের শব্দাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে রাখেনি সে দেখতে পাবে যে, এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে এসব লোক হলেন চমৎকার সঙ্গী।

সর্বশেষ এ বাক্যটিতে 'রফীক' শব্দটিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এর অর্থ অন্য কোন কিছু হতেও পারে, তবুও এখানে সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নয়। কারণ পরে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দ এসেছে।

অতঃপর (নাউযুবিল্লাহ্) যদি এই উদ্দেশ্যই হত যে, প্রত্যেক লোকই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বনের মাধ্যমে নবী হয়ে যেতে পারে, তবে কি সমগ্র উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যকারী ব্যক্তি

একমাত্র মির্জা গোলাম আহমদই জন্মে ছিলেন? আর কেউ কি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করেন নি? অথচ কোরআন বলছে-(নাউযুবিল্লাহ্) যে লোকই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে নবীদের দলে শামিল হয়ে যাবে। এরই নাম যদি "প্রমাণ করা" হয়, তাহলে কোরআনের বিকৃতি আর না জানি কি হবে?

কোন কোন সূফীদের ভ্রান্ত উদ্ধৃতি

কাদিয়ানীরা কোন কোন সুফী ব্যক্তির অসমাপ্ত ও দুর্বোধ্য উদ্ধৃতি খুঁজে পেয়ে সেগুলোকে নিজেদের স্বকথিত নবুওয়তের সমর্থনে পেশ করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের পেশকৃত এ ধরনের উদ্ধৃতির উত্তর অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত, প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্যভাবে দেয়া হয়েছে। এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কিছু মৌলিক তথ্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করা অপরিহার্য।

দ্বীন সম্পর্কে পুর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের উক্তির তাৎপর্য

সর্বাগ্রে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, দ্বীনের উৎসমূল হল কোরআনে করীম, রসূলে আকরাম(সঃ)-এর হাদীস ও এজমায়ে উম্মত (মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য)। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজনের ব্যক্তিগত কোন মতামত এ বিষয়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যা দ্বীনের মৌলিক উৎস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে 'নবুওয়ত' ও 'রেসালত'-এর মত মৌলিক আকীদা তো 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কোন বিচ্ছিন্ন ধারনা তো দূরের কথা। সুতরাং এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের ধারাবাহিক তথা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ও এজমায়ে উম্মতের বিরোধী কোন ব্যক্তিগত রচনা উপস্থাপিত হলেও সেগুলো নিশ্চিতভাবেই আলোচনা বহির্ভূত হয়ে যাবে। কোনক্রমেই সেগুলো প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। কাজেই কাদিয়ানীরা সূফীদের যেসব দুর্বোধ্য বাক্যের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদের রচনার মর্মার্থ যদি ঘটনাচক্রে খত্মে নবুওয়তের বিরোধী প্রমানিত হয়ে যায়, তবে হয়তো বা এই বলিষ্ঠ সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাসের কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, বরং যে কেউ তাদের কথার যথাযথ

বিশ্লেষণ করে থাকুক তার আসল উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তাদের উপর একটা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা ন্যায়ানুগ পন্থায় অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে সব লোকের রচনাবলীকে খত্‌মে নবুওয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বানিয়ে উপস্থাপন করলে খত্‌মে নবুওয়তের আকীদায় কোন দোষ আরোপিত হয় না, বরং উল্টা সেসব মনীষীর উপর এই অপবাদ আরোপিত হয়। সুতরাং তাদের বাণীর বিশ্লেষণে যা কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো খত্‌মে নবুওয়তের আকীদার পরিপন্থী নয়, বরং সেসব বুযুর্গের পরিপন্থী। কাজেই তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়।

কাদিয়ানী ধর্মে পূর্ববর্তী মনীষী বাক্যের গুরুত্ব

আরেকটি বিষয় হল এই যে, কাদিয়ানীদের তো নিজেদের ধর্মমত অনুযায়ী কোন অবস্থাতেই এ অধিকার অর্জিত হয় না যে, তারা সে সমস্ত বুযুর্গ মনীষীদের বাণীর দ্বারা নিজ মতবাদ প্রমাণ করবে। কারণ বহু বিষয় রয়েছে যাতে তারা এজমায়ে উম্মত (মুসলিম জাতির ঐকমত্য)-কেও সঠিক বলে স্বীকার করেনি, বরং সেগুলোকে শরীয়তের দলীল হিসাবে গণ্য করতেই অস্বীকার করেছে। সুতরাং হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর অবতরণের আকীদা প্রত্যাখ্যান করে মির্জা গোলাম আহমদ লিখেছে, "ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বুঝবার ব্যাপারে যখন নবীগণেরই ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন উম্মতের অর্বাচীনসুলভ ঐকমত্যের কি গুরুত্ব থাকতে পারে"? - (এজালাতুল আওহাম ২য় মুদ্রণ, ১৯০২, খণ্ড-১, পৃঃ ৭১)

সে আরো লিখেছে, "আমি আবারো বলছি, এ ব্যাপারে মুসলমানদের যাদের মধ্যে ওলী-আওলিয়াগণও অন্তর্ভূক্ত এজমা বা ঐকমত্যের নামে নিষ্পাপ হতে পারে না"। - (এজালাতুল আওহাম, ২য় মুদ্রণ, ১৯০২, খণ্ড-১, পৃঃ ৭২)

আর (তার দৃষ্টিতে) এজমার অবস্থাই যখন এমন তখন পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যক্তিগত মতামতের গুরুত্ব তো নিজে থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মির্জা সাহেব লিখেছে ঃ "আর পূর্ববর্তী বা পরবর্তীদের কোন বক্তব্যই মূলতঃ কোন স্থায়ী দলীল নয় এবং তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে সে দলই ন্যায়ভিত্তিক হবে, যাদের মতামত কোরআন করীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে"। - (এজালাতুল আওহাম, ২য় মুদ্রণ, ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

মির্জা সাহেব লিখে, কোন লোক যদি এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ করে ফেলে যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই সে ব্যক্তি এলহামের অধিকারী কিংবা মুজতাহিদ হলেও সে প্রকৃত পক্ষে শয়তানের ক্রীড়নক"। - আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২১, মুদ্রণ-রাবওয়া, ১৮৯৩ খৃঃ। সুতরাং কাদিয়ানীদের জন্য কোরআন করীমের প্রকৃষ্ট আয়াত ও মুতাওয়াতের হাদীস ছাড়া কতিপয় সুফীবাদীর বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কেমন করে সঠিক হতে পারে?

সূফী মনীষীবৃন্দের পন্থা

তৃতীয় নীতিগত বিষয় হল এই যে, পৃথিবীর সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালার মত প্রত্যেক এলেম ও বিষয়ের উপাদ্য, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার পরিভাষা এবং তার বিশেষজ্ঞও পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক জ্ঞান ও বিষয়ের বর্ণনা ভঙ্গি পৃথক হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ না হলে, অনেক সময় সে বিষয়ের বই পুস্তক পাঠ করে করে কঠিন বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। যদি কোন সাধারণ লোক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পড়ে তার মাধ্যমে নিজের চিকিৎসা আরম্ভ করে দেয়, তাহলে তা তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ইসলামী এলেমের অবস্থাও তেমনি। তফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আকায়েদ ও তাসাউফ প্রভৃতির মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের ওজীফা, তার পরিভাষা এবং তার বর্ণনা ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। আর এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল ও সূক্ষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সে সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেগুলো তাসাউফ ও তার দর্শন সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কারণ, এসব গ্রন্থের সম্পর্ক হল মতবাদ বাহ্যিক আমলের পরিবর্তে সে সমস্ত আভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতা, সে সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার সাথে যা সুফীদের মধ্যে তাদের রিয়াজতকালে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রচলিত ভাষায় এ অবস্থার বিবরণ দেয়া দুষ্কর।

এ কারণেই দ্বীনের মৌলিক বিষয় আকীদা-বিশ্বাস ও আমল সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি না এলমে তাসাউফের আলোচ্য বিষয়, না উম্মতের ওলামায়ে কেরাম তাসাউফের কিতাবসমূহকে এসব ব্যাপারে কোন উৎস কিংবা দলীল সাব্যস্ত করেন।

পক্ষান্তরে আকায়েদ সংক্রান্ত আলোচনা এলমে কালামে আমলী আহকাম সংক্রান্ত বিষয় এলমে ফেকায় আলোচনা করা হয় এবং এ সব জ্ঞানের গ্রন্থসমূহই এসব ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়। স্বয়ং সূফী মনীষীরাও এসব বিষয় সংক্রান্ত কিতাবই গ্রহণ করেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তি তাসাউফের সেই গোপন মানসিক অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি তার জন্য সে সব কিতাব চোখে দেখাও জায়েজ নয়। অনেক সময় সেসব কিতাবে এমন সব বিষয় বা কথা-বার্তা দেখা যায়, দৃশ্যত, সেগুলোর কোন মর্মার্থ বুঝেই আসেনা। কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে তাৎপর্য বুঝা যায়, তা একান্তভাবে বুদ্ধি বহির্ভূত মনে হয়। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু। এ ধরনের এবারতকে "সাতহিয়্যাত" বলা হয়। কাজেই কোন মৌলিক আকীদা সম্পর্কিত বিষয়ে তাসাউফের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করা এমন এক নীতিগত ভুল, যার পরিণতি পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উচ্চ পর্যায়ে সূফী ওলামায়ে কেরামও এই মূলনীতিটি স্বীকার করেন। হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী(রাহঃ) তাসাউফ শাস্ত্রেরও একজন ইমাম ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, শরীয়তে হুকুম আহকাম প্রমাণ করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হল কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের কেয়াস। এজমায়ে উম্মতও আহকামের প্রমাণসূত্র বটে। এই দলীল চতুষ্ঠয়ের পর শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন দলীল থাকতে পারে না। এলহাম যেমন হালাল-হারাম প্রমাণ করে না, তেমনি কাশফও ফরজ-সুন্নতের প্রমাণ হতে পারে না"। - মকতুব ৫৫, মকতুবাত, ৭ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১৫ পৃঃ)

অন্য এক স্থানে সূফীদের 'সাতহিয়্যাতের' দ্বারা দার্শনিক মাসআলা উদ্ভাবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "একথা শায়খ কবীর ইয়ামনী বলে থাকে কিংবা শায়খ আকবর শামী বলে থাকে, আমাদের দরকার হল মুহাম্মদ আরবী (সঃ)-এর বাণী—মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী, সদরুদ্দীন কৌনিভী কিংবা আবদুর রাজ্জাক কাশীর বাণীতে প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন হল 'নস্' তথা কোরআন হাদীস, 'ফস' অর্থাৎ ইবনে আরবীর ফুসুসুল হাকামের প্রয়োজন নেই।

মদীনার বিজয় আমাদেরকে মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে পরান্মুখ করে দিয়েছে"। - মাকতুবাত, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায় নং-১০।

এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের পর কোরআন, হাদীস, এজমা ও কেয়াসের আলোকে ইসলাম ও কুফরী সংক্রান্ত আকায়েদের মৌলিক কোন বিষয়ে সূফী মনীষীদের কিতাবাদীর দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ পেশ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারপরেও ঘটনাচক্রে সুফীদের দ্বারা এমন ধরনের "সাতহিয়্যাত" প্রমানিত হয় ও তবে তাতে খত্মে নবুওয়তের আকীদার অকাট্যতা ও দৃঢ়তায় এতটুকু ঘাটতি আসেনা।

অবশ্য একথা সত্য যে, যে সব সুফী মনীষীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁরা শরীয়ত বিহীন নবুওয়ত থাকার পক্ষপাতি, এটা তাঁদের উপর এমনি এক কঠিন অপবাদ যে, তা শুধু তাঁদের পরিভাষা কিংবা বাকধারা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আরোপ করা হয়েছে। এখানে আমরা সে সমস্ত বাণী-বিবৃতির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে গেলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন। সুতরাং যেহেতু আমাদের উপরোক্ত নিবেদনের আলোকে এটি খত্মে নবুওয়তের আকীদা সংক্রান্ত নয়, বরং সেই বুযুর্গদেরকে প্রতিরোধ করা, যে জন্য এটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূতও বটে। কিন্তু এখানে সে সমস্ত বুযুর্গের কোন কোন প্রকৃষ্ট ভাষ্য উদ্ধৃত করা হল যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারাও গোটা উম্মতের মতই খত্মে নবুওয়ত-এর উপর অটল ঈমান পোষণ করেন।

মোজাদ্দেদে আলফে সানীর (রাহঃ) ভাষ্যে মির্জার স্পষ্ট বিকৃতি

এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম মির্জা গোলাম আহমদের এই হঠকারিতা ও ধৃষ্টতা লক্ষ্যণীয় যে, তিনি নিজের নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্য মুজাদ্দেদে আলফে সানীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছে এবং তাতে একটি শব্দ নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে লিখেছে ঃ "কথা হল এই যে, যেমন মুজাদ্দেদ সাহেব সেরহিন্দী তাঁর মকতুবাতে লিখেন, যদিও এই উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র সংলাপ ও সংবোধনের দ্বারা বিশিষ্ট রয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিশিষ্ট থাকবেন। কিন্তু এই সংলাপে ও সংবোধনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে এবং

বিপুল পরিমাণ গায়েবী বিষয় তার কাছে প্রকাশ করা হবে তাকে নবী বলা হয়। - হাকীকতুল ওহী, পৃষ্ঠা-৩৯০, মুদ্রণ ১৯০৭।

অথচ মির্জা সাহেব হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রহঃ)-এর যে ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছে সেটি হল এরকম ঃ "আর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যখন প্রচুর পরিমাণে কারো সাথে এ ধরনের কালাম (কথোপকথন) হতে থাকে, তখন তাকে 'মুহাদ্দেস' বলা হয়"। - (মকতুবাত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯)

লক্ষ্য করুন, হযরত মুজাদ্দেদ সাহেবের ভাষ্যে 'মুহাদ্দেস' শব্দটিতে মির্জা সাহেব কেমন করে 'নবী' শব্দে পরিবর্তিত করে দিলো। মোহাম্মদ আলী লাহোরী এ বিষয়টি স্বীকার করে লিখেছে ঃ "আমরা যখন মুজাদ্দেদ সাহেব সেরহিন্দী (রাহঃ)-এর মকতুবাতসমূহ দেখি, তখন তাতে একথা খুঁজে পাই না যে, অধিক সংলাপ ও সংবোধন প্রাপ্ত লোকদেরকে 'নবী' বলা হয়। বরং সেখানে 'মুহাদ্দেস' শব্দটি রয়েছে। - (আন নবুওয়ত ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৪)।

অতঃপর এই পরিস্কার খেয়ানতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছে যে, "আসলে মির্জা সাহেব এখানে 'নবী' শব্দটিকে 'মুহাদ্দেস' অর্থেই ব্যবহার করেছে। এবং যদি এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে তো মসীহ মাওউদের উপর এই অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে, আপনি নাউযুবিল্লাহ্ নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুজাদ্দেদ সাহেবের ভাষ্যকে বিকৃত করেছেন"। - (আননবুওয়ত ফিল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী লাহোরী, পৃষ্ঠাঃ ২৪৮)

অথচ মির্জা সাহেব নিজে 'নবী' শব্দটিকে নিজের কথায় 'মোহাদ্দেস' অর্থে ব্যবহার করলেও একটা কথা ছিল। হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রাহঃ)-এর সাথে জবরদস্তিমূলক এই 'নবী' শব্দটিকে সম্পৃক্ত করে তার অর্থ 'মুহাদ্দেস' সাব্যস্ত করা কোন শরীয়ত, কোন ধর্ম এবং কোন যুক্তির ভিত্তিতে জায়েয হতে পারে? বিস্মিত হতে হয় সে সমস্ত লোকের বুদ্ধি-আক্কেল দেখে, যারা মির্জা সাহেবের বক্তব্যে এমনি ধরনের প্রকাশ্য কারচুপি ও খেয়ানত দেখার পরেও তাকে নবী, মসীহ মাওউদ ও মুজাদ্দেদ তথা সংস্কারক প্রতিপন্ন করতে বদ্ধ পরিকর।

মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ)

আরেক মহান ব্যক্তিত্ব হলেন মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) যাঁর সম্পর্কে এমন বক্তব্য আরোপ করা হয় যে, তিনি খত্‌মে নবুওয়তের বিরুদ্ধে নবুওয়তের কোন প্রকারকে জায়েজ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি লক্ষ্যণীয়। তিনি লিখেছেন ঃ এ ধরনের চ্যালেঞ্জ নবুওয়ত দাবীরই একটা শাখা। আর আমাদের নবী করীম(সঃ)-এর পরে নবুওয়তের দাবী করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী"। - (মুলহাকাতে শারহে ফেক্‌হে আকবর, পৃষ্ঠা-২০১)

এই এবারতটি হযরত মোল্লা আলী কারী সাহেব(রাহঃ) সে সমস্ত লোকের প্রসঙ্গে লিখেছেন যারা শুধুমাত্র মু'জেযায় অন্যদের মোকাবেলায় বিজয় লাভের দাবী করে থাকে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে শুধু শরীয়তবিহীন নবুওয়তের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ **এমন দাবী** করাকেও মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) কুফর বলে সাব্যস্ত করেছেন।

শায়েখ ইবনে আরবী ও শায়খ শা'রানী

শায়খ মহিয়্যুদ্দীন ইবনে আরবীর প্রতি বিশেষভাবে অতি প্রবলভাবে এ কথাটি আরোপ করা হয় যে, তিনি শরীয়তবিহীন নবুওয়তের প্রবক্তা। কিন্তু তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন ঃ নবুওয়ত শেষ হয়ে যাবার পর ওলিয়াল্লাহদের জন্য শুধু মা'আরেফ আধ্যাত্মজ্ঞান অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম (কোন বিষয়ের হুকুম) কিংবা নিষেধ (কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা)-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কোন ব্যক্তি এর দাবী করবে সে প্রকৃত পক্ষে শরীয়তেরই দাবীদার, তা তার এলহাম আমাদের শরীয়তের মোতাবেক হোক কিংবা পরিপন্থী"। - (ফুতুহাতে মক্কিয়া, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১)

এই বিবরণের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, (১) শায়খ আকবর (রাহঃ)-এর দৃষ্টিতে শরীয়তের দাবীদার শুধু সে ব্যক্তিই নয় যে শরীয়তে মুহাম্মদীর পরে নতুন আহকাম বা নির্দেশনামা নিয়ে আসবে, বরং নবুওয়তের এমন দাবীদারও তাঁর মতে শরীয়তের দাবীদার হিসাবেই গণ্য, যার ওহী হুবহু মুহাম্মদী শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(২) মহানবী (সঃ)-এর পর নতুন কোন শরীয়তের দাবী করা যেমন খতমে নবুওয়তের প্রতি অস্বীকৃতি তেমনি শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওহীর দাবীও খত্‌মে নবুওয়তের প্রতি অস্বীকৃতি।

(৩) শায়খ আকবর (রাহঃ) তাশরীয়ী নবুওয়ত অর্থ সেই নবুওয়ত যাকে শরীয়ত নবুওয়ত বলে অভিহিত করে। তা সেই নবুওয়ত নবতর শরীয়তের দাবীদার হোক কিংবা শরীয়তে মুহাম্মদীর সাথে সামঞ্জস্যতার দাবী করুক। সুতরাং গায়ের তাশরীয়ী (অধ্যাদেশ বিহীন) নবুওয়ত বলতে অর্থ হবে নবুওয়তী কামালাত ও ওলিত্ব। বস্তুতঃ এগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়ত 'নবুওয়ত' শব্দ প্রয়োগ করে না এবং সেগুলো নবুওয়ত বলে অভিহিত হয় না।

আরেফ বিল্লাহ্ ইমাম শা'রানী (রাহঃ) "আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির" গ্রন্থে শায়খ আকবর(রাহঃ)-এর উল্লেখিত ভাষ্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে তার সাথে কথাটি উল্লেখ করেছেন, "সে **লোকটি** যদি প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান হয় (পাগল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক না হয়), তাহলে আমাদের উপর তাকে হত্যা করা ওয়াজেব। অন্যথায় তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে"।

রাজনৈতিক পটভূমি

৩০শে জুন জাতীয় পরিষদে আমাদের পেশকৃত প্রস্তাবে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কর্তৃক জেহাদকে শেষ করার প্রয়াসের বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে। তদপুরি সে ছিল সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঐক্যকে ধ্বংস করা। কাদিয়ানীদেরকে যে নামেই অভিহিত করা হোকনা কেন ওরা ইসলামেরই একটি উপদল বা ফেরকা হওয়ার ছলনার ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ভাবে নানা রকম ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আমরা নিম্নবর্ণিত চারটি বিষয় কাদিয়ানীদেরই লেখা, তাদের তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের আলোকে পর্যালোচনা করব।

(ক) কাদিয়ানী মতবাদ সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ফসল ।

(খ) এসব উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে জিহাদকে শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বরং সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় সম্পূর্ণভাবে হারাম, অবৈধ ও রহিত করা।

(গ) মুসলিম উম্মাহর একতা, ঐক্য ও বন্ধনকে ধ্বংস করা।

(ঘ) সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও বাংলাদেশে ধ্বংসাত্মক ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালানো।

ইউরোপীয় সম্প্রসারনবাদ ও কাদিয়ানী মতবাদ

প্রথম বিষয় মির্যা সাহেব ও তার অনুসারীরা যে ইউরোপীয় সম্প্রসারণবাদীদের ক্রীড়নক, তা এমন একটি প্রকৃষ্ট সত্য যে, মির্যা কাদিয়ানী শুধু এ বিষয়টি স্বীকারই করেননি বরং একান্ত গর্বের সাথে জোরগলায় এসব বিষয় নিজের প্রত্যেকটি লেখা ও রচনার মাধ্যমে ঘোষণা করে। সে নির্দ্বিধায় নিজেকে ইংরেজদের স্বরোপিত চারা, বংশগত বশংবদ, ইংরেজ সরকারকে নিজের প্রভু এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও রহমত গণ্য করেছে। সাথে সাথে ইংরেজদের আনুগত্যকে পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য সাব্যস্ত করেছে। অপরদিকে ইংরেজ কর্মকর্তা ও সাম্রাজ্যও তাদের বশংবদতার পঞ্চমুখ প্রশংসা করেছে। এখন লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, ইউরোপ ও বৃটেন মির্জাকে তাদের সম্প্রসারণবাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কি কি উপায় ও পন্থায় ব্যবহার করতে রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ ও ইউরোপীয় সম্প্রসার

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর বেশির ভাগ এলাকায় নিজেদের সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমন করে বসে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে বৃটিশরাই ছিল অগ্রবর্তী। ইটালী, ফ্রান্স ও পুর্তগাল আফ্রিকা মহাদেশকে ইটালী, সুমালী ল্যান্ড ফ্রান্স সুমালী ল্যান্ড পর্তুগীজ-পূর্ব আফ্রিকা, জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ও বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকায় বিভক্ত করে নেয়ার পর মধ্য প্রাচ্যের কোন কোন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিল। ইটালী ইরিত্রিয়া, ফ্রান্স মাদাগস্কার দ্বীপপুঞ্জ এবং বৃটেন রোডেশিয়া ও ইউগান্ডাকে ভাগ করে নেয়। তথাকথিত স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলগুলোতে ইউনিয়ন অব সাউথ

আফ্রিকা ছাড়া মিসর, আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া গণ্য হচ্ছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সে আমলে ভারত, বার্মা ও শ্রীলংকাকে নিজের শাসনভুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ভারত মহাসাগরকে নিজের সম্প্রসারণবাদীর তৎপরতার ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকুলবর্তী মালয়েশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে সিঙ্গাপুর ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাটি। একে কেন্দ্র করে ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াকে পৃথক করা যেতে পারত। সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে নিজেদের নিন্দনীয় মতলব চরিতার্থ করা তখন সহজতর হয়ে যায়, যখন ১৭৬৯ সালে সুয়েজ খাল নির্মাণের পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ব্যতিরেকে ভূ-মধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের সহজ পথ অবলম্বন শুরু হয়ে যায়। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত বৃটেন জিব্রাল্টার ও মালটা দখলের মাধ্যমে এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮৩৯ সালে এডেনও জয় করে নেয়। এ সময় বাকী থেকে যায় গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া দখল।

ইংরেজ ও উপমহাদেশ

ইংরেজরা যখন উপমহাদেশ ও মুসলিম বিশ্বে নিজেদের সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তার করতে শুরু করে, তখন তাদের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকে। এক—মুসলমানদের মতবাদগত ঐক্য, দ্বীনি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন সংশ্লিষ্টতা এবং মুসলমানদের সেই ভ্রাতৃ-চেতনা যা প্রাচ্য-প্রতীচ্যকে এক দেহে পরিণত করে দিয়েছিল। দুই- (মজলিসে তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওয়ত, লাহোর, মুলতান কর্তৃক প্রকাশিত "হুজ্জতে শরীয়ত" দ্রষ্টব্য) মুসলমানদের অমর জেহাদী চেতনা যা বিশেষ করে খৃষ্টান ইউরোপের জন্য ক্রুসেড যুদ্ধের পর মরণঘাতী হয়েছে এবং সমকালীন যুগে তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সমূহের পথে পদে পদে বাধা হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছিল। আর এই জেহাদী উদ্দীপনাই মুসলমানদের জাতীয় স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য যেন দুর্গের ভূমিকা পালন করছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্য এ ব্যাপারে অবচেতন ছিল না। সুতরাং তারা নিজেদের ইবলীসী রাজনীতি

Divide and Rule-এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ভৌগলিক ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিতে চাইল। অপর দিকে মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে উপমহাদেশে নিতান্ত চাতুর্যের সাথে বিতর্ক-বাহাসের মাধ্যমে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় ফাঁটল ও দুদোল্যমানতা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। একই সঙ্গে ইংরেজদের উপর শহীদ টিপু সুলতান, শহীদ সৈয়দ আহমদ শাহ্, শহীদ শাহ ইসমাঈল এবং তাঁদের পরে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদ বাহিনীর জেহাদী তৎপরতা ও ন্যায়পন্থী ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক ভারতকে 'দারুল হরব' সাব্যস্ত করে জেহাদের ফতোয়া দান এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার জেহাদ শুধুমাত্র ভারতেই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে মুজাহেদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এ সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে, যতক্ষন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে জেহাদী প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ কখনো এবং কোথাও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে না। মুসলমানদের এই তৎপরতা শুধু ভারতেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে ইউরোপীয়দের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মির্জা সাহেবের উত্থানামল ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন মির্জা গোলাম আহমদের উত্থান ঘটে ছিল তখন অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী জেহাদের লীলা ভূমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে উপমহাদেশের অবস্থা তো ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি। একই সময়ে আমরা দেখতে পাই, উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তানে ১৮৭৮-৭৯ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনীকে আফগানদের জেহাদী উদ্দীপনার মুখে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১৮৭৬ থেকে শুরু করে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কে ইংরেজদের গোপন ষড়যন্ত্র ও গোপন আঁতাত লক্ষ্য করে জেহাদী চেতনা উদ্দীপিত হয়ে উঠে। পশ্চিমে ত্রিপলীতে শায়খ সান্নোসী, আলজেরিয়াতে আমীর আবদুল কাদের (১৮৮০) এবং রাশিয়ার অন্তর্গত দাগিস্তানে শায়খ মোহাম্মদ শামিল(১৮৮১) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে ফরাসী ও

রুশ সম্প্রসারণকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। ১৮৮১ সালে মিসরেও সেখানকার মুসলমানরা মরণপণ করে ইংরেজদের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

সুদানে ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলে ১৮৮১ সালে মাহদী, সুদানী ও তাঁর দরবেশ বাহিনী জেহাদের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ জেনারেল গর্ডন ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। একই সময় আরব উপসাগর, বাহরাইন ও এডেন প্রভৃতিতে বৃটিশ বাহিনীকে মুসলমানদের জেহাদ ও স্বদেশ মুক্তির জন্য মরণপণ আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়।

মুসলমানদের এসব সাফল্যের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখেছেন যে, মুসলমানদের মাঝে একটা ধর্মীয় চেতনাও কাজ করছিল যে, বিজয় অর্জন করলে গাজী বলে তো অভিহিত হবেই, তদুপরি রাষ্ট্রও পেল আর মরে গেলে হল শহীদ। সুতরাং মরা ও মারা দুটিই উত্তম; পশ্চাদপসরণের কোন মূল্যই নেই। - (বৃটিশ ভারতের ইতিহাস, ৩০২ পৃষ্ঠা, মুদ্রণ-১৯৩৫ সাল)

একজন সহচর নবীর প্রয়োজনীয়তা

"এরাইভেল অব বৃটিশ এমপায়ার ইন ইনডিয়া" নামক একটি বৃটিশ দস্তাবিজে উল্লেখ রয়েছে এবং বাহ্যিক অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ-এর সমর্থন করে যে "১৮৬৯ সালে ভারতীয় মুসলমানদেরকে হাত করার উপায় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য আদায়ের পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে বৃটিশ চিন্তাবিদ ও খৃষ্টান মিশনারী নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল উপমহাদেশে আগমন করে। ১৮৭০ সালে এই প্রতিনিধিদল দুটি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। তাতে বলা হয়েছিল, ভারতীয় মুসলমানদের বেশির ভাগ লোক তাদের আধ্যাত্মিক নেতা তথা পীরদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী। এসময় আমরা যদি এমন একটি লোক পাই যে এপোষ্টলিক প্রফেট APOSTOLIC PROPHET তথা সহচর নবুওতের দাবী করে তাহলে বহু লোক তার পক্ষে সমবেত হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন লোককে উৎসাহিত করা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে

হয়। এ বিষয়টি সমাধান করতে পারলে এমন লোকের নবুওতকে সরকারের পৃষ্টপোষকতায় একান্ত নিপুণতার সাথে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এখন যখন আমরা সমগ্র ভারত দখল করে রেখেছি, তখন আমাদেরকে ভারতীয় জনসাধারণ এবং মুসলমানদের আভ্যন্তরীন অস্থিরতা ও পারস্পরিক বিভেদকে উস্‌কে দেয়ার জন্য এমনি ধরনের কাজ করা উচিত। - The Arrival of British Empire in India.

সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনসমুহ ঃ মির্জা ও তার খান্দান

এই ছিল পরিস্থিতি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন - যা মির্যা গোলাম আহ্‌মদের নবুওত দাবী এবং জেহাদ বাতিল করার ঘোষণার মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। আল্লামা ইকবালের ভাষার অবস্থাটা ছিল এ রকম যে "কাদিয়ানী আন্দোলন ফিরিঙ্গির পক্ষে দৈব সনদ হয়ে দেখা দেয়"।
- (হরফে ইকবাল, পৃঃ ১৪৫)

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ অপেক্ষা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ইংরেজরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পেল না। কারণ মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সমর্থন ও মুসলিম বিদ্বেষ সে খান্দানী উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল। মির্জার পিতা গোলাম মুর্তজা নিজের ভাইসহ মহারাজ রনজিত সিংহের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল এবং শিখদের জন্য একান্ত প্রশংসনীয় সেবা দান করেছিল। প্রথমে শিখদের হয়ে ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যার প্রতিদানে রনজিত সিং তাদেরকে কিছু সম্পত্তি লাখেরাজ করে দেয়। মির্জা সাহেবের জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে যে ১৮৪২ সালে তার পিতাকে এক পদাদিক বাহিনীর অধিনায়ক করে পেশোয়ার পাঠানো হয় এবং হাজারার অপকর্মে অর্থাৎ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার মুজাহিদগণের জেহাদের বিরুদ্ধে সে বিরাট ভূমিকা পালন করে। (পরে আছে) সে তো ছিলই সরকারের নিমক হালাল (বশংবদ)। ১৮৪৮ সালের বিদ্রোহে তার সাথে তার ভাই গোলাম মহিউদ্দিন ও মির্জা গোলাম আহ্‌মদের চাচা চমৎকার সেবা প্রদর্শন করে। তারা শিখ বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। - (সীরাতে মসীহে মাওউদ - পৃষ্টা ৩-৪, সংকলক মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ, মুদ্রণ—আল্লাহ-বখশ ষ্টীম প্রেস, কাদিয়ান)

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার জেহাদে মির্যা গোলাম আহমদের পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা ইংরেজদের নিমকের হক্ব এভাবে আদায় করে যে, স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদকে স্বীকার করতে হয়, "আমি এমন এক পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট যেটি এই সরকারের (অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের) নিষ্ঠাবান শুভানুধ্যায়ী । আমার পিতা গোলাম মুর্তজা সরকারের নজরে একজন কৃতজ্ঞ ও খয়েরখা ব্যাক্তি ছিলেন যিনি রাজকীয় দরবারে কুর্সি পেতেন এবং যার উল্লেখ রয়েছে মিঃ গ্রিফেনের লেখা পাঞ্জাবের রইসদের ইতিহাসে। ১৮৫৭ সালে তিনি নিজের ক্ষমতারও উর্ধ্বে ইংরেজ সরকারের সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ সওয়ারসহ পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করে ঠিক অসহযোগের সময় ইংরেজ সরকারের সহায়তা করেন।" - (এশতেহার ওয়াজেবুল এজহার, আল বারিয়্যাহ পুস্তকের সংযোজন, পৃষ্ঠা ৩, কৃত মির্জা গোলাম আহমদ)

অতঃপর মির্জা গোলাম আহমদের পিতা ও ভাই গোলাম কাদেরকে ইংরেজ কর্মকর্তারা নিজেদের শুভেচ্ছার নিদর্শন এবং তাদের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব চিঠি দিয়েছিল, উল্লেখিত পুস্তকে-এর উল্লেখ আছে যে, মিঃ উইলসন তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজাকে লিখেছে, "আমি ভাল করেই জানি, আপনি ও আপনার পরিবার ইংরেজ সরকারের নিবেদিত-প্রাণ, বিশ্বস্ত ও নির্ভীক সেবক ছিলেন"। - (চিঠি, ১১ই জুন, ১৯৪৯ লাহোর চিঠি, পৃঃ ৩৫৩, ঐ পৃঃ ৪)

মিঃ রবার্ট কেস্ট, কমিশনার লাহোর বনাম মির্জা গোলাম মুর্তজা। তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ সালে লেখা চিঠিতে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজদের পক্ষে তার সেবার স্বীকৃতি এবং তার প্রতিদানে খিলাৎ প্রদানে ও সন্তোষ প্রকাশে ধন্য করার কথা অবহিত করা হয়।

এ হেন পারিবারিক আনুগত্য যার ধমণীতে সূচিত ছিল সে তার আনুগত্যের কথা এভাবে স্বীকার করেছে। সেতারায়ে কাইসারিয়া পুস্তকে মির্জা সাহেব লিখেছে ঃ "আমার দ্বারা ইংরেজ সরকারের সেবা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে তা ছিল এই যে, আমি পঞ্চাশ হাজারের মত পুস্তক ও বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এদেশ তথা অন্যান্য মুসলিম নগরীতে এমন সব নিবন্ধ প্রকাশ করেছি যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ সরকার

আমাদের মুসলমানদের একান্ত সুহৃদ সরকার। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য এ সরকারের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য পোষণ করা এবং মনে প্রাণে এই সরকারের শুকরিয়া আদায় ও দোয়া করা অপরিহার্য। এসব পুস্তক উর্দু, আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লিখে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেই। এমনকি ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনায় পর্যন্ত সানন্দে প্রচার করি এবং রোমের অধিকারভূক্ত কনস্টানটিনোপল, সিরিয়া, মিসর, কাবুল ও আফগানীস্তানের বিভিন্ন শহরেও যতটা সম্ভব প্রচার করে দেই। যার ফলে লাখো মানুষ জেহাদের সেই ঘৃণ্য ধারণা পরিহার করে, যা নির্বোধ মোল্লাদের শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এতে আমার মাধ্যমে এমন এক খেদমত সম্পাদিত হয় যে, আমি এ জন্য গর্ব করতে পারি যে, বৃটিশ ভারতের সমস্ত মুসলমানের মধ্য থেকে অন্য কোন মুসলমান এই দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেনি। - (সেতারায়ে কাইসারিয়া, পৃষ্ঠা ৩-৪, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)

শুধু তাই নয়, গোটা বৃটিশ ভারতে এমন অনন্য সেবা দানকারী ব্যক্তিটি নিজেরই ভাষায় ইংরেজ তোষণের ব্যাপারে এত কিছু লিখেছে যাতে পঞ্চাশটি আলমিরা পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। - (তিরিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা ১৫, মুদ্রণ ১৯০৪)

মির্জা সাহেব বৃটিশ সরকার সম্পর্কিত পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে লেখা তার এক চিঠিতে নিজের পরিবারকে পঞ্চাশ বছর যাবৎ বিশ্বস্ত বশংবদ বলে অভিহিত করে এবং নিজেকে ইংরেজের স্বরোপিত চারা বলে উল্লেখ করে। নিজের এহেন বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার বরাত দিয়ে তিনি নিজের দলের জন্য বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টি কামনা করে। - (তাবলীগে রেসালত, ৭ম খণ্ড-মির্জা কাদিয়ানীর বিজ্ঞাপন সংকলন, পৃঃ ১৯০)

ইসলামের অকাট্ট আকীদা জেহাদের খণ্ডন/বিলুপ্তি

এবংবিধ ইংরেজ তোষণের ফল ছিল এই যে, মির্জা কাদিয়ানী প্রকাশ্যভাবে জেহাদ বাতিল বলে ঘোষণা করে দেয়। অথচ জেহাদ হল ইসলামের একটি পবিত্র ফরয। ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব এরই উপর নির্ভরশীল। ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত একে ইসলাম ও ইসলামী দুনিয়ার হেফাজত এবং আল্লাহ্র কালামকে সমুন্নত রাখার

উপায় সাব্যস্ত করেছে। কোরআনে করীমের অসংখ্য আয়াত, হুজুরে আকরাম (সঃ)-এর অসংখ্য অগণিত হাদীস এবং স্বয়ং মহানবী (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর কর্ম জীবন, তাঁদের জেহাদী উদ্দীপনা ও শাহাদাত বরণ প্রভৃতি সব কিছুই জেহাদকে সর্বযুগে মুসলমানদের জন্য একটি উদ্দীপনাময় এবাদতে পরিণত করে এসেছে। মহানবী (সঃ)-এর প্রকৃষ্ট বাণী - জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না কুফর ও শিরকের ফেৎনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন হয়ে যায় আল্লাহ্‌র।

মহানবী (সঃ) অন্য এক হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত জেহাদের স্থায়িত্বের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন। "মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, এ দ্বীন চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একটি জামাত কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ করতে থাকবে। - (মুসলিম ও মেশকাত, পৃঃ ৩৩০)

কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ ইংরেজদের প্রতিরক্ষা কল্পে এবং আলমে ইসলামকে তাদের গোলামীর শেকলে বেঁধে রাখার জন্য এবং কাফের সরকারের সহায়তায় মুসলমানদেরকে নিজের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে জেহাদের আকীদার বিরোধিতা করে। শুধু উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের যে কোন স্থানে সে প্রকাশ্যে ও গোপনে তৎপরতা চালানোর সুযোগ পেয়েছে, সেখানেই জেহাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন প্রচারণা চালিয়েছে। প্রশ্ন উঠে যে, জেহাদকে হারাম করার কি প্রয়োজন মির্জা সাহেবের ছিল? এর উত্তর ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর নামে কাদিয়ানী দলের নিম্ন লিখিত ও ১৯২১ সালের ৪ঠা জুলাই কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'আল ফজলে' মুদ্রিত এড্রেস থেকে পরিস্কারভাবে পেতে পারি। তাতে বলা হয়েছে, "যখন আপনি (মির্জা গোলাম আহমদ) দাবী করেন, তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জেহাদের উদ্দীপনায় গুঞ্জরিত হচ্ছিল। ইসলামী দুনিয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, তা পেট্রোলের পিপার মত জ্বলে উঠার জন্য একটি মাত্র দিয়াশলাইর অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু (কাদিয়ানী মতবাদের) প্রতিষ্ঠাতা এই ধারণার অসারতা, ইসলাম ও শান্তি বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে এমন জোরদার

আন্দোলন শুরু করে যে, কয়েক বছর যেতে না যেতেই গভর্ণমেন্টকে মনে মনে স্বীকার করে নিতেই হয় যে, যে ধারাকে সরকার শান্তির জন্য আশংকার কারণ বলে ধারণা করছিল, তার জন্য অসাধারণ সহায়তার কারণ হয়েছে।

জেহাদ রহিত হওয়া এবং দুনিয়া থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য জেহাদের হুকুম উঠে যাবার উপর মির্জা সাহেব কি পরিমাণ জোর দিয়েছে তা তার নিম্নলিখিত ভাষ্য থেকে অনুমান করা যায়। সে তার 'আরবাঈন' গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ১৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখেছে, "জেহাদ অর্থাৎ, ধর্মীয় লড়াইর কঠোরতাকে আল্লাহ্ তাআলা ক্রমান্বয়ে শিথিল করেছেন"। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় এমন কঠোরতা ছিল যে, ঈমান এনেও এর থেকে বাঁচার কোন উপায় ছিল না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও হত্যা করা হত। তারপর আমাদের নবী (সঃ)-এর সময়ে শিশু, বুড়ো ও নারীদেরকে হত্যা করা হারাম করা হয়। এছাড়া কোন কোন জাতির জন্য ঈমান আনার পরিবর্তে জিযিয়া কর পরিশোধের মাধ্যমে ধরপাকড় থেকে অব্যাহতি লাভের বিষয়টি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর (মির্জা সাহেবের ধারণা অনুযায়ী) মসীহে মওউদের সময় জেহাদের হুকুম সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেয়া হয়"। - (কাদিয়ানী ধর্ম, পৃঃ ২২৫, অধ্যায় ৪, ধারা ৩৭)

খুতবায়ে এলহামিয়া-এর উপসংহারে সে লিখেছে, "আজ থেকে যে মানবীয় জেহাদ তলোয়ার দ্বারা করা হত, খোদার হুকুমে তা বন্ধ করা হল। আজকের পর যে লোক কাফেরের উপর তলোয়ার ধরবে এবং নিজের নাম গাজী রাখবে, সে সেই রসূলে করীম (সঃ)-এর নাফরমানী করবে যিনি আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে বলে দিয়েছেন যে মসীহে মাওউদের আগমনে সমস্ত তলোয়ার-যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আমার আত্ম-প্রকাশের পর তলোয়ারের কোন জেহাদ নয়; আমাদের পক্ষ থেকে সন্ধি ও নিরাপত্তার শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দেয়া হল।

তুহফায়ে গুলরোভিয়ার উপসংহারের ৩৯ পৃষ্ঠায় মির্জা সাহেবের এই ঘোষণা সন্নিবেশিত রয়েছে যে, "বন্ধুরা এখন থেকে জেহাদের ধারণা পরিহার কর, এখন দ্বীনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। দ্বীনের ইমাম

মসীহের আবির্ভাব হয়ে গেছে, সমস্ত ধর্মীয় যুদ্ধ এখন থেকে শেষ হয়ে গেল। আকাশ থেকে এখন শুধু খোদার নূর নেমে আসছে, জেহাদের ফতোয়া এখন থেকে সম্পূর্ণ বেকার। এখন থেকে যে জেহাদ করবে সে খোদার দুশমন। জেহাদের বিশ্বাস যে পোষণ করবে সে নবীতে অবিশ্বাসী। - (তবলীগে রেসালত, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

এ ছাড়াও ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর ১২ নং সংখ্যার ২৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এক আবেদনে মির্জা সাহেব লিখেছে, "এটাই সেই ফের্কা (অর্থাৎ মির্জা সাহেবের নিজের ফের্কা) যেটি মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা থেকে জেহাদের অর্থহীন প্রথা উঠিয়ে দিতে দিবারাত্রি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

"ইংরেজ সরকার ও জেহাদ" শীর্ষক পুস্তিকার ১৪ পৃষ্ঠায় মির্জা সাহেব লিখেছে ঃ "লক্ষ্য কর, আমি (মির্জা গোলাম আহমদ) একটি হুকুম নিয়ে তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছি। তাহল এই যে, এখন থেকে তলোয়ারের জেহাদ শেষ"।

এসব বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদের নিকট জেহাদের বিরোধিতা জনিত হুকুম বিশেষ কোন অবস্থায় অপারগতার তাগাদা নয়, বরং এখন থেকে এটিকে চিরকালের জন্য রহিত, হারাম ও সমাপ্ত বলে মনে করতে হবে। কোন শর্তাশর্ত পূরণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না কিংবা গোপনভাবেও এর প্রশিক্ষণ জায়েয নয়।

'তিরইয়াকুল কুলুব' নামক পুস্তকের ৩২২ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে ঃ এই কাদিয়ানী ফের্কায় অস্ত্রের জেহাদ মোটেই নেই, এর জন্য অপেক্ষাও নেই। এই মোবারক ফের্কা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন অবস্থাতেই কখনো জেহাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণকে জায়েজ মনে করে না। এদল এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে হারাম মনে করে যে, দ্বীন প্রচারের জন্য যুদ্ধ করতে হবে"। এখন থেকে ভূমির জেহাদ বন্ধ করে দেয়া হল এবং যাবতীয় লড়াই নিষিদ্ধ করা হল। সুতরাং আজ থেকে দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করা হারাম করা হল। – (উপসংহার খুতবায়ে এলহামিয়া, পৃষ্ঠা ১৭)

কাদিয়ানীদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য

জেহাদকে বাতিল করার এসব পরিস্কার বক্তব্যের পরেও কাদিয়ানীদের দুটি দলই ইদানিং বলছে যে, যেহেতু '৫৭ সালের পর ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং জেহাদের কোন কারণ অবশিষ্ট ছিল না, তাই সাময়িকভাবে জেহাদকে স্থগিত করা হয়েছিল। তাহলে আসুন আমরা এই ব্যাখ্যা এবং মির্জার পক্ষে ভ্রান্ত ওকালতির পর্যালোচনা করে দেখি ঃ

(১) উল্লেখিত বক্তব্যগুলোর দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি যথার্থই অনুমান করতে পরেন যে, মির্জা সাহেবের কাছে জেহাদের নিষেধাজ্ঞা সাময়িক হুকুম নয় কিংবা সাময়িকভাবে তা মওকুফ করা হয়নি, বরং সে জেহাদের সমাপ্তি, তার অপেক্ষা করাও বারণ এবং প্রকাশ্য ও গোপন ধরনের শিক্ষাকেও নাজায়েজ এবং চিরকালের জন্য দ্বীনের যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ও রহিত সাব্যস্ত করে।

(২) মির্জা সাহেব যদি '৫৭ সালে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাভের দরুন বাধ্য হয়ে জেহাদের বিরোধিতা করে থাকেন, তাহলে '৫৭ সালে এবং তার পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সাথে সাথে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাহঃ)-এর মুজাহেদীনের জেহাদে মির্জা সাহেব নিজে এবং তার গোটা পরিবার শিখ ও ইংরেজদের সম্প্রসারণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে জান-মাল কুরবান করতে থাকেন কেন? যা ইংরেজ কর্মকর্তাদেরকে লেখা চিঠি-পত্রে মির্জা সাহেব একান্ত গর্বের সাথে স্বীকার করেছেন। তিনি এসব প্রচেষ্টাকে শুধু সমর্থনই করেননি, বরং উচ্ছসিত প্রশংসাও করেছেন। তার খান্দানের মুরুব্বীরা শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জেহাদের সময় শিখদের সমর্থন করে। মির্জা সাহেবের পিতা ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সরকারকে ৫০ জন ঘোড় সওয়ার ও ঘোড়া সাহায্য হিসাবে সরবরাহ করে। মির্জা গোলাম আহমদ ১৮৫৭ সালে আজাদী-জেহাদের জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদগণকে মূর্খ ও দুরাচার বলে অভিহিত করে। - (বারাহীনে আহমদিয়া, পৃষ্ঠা ১০০০)।

ভারতে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের নির্মম অত্যাচারে যখন সমগ্র ভারতের প্রতিটি অনু-পরমানু অশ্রুসিক্ত, মুসলমানদের গৌরব যখন

ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, হাজার বছরের গৌরব যখন ক্রমান্বয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিল, ভারতের আলেম–ওলামা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে যখন শূকরের চামড়ায় সেলাই করে এবং জীবন্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল্লীর বাজারগুলোতে ফাঁসিতে লটকে দেয়া হচ্ছিল এবং ইংরেজের নিকৃষ্টতম প্রতিনিধি জেনারেল নিকলসন যখন এডওয়ার্ডের কাছ থেকে এমন আইনগত অধিকার কামনা করছিল যাতে মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবিতাবস্থায় তুলে নেয়া যায় এবং তাদেরকে যেন জীবিত জ্বালিয়ে দেয়া যায়, তখন সেই হত্যাকারী ও ধিকৃত নিকলসন মির্জা গোলাম আহমদ ও তার খান্দানকে ভারতে নিজেদের স্বার্থের সহায়ক সাব্যস্ত করছিল। জেনারেল নিকলসন মির্জা গোলাম কাদেরকে সনদপত্র দান করে। তাতে লেখা হয়, ১৮৫৭ সালে কাদিয়ানী পরিবার, গুরুদাসপুর জেলার অন্যান্য সমস্ত পরিবার অপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ বা নিমকহালাল থেকেছে। - (সিরাতে মসীহে মাওউদ, পৃঃ ১৪, রচনা মির্জা বশীর মাহমুদ, মুদ্রণ কাদিয়ান)

বস্তুতঃ সেই মির্জা সাহেব যে তখনো নিজের শরীয়ত বাহক নবী হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি। সে নিজে বারাহীনে আহমদিয়া গ্রন্থে জেহাদের অপরিহার্যতা ও অব্যাহত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলো। নবুওয়ত দাবীর পর একটি অকাট্য হুকুমকে হারাম সাব্যস্ত করতে গিয়ে সে কার্যতঃ কোরআন করীমের জেহাদ, এক পঞ্চমাংশ ও ফাই বা গণীমত সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে রহিত সাব্যস্ত করে। শরীয়তের বাহক নবী হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে কিন্তু যে যুগে সে জেহাদকে ফরজ বলে, তখন কি সে নিজেও এতে কার্যত আমল করছিলো? এর উত্তর ইংরেজ লেফট্যানেন্টকে লেখা তারই চিঠি থেকে জানা যায় যে, সে আবেদনে নিজের আমলস্বরূপ পরিচ্ছন্ন ভাষায় সে লিখেছে "আমি প্রাথমিক জীবন থেকে এ পর্যন্ত (১৮৫৭-এর বহু পূর্ববর্তী সময়) প্রায় ৬০ বছর বয়সে এসে পৌঁছেছি, নিজের কথা ও লেখনীর মাধ্যমে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থেকেছি যাতে মুসলমানদের মনকে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা, কল্যাণাকাঙ্খা ও সহানুভূতির দিকে ফিরিয়ে দেয়া যায় এবং সেই নির্বোধ লোকদের জেহাদের ভ্রান্ত-

ধারণা প্রভৃতির অবসান করতে পারি, যারা তাদের আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা ও নিঃস্বার্থ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দান করে"। - (তবলীগে রেসালত, ৭ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা, মুদ্রণ কাদিয়ান প্রেস, কাদিয়ান, আগষ্ট ২২)

(৩) তৃতীয়তঃ ধরেও নেয়া যাক যে, মির্জা সাহেব উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের দরুন কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতার কারণে এহেন কঠোরতার সাথে জেহাদের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু বাস্তবে যদি তাই হত, তাহলে জেহাদের প্রতি মির্জার বাধাদান এবং ইংরেজদের আনুগত্য শুধু বৃটিশ ভারত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এখানে তো এমন প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে যে, মির্জার জেহাদ বিরোধী আন্দোলন ও প্রচারণার আমল প্রেরণা শুধু ভারতেই নয়, বরং সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তথা সারা দুনিয়ার মুসলমানের অন্তর থেকেই জেহাদের উদ্দীপনাকে উৎখাত করা এবং ইংরেজদের জন্য কিংবা যে কোন কাফের সাম্রাজ্যের জন্য পথ পরিস্কার করা, যাতে করে একটি নতুন উম্মাহ্ এবং একটি নতুন নবীর নামে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ ও উম্মতে মুহাম্মদীর সমগ্র ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়া যায়। আর এভাবে ইসলামী দুনিয়াকে ইংরেজ কিংবা তাদের সহযোগীদের পদলেহীতে পরিণত করা যায়। সে কারণেই মির্জা সাহেব জেহাদ বিরোধী প্রচারণা শুধু বৃটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি এবং শুধু উর্দু লিটারেচারের উপরই নির্ভর করেনি এবং ফার্সী, আরবী, ইংরেজীতে পুস্তকাদি রচনা করে রোম, সিরিয়া, মিসর, ইরান, আফগানিস্তান, বোখারা এমন কি মক্কা-মদীনায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে থাকে যাতে বোখারায়ও যদি রাশিয়ান জার বাহিনী আসে, তাহলে কোন মুসলিম হাত যেন তাদের প্রতিরোধে উত্থিত না হয়। ফ্রান্স, তিউনিশিয়া, আল-জাজায়ের ও মরক্কোতে যদি সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়, তবু যেন মুসলমানরা জেহাদকে হারাম মনে করে। আরব ও মিসর যেন মনে প্রাণে ইংরেজের অনুগত হয়ে যায়। তুরস্ক ও আফগানিস্তানের ঈমানী চেতনা যেন চিরকালের জন্য জেহাদী উদ্দীপনা বিবর্জিত হয়ে শিথিল হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে মির্জা সাহেবের স্বীকারোক্তি লক্ষ্য করুন। সে লিখেছে, "আমি বৃটিশ ভারতের মুসলমানদেরকেই শুধু ইংরেজ গভর্ণমেন্টের

আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার কাজটিই সম্পাদন করিনি, বরং আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের লোকদেরকে অনুগত বানিয়ে দিয়েছি"। - (তবলীগে রেসালত, ৭ম খণ্ড, লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নামে, পৃষ্ঠা ১০)

একই গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে, 'সে সব নির্বোধ মুসলমানের মনের গোপন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে মনে-প্রাণে ইংরেজ সরকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হাজার হাজার বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে এবং এমনি ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা আরব ও সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়েছে"।

"অতঃপর আমি আরবী ও ফার্সীতে কিছু পুস্তিকা প্রণয়ন করে সিরিয়া, রোম, মিসর ও বোখারা প্রভৃতির আশে পাশে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে সব পুস্তকে এই সরকারের গুণকীর্তন সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এই মহানুভব সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ সম্পূর্ণতঃ হারাম। কোন কোন আরব ভদ্র লোকের হাতে এই পুস্তক তুলে দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া ও রোমের বিভিন্ন নগরীতে পাঠানো হয়েছে। অনেককে পাঠানো হয়েছে মক্কা ও মদীনায় এবং অনেককে পারস্যে। তেমনিভাবে মিসরেও পুস্তক পাঠানো হয়েছে। আর এই ব্যাপারে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে, যা একান্ত নেক নিয়তে করা হয়েছে।" - (তবলীগে রেসালত, ৩য় খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

বস্তুতঃ এসব কিছুই মির্জা সাহেব এ কারণে করেছে যে, "যাতে কিছু লোকের মন সরল পথে এসে যায় এবং সেসব মন এই সরকারের শুকরিয়া আদায় করে নেয়, এর আনুগত্যের জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করে নেয় এবং দুষ্কৃতকারীদের বিপদ প্রশমিত হতে পারে।" - (নূরুল হক, ১ম খণ্ড, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

তবলীগে রেসালত গ্রন্থের ৩য় খন্ডে ১৭ পৃষ্ঠায় মির্জা সাহেবের ভাষায় এই সমুদয় প্রয়াস-প্রচেষ্টার নির্যাস হল এই যে, "আমার মুরীদ-অনুসারীর সংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে, ততই জেহাদে বিশ্বাসীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। কারণ, আমাকে মসীহ ও মাহদী মেনে নেয়াটাই জেহাদকে অস্বীকার করা।"

"ইংরেজ সরকার ও জেহাদ" নামক পুস্তকে সে লিখেছে, "যে ব্যক্তি আমার বাইয়াত করবে এবং আমাকে মসীহ মওউদ স্বীকার করে, তাকে ঠিক সেদিন থেকেই এ বিশ্বাসও পোষণ করতে হয় যে, এ যুগে জেহাদ সম্পূর্ণভাবে হারাম। কারণ, মসীহ এসে গেছে। বিশেষ করে আমার শিক্ষা অনুযায়ী তাকে এই ইংরেজ সরকারের সত্যনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী হতেই হয়।"

কাদিয়ানীদের শিক্ষা প্রচারণা এবং যাবতীয় প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য কি ছিল তার তাৎপর্য কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতার উপরোল্লিখিত ভাষ্য-বিবরণ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায়। তার পরেও যদি কোন ব্যাখ্যার আড়ালে সেসব বাস্তবতাকে লুকানোর চেষ্টা করা হয়, তবে চোখ খুলে দেয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ও স্বীকৃতিসমূহ যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।

"যে মির্জা সাহেব ভারতেই শুধু নয়, বরং স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রসমূহেও জেহাদের সমর্থক ছিলেন না। আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্‌র শাসনামলে নেয়ামতুল্লা খান কাদিয়ানী ও আব্দুল লতীফ কাদিয়ানীকে আফগানিস্তানের আলেমদের সর্বসম্মত ফতোয়ার প্রেক্ষাপটে মুর্তাদ সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সেই মৃত্যুদন্ডের কারণ এই ছিল যে, এরা ধর্মপ্রচারক মুবাল্লেগের অন্তরালে জেহাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিচ্ছিল। আর সেটা ছিল শুধু এজন্য যাতে ইংরেজদের ক্ষমতা বিস্তার লাভ করতে পারে। অথচ, আফগানিস্তানে ইসলামী জেহাদের যাবতীয় শর্ত-শরায়েত পুরেপুরিই বর্তমান ছিল। এ ব্যাপারে মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের নিম্নলিখিত জুমা'র খুতবা, 'আল-ফজল', ৬ আগষ্ট, ১৯৩৫ লক্ষ্য করুন -- "সুদীর্ঘ কাল পর একটি লাইব্রেরীতে একটি পুস্তক পাওয়া গেল যা ছাপার পর দুষ্প্রাপ্যও হয়ে গিয়েছিল। এ পুস্তকটির প্রণেতা ছিল জনৈক ইটালীয় প্রকৌশলী। তিনি আফগানিস্তানের কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, সাহেবজাদা আব্দুল লতীফ (কাদিয়ানী)কে এ কারণে হত্যা করা হয় যে, তিনি জেহাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দান করতেন। তাতে আফগান সরকার ভীত হয়ে পড়েছিল যে, এতে করে আফগান জনগণের

স্বাধীনতার চেতনা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাদের উপর ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা ছেয়ে যাবে।"

এমন বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতকারীর রেওয়ায়েত দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সাহেবজাদা আব্দুল লতীফ যদি নীরব বসে থাকতেন এবং জেহাদের বিরুদ্ধে কোন কথাই না বলতেন, তাহলে আফগান সরকার তাকে 'শহীদ' করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করত না। - আল ফজল পত্রিকা, আমানের উদ্ধৃতিক্রমে ১৯২৫, ৩রা মার্চ সংখ্যায় আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বরাতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছে, "কাবুলের দুই ব্যাক্তি—মোল্লা আবদুল হালীম ও মোল্লা নূর আলী দোকানদার কাদিয়ানী আকীদার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং জনগণকে এ আকীদায় উদ্বুদ্ধ করে পথভ্রষ্ট করছিল। তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন থেকে আরেকটি দাবী পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিল। আর আফগানিস্তানের কল্যাণের বিরুদ্ধে বৈদেশিক লোকদের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি তাদের হাতে পাওয়া গেল। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা আফগানিস্তানের শত্রুদের হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল" কাদিয়ানের খলিফা তার ১লা নভেম্বর ১৯৩৪, 'আল-ফজলে' প্রকাশিত এক জুমার খুতবায় স্বীকার করেছে যে, তারা শুধু মুসলিম দেশসমূহই নয়, বরং অমুসলিম দেশ ও জাতিগুলোও কাদিয়ানীদের ক্রীড়নক মনে করত। পৃথিবী আমাদেরকে ইংরেজদের এজেন্ট মনে করে। সুতরাং আহমদিয়া প্রাসাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনৈক জার্মান ইংরেজ অংশ গ্রহণ করলে সরকার তার কাছে উত্তর চাইল যে, তুমি কেন এমন একটি দলের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছ যারা ইংরেজদের এজেন্ট?

ইসলামী জেহাদ বাতিল কিন্তু কাদিয়ানী জেহাদ বৈধ

এ বিষয়টি বিস্ময় ও আশ্চর্যের কারণ যে, একদিকে তো কাদিয়ানীরা জেহাদকে এমন কঠিনভাবে বাতিল ও হারাম সাব্যস্ত করল, কিন্তু অপরদিকে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের জন্য শুধু বৈধই নয়, বরং অপরিহার্যও ছিল। মনে হয় জেহাদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় চেষ্টা চরিত্রই শুধু ইংরেজ ও কাফেরদের পক্ষে মুসলমানদেরকে জেহাদ থেকে বাধা দেবার জন্য

ছিল। তারা না নিজেদের মান-সম্ভ্রম এবং দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবে, না নিজেদের দ্বীন-ঈমান এবং ইসলামী প্রতীক, মূল্যবোধ ও মসজিদসমূহের জন্য জেহাদের পতাকা উত্তোলন করবে। কিন্তু ইংরেজদের শাসন ক্ষমতার প্রসার ও প্রতিরক্ষার জন্য তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইসলামী নগরীতে বোমা হামলা চালানো ছিল একটি পবিত্র ফরজ। মির্জা মাহমুদ বলে "সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেন্ট বাহিনীতে যোগ দিয়ে সেই উৎপীড়নমূলক আক্রমণ প্রতিহত করা সরকারের সাহায্য করা আহমদিয়া সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানীদের ধর্মীয় ফরজ"। - (খুতবা মির্জা মাহমুদ আহমদ, আল-ফজল ২রা মে, ১৯১৯)

কাদিয়ানী জামাত লর্ড রিডিং-এর প্রতি এক আবেদনেও নিজেদের সামরিক সেবার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে, "কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের দল অন্যান্য যাবতীয় সাহায্য-সহায়তা ছাড়াও একটি ডবল কোম্পানী ও এক হাজার লোকের নাম ভর্তির জন্য পেশ করেছে। তাছাড়া আমাদের বর্তমান ইমামের কনিষ্ট ভ্রাতা ছ' মাস যাবৎ ট্রান্সপোর্ট কোরে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেছেন।" - (আল-ফজল ৪ঠা জুলাই, ১৯৩১)

অন্য আরেক জুমার খুতবায় মির্জা মাহমুদ আহমদ বলেছে, "সম্ভবত কাবুলের সাথে কোন এক সময় যুদ্ধ করতেই হত। তারপর বলে, জানিনা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দুনিয়ার চার্জ কবে আমাদের হাতে অর্পণ করা হবে। আমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে পৃথিবীকে সামাল দেয়ার জন্য তৈরী থাকা দরকার।" - (আল-ফজল ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২রা মার্চ, ১৯২২)

শান্তি-সৌহার্দ্য এবং জেহাদের ইসলামী মতবাদকে মোল্লাদের বর্বরোচিত ও মূর্খজনোচিত ধারণা সাব্যস্তকারী কাদিয়ানীদের আসল চেহারাটা কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ আহমদের বক্তব্য থেকে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বলেছে, "এখন যুগ বদলে গেছে। লক্ষ্য কর, পূর্বে যে মসীহ (হযরত ঈসা আঃ)-এসেছিলেন, তাঁকে শত্রুরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিল, কিন্তু এখন মসীহ এসেছেন নিজের শত্রুদের হত্যা করে শেষ করার জন্য"। - (এরফানে এলাহী, ৯৪ পৃষ্ঠা)

"পূর্বেকার ঈসাকে তো ইহুদীরা শূলিতে টাঙ্গিয়ে দেয় কিন্তু এখন (মির্জা গোলাম আহমদ) এ যুগের ইহুদী স্বভাবের লোকদেরকে শূলিতে লটকাবে"। - (তকদীরে এলাহী, ২৯ পৃষ্ঠা, রচনা মির্জা মাহমুদ আহমদ)

এসব উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল যে, ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসকে বাতিল সাব্যস্ত করা এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানোর পর নিজের এবং সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জেহাদ ও লড়াইকে জায়েজ সাব্যস্ত করার প্রয়াসে এমন কিছু নাই যা তারা করেনি! এসব বিষয়কে সামনে রেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, কাদিয়ানীদের কাছে কাফেরদের ও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের জন্য চিরকালের জন্য হারাম ছিল, কিন্তু খৃষ্টবাদের পতাকা তলে কিংবা কোন কাফের সরকারের স্বার্থে কিংবা কাদিয়ানীদের পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সবই জায়েজ।

মির্জা গোলাম আহমদ ও কাদিয়ানীদের তবলীগী তৎপরতার তাৎপর্য

আফগানিস্তানের এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে তাবলীগের নামে কাদিয়ানীদের ঔপনিবেশিক তৎপরতায় তাদের ইসলামের তাবলীগ সংক্রান্ত খেদমতের মুখোশ খুলে যায়। কিন্তু বহুলোক মির্জা সাহেবের খেদমত সম্পর্কে ইসলামকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তার বাহাস-বিতর্কের কথা বলেন। বলা হয়, তিনি ইসলামকে প্রতিরোধ করার জন্য বড় বড় যুদ্ধ জয় করেন এবং এখনো কাদিয়ানীরা দুনিয়ায় ইসলামের তাবলীগ করে যাচ্ছে। আর সে কারণেই তাদের সাথে অমুসলিমদের মত আচরণ করা উচিত নয়। সুতরাং আমরা এই বিভ্রান্তিকে, যাতে সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকেরা লিপ্ত রয়েছেন মির্জা সাহেবেরই দু'একটি বিবৃতি-বক্তব্যের মাধ্যমে অবসান করতে চাই। এসব বক্তব্য কাদিয়ানীবাদের প্রবর্তক সাহেবের তবলীগ মিশন ও উদ্দেশ্যগুলোকে নিজেই চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছে। সে খৃষ্টান মিশনারীদের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী লেখা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের দরুন যখন মুসলমানদের মাঝে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা অনুভব করে, তখন এই ব্যাপক উত্তেজনা প্রশমনের উপায়

হিসাবে খৃষ্টানদেরকে কিছুটা কঠিন জবাব দেয় এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর ধরনের পুস্তকাদি রচনা করে।

১৯০২ সালের ২৮শে অক্টোবর, কাদিয়ানের জিয়াউল ইসলাম মুদ্রিত তিরইয়াকুল কুলুব গ্রন্থের ৩য়, উপসংহারে মহান সরকারের প্রতি এক বিনীত নিবেদনে মির্জা গোলাম আহমদ তার বিশ বছরের সমস্ত জ্ঞানগত ও রচনাগত প্রচেষ্টার নির্যাস মুসলমানদের অন্তর থেকে জেহাদ এবং খুনী মাহদী প্রভৃতি সংক্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অবসান এবং ইংরেজের আনুগত্য সৃষ্টির পর লিখেছেঃ "এখন আমি আমার কৃপাপরায়ণ সরকারের খেদমতে সাহসের সাথে বলতে পারি যে, এটি আমার সেই বিশ বছরের সেবা, যার কোন দৃষ্টান্ত বৃটিশ ভারতে একটি মুসলমান পরিবারও পেশ করতে পারে না। তাছাড়া একথাও স্পষ্ট যে, বিশ বছরের এই সুদীর্ঘ সময় যাবৎ ক্রমাগতভাবে উল্লেখিত শিক্ষার উপর জোর দিতে থাকা কোন মোনাফেক ও স্বার্থপর লোকের কাজ নয়। বরং এটা এমন লোকের কাজ যার অন্তরে এই সরকারের প্রতি সত্যিকার শুভেচ্ছা রয়েছে। অবশ্য আমি একথা স্বীকার করি যে, আমি নেক নিয়তের সাথে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে বাহাস-বিতর্কও করে থাকি যে, যখন কোন কোন পাদ্রী ও খৃষ্টান মিশনারীর লেখা অত্যন্ত কঠোর হয়ে যায় এবং ভারসাম্য অতিক্রম করে ফেলে - বিশেষ করে লুধিয়ানা প্রকাশিত একটি খৃষ্টান সাময়িকীতে মুদ্রিত অত্যন্ত নোংরা রচনা প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রচারকরা আমাদের নবী (সঃ)-এর সম্পর্কে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করে যে, এ লোকটি ডাকাত, চোর, ব্যভিচারী ছিল এবং শত শত সাময়িকীতে যখন একথা ছাপা হল যে, এ লোকটি নিজের কন্যার প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যে আশেক ছিল এবং সর্বোপরি সে মির্থ্যাবাদী ছিল এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবীই তার কাজ ছিল। এ ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করে আমার মনে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, জ্যোশওয়ালা জাতি মুসলমানদের অন্তরে নাজানি এসব বাক্যের দরুন কোন কঠিন উত্তেজনাকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তখন আমি সেই উত্তেজনাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে নিজের বিশুদ্ধ ও পবিত্র নিয়তে এটাই সংগত বিবেচনা করেছি যে, এই

ব্যাপক উত্তেজনাকে চাপা দেয়ার জন্য এসব রচনার কিছুটা কঠোর ভাষায় জবাব দেয়াটাই সংগত পন্থা। যাতে করে ক্ষণরাগী মানুষগুলোর উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায় এবং দেশে কোন রকম অশান্তি দেখা না দেয়। তখন আমি সে সব পুস্তকের বিরুদ্ধে, যেগুলোতে চরম কঠোরতার সাথে অকথ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, এমন কয়েকটি পুস্তক রচনা করি যাতে তুলনামূলক কঠোরতা ছিল। কারণ, আমার বিবেক দৃঢ়তার সাথে আমাকে এই ফতোয়া দিয়েছে যে, ইসলামে বহু বর্বর উত্তেজনাপূর্ণ লোক রয়েছে। তাদের রোষানলকে প্রশমিত করার জন্য এ পন্থা যথেষ্ট কার্যকর হবে। - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৮-৩০৯)

সে কয়েক ছত্র পরে লিখেছে ঃ "কাজেই আমার দ্বারা পাদ্রীদের মোকাবেলায় যাই কিছু হয়ে থাকুক তাহল এই যে, কূটবুদ্ধির মাধ্যমে কিছু বর্বর মুসলমানকে খুশি করা হয়েছে। আর আমি দাবী করে বলছি যে, আমি সমস্ত মুসলমান অপেক্ষা শুভানুধ্যায়ী হলাম ইংরেজ সরকারের। কারণ, তিনটি বিষয় আমাকে প্রথম পর্যায়ের শুভানুধ্যায়ী বানিয়ে দিয়েছে। (১) প্রথমতঃ মরহুম পিতার প্রভাব, (২) দ্বিতীয়তঃ মহান সরকারের দয়া ও শুভেচ্ছা এবং (৩) তৃতীয়তঃ খোদা তাআলার এলহাম তথা দৈববাণী" - (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯-৩১০)।

মির্জা সাহেবের এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ রচনা ও বাহাস-বিতর্কের আরেকটি বড় কারণ ছিল এই যে, প্রথমতঃ তিনি এভাবে সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস ও লক্ষ্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং সাথে সাথে ইসলামের প্রতিরোধে সেসব বিষয়ের উপর বাহাস-বিতর্কে বাজার মাত করেছে। তার ভেতর দিয়েই পরবর্তীতে নবুওয়ত দাবীর পরিবেশ তৈরী করেছে। ইসলামের তবলীগ বা প্রচারের নামে বিষ মিশ্রিত চিনির মতই ছিল আর্য সমাজের সাথে নবীর মো'জেজা প্রমাণ সংক্রান্ত মির্জা সাহেবের বাহাস। এতে মো'জেজা প্রমাণের অন্তরালে সে একথাও প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছিল যে, প্রত্যেক যুগেই মো'জেজার অবতরণ কাম্য। বলা বাহুল্য মো'জেজা মূলতঃ নবুওয়ত ও রেসালতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুতঃ যখন হুজুর নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত নবুওয়ত সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ

মো'জেজা ও ওহীসমূহের প্রত্যেক যুগে অব্যাহত বা কাম্য হওয়াটা বাহাস-বিতর্কের অন্তরালে নিজের মিথ্যা নবুওয়তের ভূমিকা বা মুখবন্ধ ছাড়া আর কি ছিল?

রচনা সম্ভার

আসলে আমরা যখন মির্জা সাহেবের পৌনে এক শতাব্দীব্যাপী জ্ঞান চর্চা ও লেখক জীবনের পর্যালোচনা করি, তখন তার সমস্ত বয়ান-বিবৃতি ও রচনা তৎপরতার উদ্দেশ্য এই পাই যে, তিনি চৌদ্দশ বছরের একটি সর্বজন স্বীকৃত ও ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত বিষয় 'মসীহ (আঃ)-এর জীবন এবং তার অবতরণ'-কে গবেষণার লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নিজের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে মসীহের মৃত্যু এবং তার প্রত্যাবর্তনের উপর নিবিষ্ট করেছিল। মুসলমানদেরকে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ এবং হিন্দুদের পুনজন্মবাদের মত এর আবর্তে জড়াতে চেয়েছিল। জন্ম-জন্মান্তরের এক সীমাহীন চক্র এটাই মির্জা সাহেবের জ্ঞানচর্চা ও তবলীগী খেদমতের অপর নাম। তার রচনা সম্ভার থেকে যদি তার স্ববিরোধী দাবীসমূহ এবং তদ্দারা সৃষ্ট বিতর্কিত বিষয়গুলোকে পৃথক করে নেয়া হয়, তাহলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহল জেহাদ হারাম হওয়া ইংরেজ সরকারের আন্তরিক আনুগত্য ও তার প্রতি নিষ্ঠার আমন্ত্রণ। অথচ ভারত পূর্ব থেকেই মানসিক, মননগত ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল আর মুসলিম জগত পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা এবং আত্ম-বিস্মৃত সংস্কৃতির আবর্তে জড়িয়েছিল। কিন্তু আমরা মির্জা সাহেবের রচনাবলী এবং জ্ঞান চর্চায় নবী-রাসূলগণের দাওয়াতরীতি অনুযায়ী কোন সারগর্ভ কাজের কথা পাইনি। সে নিজের লেখা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ধর্মীয় মতবিরোধ ও দ্বীনি বিবাদে জর্জরিত ভারতীয় মুসলমানদেরকে অধিকতর মানসিক অস্থিরতা ও অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় টানাপোড়নের আবর্তে জড়িয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করেছিল।

কাদিয়ানীবাদ ও মুসলিম বিশ্ব

ইসলামী ঐক্য খতমে নবুওয়তের মাধ্যমেই সুসংহত হয় ঃ

এমন প্রত্যেকটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা দল যা ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু নিজের ভিত্তি নতুন নবুওয়তের উপর স্থাপন

করে এবং নিজের কথিত এলহামসমূহের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, এমন সমস্ত মুসলমানকে কাফের বলে মনে করে, মুসলমানরা সেটিকে ইসলামী ঐক্যের জন্য আশঙ্কাজনক বলেই মনে করবে। আর তা এ কারণে করবে যে, ইসলামী ঐক্য খত্মে নবুওয়তের মাধ্যমেই সুসংহত হয়। কাদিয়ানীত্ব আভ্যন্তরীনভাবে ইসলামের মূল ও লক্ষ্যের জন্য ধ্বংসাত্মক। এটি নিজের মধ্যে ইহুদীবাদের এত অধিক উপাদান সংরক্ষণ করে যেন মনে হয়, এই আন্দোলনটিই ইহুদীবাদের দিকে ঝুকে আছে। - (ডঃ ইকবাল, হরফে ইকবাল)

সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন

পূর্ববর্তী বিবরণ ছাড়াও মির্জা গোলাম আহমদ ও তার দল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে আচরণ অবলম্বন করেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তার ফয়সালা স্বয়ং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরই অর্পণ করা হচ্ছে যে, এমন দলকে সম্প্রসারণবাদী দল বলা যাবে কি না? এরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে কিনা? কিংবা মুসলিম বিশ্বকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ফাঁসাতে এবং ইংরেজদের গোলাম বানাতে গিয়ে কাদিয়ানীদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ইংরেজদের সাথে ছিল কি না? তারা ইংরেজদের বিজয়ে আলোকসজ্জা করে আনন্দোৎসব উদযাপন করে, ইংরেজ বাহিনীকে 'আমাদের বাহিনী' বলে অভিহিত করে এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে শত্রুবাহিনী সাব্যস্ত করে।

ইরাক ও বাগদাদ

ইংরেজরা যখন ইরাকের উপর অধিকার বিস্তার করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে লর্ড হার্ডিং ইরাক সফর করে, তখন বিখ্যাত কাদিয়ানী পত্রিকা 'আল-ফজল' লিখেছিল, নিঃসন্দেহে এই মহাত্মা কর্মকর্তা লর্ড হার্ডিং-এর ইরাক গমন শুভ ফল বয়ে আনবে। আমরা সেই ফলাফলে সন্তুষ্টও বটে। কারণ, আল্লাহ্ রাজ্যশাসন ও পৃথিবীর পরিচালনা শক্তি তাদের হাতেই অর্পণ করেন যারা তার সৃষ্টির কল্যাণ কামনা করে। তিনি তাদেরকেই পৃথিবীর শাসক করেন যারা তার যোগ্য হয়। কাজেই

আমরা আবারো বলছি যে, আমরা আনন্দিত। কারণ, আমাদের খোদার বাণী পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আশা করছি, বৃটিশ সরকারের সম্প্রসারণের সাথে সাথে আমাদের জন্য ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়ে যাবে এবং অমুসলিমদেরকে মুসলমান বানানোর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পুনরায় মুসলমান বানাব। - (আল-ফজল, কাদিয়ান, ২য় বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫)

অতঃপর এ ঘটনার আট বছর পর ইংরেজরা বাগদাদ কবজা করে নেয় এবং মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। তখন 'আল-ফজল' লেখে : "হযরত মসীহ্ মওউদ বলেন যে, আমি হলাম প্রতিশ্রুত মাহ্দী। বৃটিশ সরকার হল আমার সেই তলোয়ার যার মোকাবেলা সেসব ওলামার কোন ক্ষমতা নেই। কাজেই লক্ষ্য করার বিষয় যে, তারপরেও আমাদের কাদিয়ানীদের এ বিজয়ে কেন আনন্দ হবে না"।

"ইরাক আরব হোক কিংবা শাম আমরা সর্বত্র আমাদের তলোয়ারের চমক দেখতে চাই। একথাটি জাষ্টিস মুনীরও লিখেছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধে যখন তুর্কিদের পরাজয় হয়েছিল এবং বাগদাদের উপর ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তখন কাদিয়ানে এই বিজয়ের জন্য উৎসব উদযাপন করা হয়। - (গবেষণা বিবরণ, পৃঃ ২০৮-২০৯, জাষ্টিস মুনীর প্রণীত)

জাষ্টিস মুনীর আরো লিখেছেন যে, "কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক ইংরেজ সরকারের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অপমানজনক তুলনা করেছে।
- (জাষ্টিস মুনীর প্রণীত গবেষণা রিপোর্ট, পৃঃ ২০৮-২০৯)

ইরাক বিজয়ের পর প্রথম কাদিয়ানী গভর্ণর

বাগদাদের পতনের ক্ষেত্রে কাদিয়ানীদের ইংরেজ প্রীতির এমনি বিরাট ভূমিকা ছিল যে, যখন ইংরেজরা ইরাক জয় করে নেয়, তখন মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদের শ্যালক মেজর হাবীবুল্লাহ্ শাহ্কে ইরাকে নিজেদের প্রথম গভর্ণর নিয়োগ করে। মেজর হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে ইরাকে গিয়েছিল এবং সেখানে সামরিক ডাক্তার ছিল।

ফিলিস্তিন সমস্যা ও ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত

'আল-ফজল' পত্রিকা, ৯ম বর্ষ ৩৬ সংখ্যা লিখছে যে, "ইহুদীরা যদি একারণে বাইতুল মোকাদ্দাসের উত্তরাধিকারের যোগ্য নয় যে, তারা হযরত মসীহ (ঈসা) ও হযরত নবী করীম (সঃ)-এর রেসালত ও নবুওয়তকে অস্বীকার করে এবং খৃষ্টানরা এ কারণে যদি অযোগ্য হয় যে, তারা খাতেমুন্নবিয়্যীনের রেসালতকে অস্বীকার করেছে, তাহলে অবশ্য অবশ্যই অ-কাদিয়ানী ও মুসলমান উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়। যদি বলা হয় যে, মির্জা সাহেবের নবুওয়ত তো প্রমাণিত হয় না, তবে প্রশ্ন হবে, কার কাছে? যদি উত্তর এই হয় যে, যারা মানে না তাদের কাছে, তাহলে এভাবে তো ইহুদীদের কাছে ঈসা ও মহানবী (সঃ)-এর এবং খৃষ্টানদের কাছে মহানবী (সঃ)-এর নবুওয়ত-রেসালতও প্রমাণিত নয়। কাজেই অমান্যকারীদের ফয়সালা বা সিদ্ধান্তই যদি একজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে কোটি কোটি খৃষ্টান ও ইহুদীর ঐকমত্য রয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) মহানবী (সঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল ছিলেন না। সুতরাং যদি অকাদিয়ানী ভাইদের এ দাবী যথার্থ ও সঠিক হয়ে থাকে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের উত্তরাধিকারের যোগ্য সমস্ত নবীর মান্যকারীরাই হতে পারে, তাহলে আমরা ঘোষণা করছি যে, একমাত্র আহমদী (কাদিয়ানী)-দেরকে ছাড়া খোদার সমস্ত নবীর মুমিন বিশ্বাসী আর কেউ নেই।

শুধু তাই নয়, বরং ফিলিস্তীনের অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে তাদের শত শত বছরের পুরানো স্বদেশ ভূমি থেকে উৎখাত করে আরবদের বুকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ইসরাঈলরূপী ছোরা যখন বিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন কাদিয়ানী সম্প্রদায় একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে একাজে ইহুদী ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য পরিবেশ প্রস্তুতে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং জনৈক কাদিয়ানী প্রচারক লিখেছে ঃ "আমি এখানকার একটি পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে নিবন্ধ লিখেছি, তার সংক্ষেপ হল এই যে, এটি প্রতিশ্রুতির ভূমি যা ইহুদীদেরকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, নবীদের অস্বীকৃতি এবং অবশেষে মসীহের প্রতি শত্রুতা ইহুদীদেরকে চিরদিনের জন্য সেখানকার শাসন থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে এবং ইহুদীদের শাস্তিস্বরূপ শাসন ক্ষমতা রোমীয়দেরকে দিয়ে

দেয়া হয়েছে। পরে তা খৃষ্টানরা প্রাপ্ত হয়েছে এবং অতঃপর মুসলমানদেরকে। এখন যদি মুসলমানদের হাত থেকে সে ভূমি বেরিয়ে যায়, তাহলে তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত; মুসলমানরা কোন নবীকে অস্বীকার করেনি তো? বৃটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা আমরা দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি এবং স্বস্তি অনুভব করেছি। এর চাইতে ভাল কোন সরকার মুসলমানদের জন্য হতে পারে না।বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে আমার যে প্রবন্ধ এখানকার (ইংল্যান্ডের) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ আমি উপরে করেছি। এর সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার সেক্রেটারী কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, মিঃ জর্জ-এ নিবন্ধের অত্যন্ত সম্মান করেন। - ('আল-ফজল', কাদিয়ান, ৫ম বর্ষ, ৭৫ সংখ্যা, ১৯ মার্চ, ১৯১৮)

ফিলিস্তীনের প্রতিষ্ঠায় কাদিয়ানীদের কার্যকর প্রচেষ্টা সম্পর্কে মওলবী জালালুদ্দীন শাম্‌স এবং স্বয়ং মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের তৎপরতা কারো কাছেই লুকানো নয়। সম্ভবত কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারক মওলবী জালালুদ্দীন শাম্‌সকে ১৯২৬ সালে সিরিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানকার স্বাধীনতা প্রিয় লোকেরা তার তৎপরতার কথা জানতে পেরে তার উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত তাজুদ্দীন আল-হামানের সংসদ তাকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়। তখন জালালুদ্দীন শামস্‌ ফিলিস্তীন চলে আসে এবং ১৯২৮ সালে সেখানে কাদিয়ানী মিশন প্রতিষ্ঠা করে। সে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বৃটিশ বিপ্লবের ছত্রছায়ায় বিশ্ব সম্প্রসারণের খেদমত করতে থাকে। কাদিয়ানী দোস্ত মোহাম্মদ শাহ্‌ প্রণীত 'তারিখে আহমদিয়ত' (কাদিয়ানী ধর্মের ইতিহাস) প্রমাণ করে যে, ১৯১৭ সালে ফিলিস্তীন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বৃটিশ পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ ফিলিস্তীনে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ফিলিস্তীনের একটিং গভর্ণর স্যার ক্লিন্টনের সাথে যোগসাজশে একটি কর্মপন্থা প্রণয়ন করে এবং জালালুদ্দীন শামস কাদিয়ানীকে দামেস্কে ইহুদী স্বার্থের পরিদর্শক নিযুক্ত করে। - (মাসিক আল হক, আকোড়া খটক, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। দোস্ত মোহাম্মদ শাহ্‌ প্রণীত কাদিয়ানী ধর্মের ইতিহাস থেকে)

যা হোক ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তীনে কাদিয়ানী তৎপরতা প্রসার লাভ করতে থাকে। মওলবী আল্লাহ্‌ দিত্তা জলন্ধরী, মোহাম্মদ সলীম, চৌধুরী

মোহাম্মদ শরীফ, নূর মোহাম্মদ, মুনীর রশীদ আহমদ চুগতাঈর মত প্রসিদ্ধ কাদিয়ানী তাবলীগের নামে আবরদেরকে ক্রীত দাসে পরিণত করার হীন চক্রান্ত করতে থাকে। ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানের খলীফা মির্জা মাহমুদ নিজের ইহুদী সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 'নতুন আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলনের সূচনা করে এবং দলের কাছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কল্পে এই আন্দোলনের জন্য মোটা অংকের অর্থ দাবী করে। - (তারিখে আহমদিয়ত, পৃঃ ১৯)

তখন ভারত বহির্ভূত কাদিয়ানী জামাতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ গ্রহণ করে ফিলিস্তীনের জামাত। 'তারিখে আহমদিয়াত' অনুযায়ী হাইফাস্থিত জামাত ও কাবাবীর স্থিত মাদ্রাসা আহমদিয়া কোরবানী ও নিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মির্জা মাহমুদও তার ভূয়সী প্রশংসা করে। (ঐ, পৃঃ ৪০) শেষ পর্যন্ত যখন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফোর ১৯১৭ সালের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে একান্ত সতর্কতার সাথে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা কার্যকর হয়, তখন বেছে বেছে ফিলিস্তীনী উত্তরাধিকারীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু, নির্দ্বিধায়-নির্ভয়ে সেখানে থাকার সৌভাগ্য শুধু কাদিয়ানীদেরই হয়; তাদের প্রতি কোন উৎপাতই করা হয়নি। স্বয়ং মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ একান্ত গর্বিত ভঙ্গিতে এ ব্যাপারটি স্বীকার করতে গিয়ে বলেন ঃ "এতে সন্দেহ নেই যে, আরব রাষ্ট্রসমূহে আমাদের তেমন গুরুত্ব নেই যেমনটি সে সব (ইউরোপ ও আফ্রিকার) রাষ্ট্রগুলোতে রয়েছে। তারপরেও এক প্রকার গুরুত্ব আমরা প্রাপ্ত হয়ে গেছি। আর তা হল এই যে, ফিলিস্তীনের একান্ত কেন্দ্রস্থলে যদি কোন মুসলমান থেকে থাকে, তবে তা শুধু আহমদীরাই আছে। - (আল-ফজল, লাহোর, পৃঃ ৫, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৫০)

দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ ফিলিস্তীনে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা ও তার স্থিতিশীলতার জন্য যখন ইহুদীদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন, তখন মির্জা মাহমুদের জামাত এহেন গুরুত্ব পাবে নাই বা কেন?

- (মাসিক আল হক, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। দোস্ত মোহাম্মদ শাহ্ কাদিয়ানী প্রণীত তারিখে আহমদিয়াতের বারাতে।)

আর যখন আরবদের হৃদয়ের এই ক্ষরিত ক্ষয় রোগ ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হয়, সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাকে বয়কট করে

আসছে। বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক বা অকূটনৈতিক কোন মিশন সেখানে নেই। কারণ, ইসরাঈলের অস্তিত্বই তাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত। বাংলাদেশ আরবদের একান্ত সমর্থকও বটে। মাউন্ট কোর্মেল, কাবাবীর প্রভৃতিতে তাদের সম্প্রসারণবাদী ও গোয়েন্দা তৎপরতার আড্ডা কাদিয়ানী মিশনারীর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটা বিস্ময়কর নয় তো কি? দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে ইসরাঈলে কোন খৃষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এবং পরে কিছু কিছু খৃষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় রাব্বী শ্লোগোরিয়ান আর্চ বিশপ অব কেন্টার বেরি, ডঃ রেমজে ও কার্ডিয়েল পাদ্রী ইনানের সাথে বিশেষ সাক্ষাত করে তার উপর চাপ প্রয়োগ করে যাতে ইসরাঈলে খৃষ্টান মিশনারীসমূহের উপর অবরোধ আরোপ করা হয়। - (মাসিক আল হক, আকোড়া, খটক, ৯ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)

খৃষ্টান মিশনগুলোর বিরুদ্ধে ইসরাঈলে পরিকল্পিত আন্দোলন পরিচালিত হয়। খৃষ্টান কেন্দ্রগুলোতে আক্রমন চালানো হয় এবং দোকান পাট ও বাইবেলের কপি জ্বালানো নিয়মিত ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু ১৯২৭ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭১ বছরের মধ্যে ইহুদীরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলেনি কিংবা তাদের লিটারেচারসমূহকেও বাধা দেয়নি। এটাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তারা কাদিয়ানীদেরকে নিজেদের স্বার্থেই নিরাপত্তা দিয়ে আসছে।

ইসলামের তাবলীগের নামে মুসলমান ও পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরাঈলে কাদিয়ানী মিশন একটি দুষ্ট ক্ষত ছাড়া আর কি? এই দুষ্টক্ষতের পক্ষে আরবদের জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ-অস্থিরতা এবং পাকিস্তানের প্রতি কুধারনার কারণ হয়ে পড়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তাদের মতে এই (কাদিয়ানী) মিশন আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরী, গোপন সামরিক তথ্য পাচারে, মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, বৈষয়িক, চারিত্রিক অবস্থা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা জানার জন্য আরব গেরিলাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং বিশ্ব সম্প্রসারণবাদ ও ইহুদী আধিপত্য বিস্তারের পথ অনুসন্ধানে তৎপর থাকে।

ইসরাঈলী মিশন

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর ব্যাপারে (পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জাফরুল্লা খানের চেষ্টা চরিত্র কারো কাছে লুকানো নয়। কিন্তু তিনি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন কোন এক ব্যক্তি রাবওয়ার আওতায় ইসরাঈলী মিশন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি গতানুগতিক ছলনার ভঙ্গিতে বললেন, পাকিস্তান সরকার তো এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন পত্রপত্রিকায় ইসরাঈলী মিশন সম্পর্কে আলাপ-চর্চা হয়, তখন তিনি একান্ত সতর্কতার সাথে বললেন, এমন মিশন আছে, তবে কাদিয়ান ভারতের অন্তর্ভূক্ত। এটা এমন এক মিথ্যাবাদ ছিল যে, স্বয়ং রাবওয়ার নতুন আন্দোলনের বার্ষিক বাজেট তথা ব্যয় বরাদ্দ ১৯৬৬-৬৭-এর মাধ্যমে তার মুখোশ খসে পড়ে। এই বাজেটের ২৫ পৃষ্ঠায় বহির্দেশীয় মিশনসমূহের আওতায় ইসরাঈলে অবস্থিত হাইফার কাদিয়ানী মিশনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

(বাজেটের নমুনা নিম্নে সংযোজিত হইল)

ব্যয় হাইয়া—(ইসরাঈলী পাউন্ড) = ২.৬৭ টাকা।

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আসল অংক ৬৪-৬৫	বাজেট ৬৫-৬৬	বাজেট ৬৬-৬৭
১)	কেন্দ্রীয় প্রচারক	৯৭২	৯৭২	৯৭২
	কর্মী সংখ্যা মোট	৯৭২	৯৭২	৯৭২

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আসল অংক ৬৪-৬৫	বাজেট ৬৫-৬৬	বাজেট ৬৬-৬৭
১)	নতুন আন্দোলনের চাঁদা	-	১,৪৫০	১,৪৫০
২)	সাধারণ চাঁদা	-	১,৬০০	১,৬০০
৩)	যাকাত	-	১০০	১০০
৪)	ঈদ ফাণ্ড	৩,৪০০	-	-
৫)	ফিৎরা	-	১২৫	১২৫
৬)	বিবিধ	-	১২৫	১২৫
	মোট আয়	৩,৪০০	৩,৪০০	৩,৪০০

ব্যয় বিস্তারিত

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আসল অংক ৬৪-৬৫	বাজেট ৬৫-৬৬	বাজেট ৬৬-৬৭
১)	প্রকাশনা	-	৪০	৪০
২)	প্রচার, সম্মেলন, ঈদ	-	৬০	৬০
৩)	সফর সময়	-	৪০	৪০
৪)	আপ্যায়ন	-	৫০	৫০
৪)	বাড়ী ভাড়া ও ফানিশার্স	-	-	-
৫)	বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস	-	-	-
৬)	ডাক,তার,ফোন	-	৫০	৫০
৭)	ষ্টেশনারী	-	১৫	১৫
৮)	পুস্তক ও পত্র পত্রিকা	-	৫০	৫০
৯)	বিবিধ	-	৫০	৫০
১০)	আল বুশরা সাময়িকীর ব্যয়	-	৭০০	৭০০
	মোট ব্যয় বিস্তারিত	১,০৫৫	১,০৫৫	১,০৫৫
	কর্মচারী খরচ	২,০২৭	২,০২৭	২,০২৭
	কেন্দ্রীয় রিজার্ভ	১,৩৭৩	১,৩৭৩	১,৩৭৩
	সর্বমোট	৩,৪০০	৩,৪০০	৩,৪০০

সংক্ষেপে

আয়	৩,৪০০
ব্যয়	৩,৪০০

ইসরাঈল মিশন

এখানে আমরা ইসরাঈলে কাদিয়ানী মিশনের প্রমাণ মূল ভাষ্যসহ পেশ করছি। এই উদ্ধৃতিটি কাদিয়ানীদেরই প্রকাশিত আহমদিয়া ফরেন মিশন রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত (গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাতি) মোবারক আহমদ প্রণীত 'আওয়ার ফরেন মিশন'-এর ৭৮ পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

"আহমদিয়া মিশন ইসরাঈলের হাইফায় (মাউন্ট কার্মেলে) অবস্থিত। সেখানে আমাদের একটি মসজিদ, একটি মিশন হাউস, একটি লাইব্রেরী, একটি বুক ডিপো ও একটি স্কুল রয়েছে। আমাদের মিশনের পক্ষ থেকে 'আল বুশরা' শীর্ষক একটি আরবী মাসিক ম্যাগাজিন

প্রকাশিত হয় এবং ত্রিশটি দেশে তা পাঠানো হয়। এই মিশন মসীহে মাওউদ (মির্জা গোলাম আহমদ)-এর বহু লেখা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছে। ফিলিস্তীন বিভক্ত হওয়ার কারণে এই মিশনটি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। কতিপয় মুসলমান যারা এখন ইসরাঈলে রয়েছে, আমাদের মিশন তাদের যথাসম্ভব সেবা দান করে যাচ্ছে এবং মিশনটি থাকার কারণে তাদের মনোবল সুদৃঢ় রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমাদের মিশনারীর লোকেরা হাইফার মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করেছে। মেয়র ওয়াদা করেছেন যে, আহমদিয়া জামাতের জন্য হাইফার নিকটবর্তী কাবাবিরে একটি স্কুল খোলার অনুমতি দিয়ে দেবেন। এই এলাকাটি আমাদের দলের একটা কেন্দ্র। কিছু দিন পর মেয়র সাহেব আমাদের মিশনারী পরিদর্শনে আসেন। হাইফার চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তার সাথে ছিলেন। তাদেরকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা দেয়া হয়। তাতে জামাতের বিশিষ্ট সদস্যবর্গ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিল। তাঁদের আগমন উপলক্ষ্যে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তাঁকে (মেয়রকে) মানপত্র দেয়া হয়। বিদায়ের প্রাক্কালে মেয়র সাহেব অতিথিদের রেজিষ্ট্রারে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আমাদের এই মিশনের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত ছোট্ট একটি ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হতে পারে। ১৯৫৬ সালে যখন আমাদের মুবাল্লিগ (ধর্ম প্রচারক) চৌধুরী মোহাম্মদ শরীফ সাহেব পাকিস্তানের রাবওয়ায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ইসরাঈলী প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমাদের মিশনারীতে পয়গাম পাঠানো হল যেন চৌধুরী সাহেব রওয়ানা হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে চৌধুরী সাহেব জার্মান ভাষায় অনূদিত এক কপি কোরআন করীম নিয়ে প্রেসিডেন্টকে উপঢৌকন দিলেন। তিনি সেটি খোলা মনে গ্রহণ করলেন। প্রেসিডেন্টের সাথে চৌধুরী সাহেব-এর সাক্ষাৎকারটা ইসরাঈল রেডিও থেকে প্রচার করা হয় এবং পত্র-পত্রিকাতেও ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।

ইহুদী ও কাদিয়ানীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সাযুজ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল আজ থেকে ৬০ বছর আগে বলেছিলেন মির্যাইয়্যত বা কাদিয়ানী মতবাদের ভেতর ইহুদীদের এতগুলো উপাদান রয়ে গেছে যে, মনে হয় এ আন্দোলনটি সম্পূর্ণরূপে ইহুদীবাদের প্রতি ঝুঁকে আছে। - (হরফে ইকবাল, পৃঃ ১১৫)।

১৯৩৬ সালে এটা ছিল একটি চিন্তাগত বিষয় যার ব্যাপারে মতানৈক্যের সুযোগ ছিল প্রচুর কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তা ও আদর্শগত বিষয়টি কর্ম ও তৎপরতার পর্যায়ে এসে সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। কাদিয়ানী মতবাদ ও ইহুদীবাদ-এর অভিন্নতা ও গভীর সাযুজ্য হয়ে উঠলো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এক অনস্বীকার্য বাস্তব।

ইহুদীবাদ ও কাদিয়ানী মতবাদের পারস্পরিক সম্পৃক্তি

পারস্পরিক সম্পর্ক ও দহরম মহরম কোন ধরনের সম্মিলিত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ে আমাদের খুব বেশী একটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদের ইসলাম বিদ্বেষী চেতনা কোন গোপন বিষয় নয়। আর ইহুদীবাদী শক্তিও পাশ্চাত্যের ক্রীড়নকরূপে মুসলিম জাতি বিশেষতঃ আরব বিশ্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহের বৈরীতার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ইহুদী ও কাদিয়ানী চিন্তার মৈত্রী অভিন্ন লক্ষ্য ও চেতনাগত ঐক্যের মাধ্যমে ঘটেছে। আরব বিশ্বের পর ইসরাঈল যদি আর কোন রাষ্ট্রকে তার সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন হিসেবে গণ্য করে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা ছিল পাকিস্তান। ইসরাইলের স্থপতি ডেভিড বিন গোরিয়ান ১৯৬৭ সালে প্যারিসের সারারাবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন। মূলতঃ পাকিস্তান আমাদের জন্য আদর্শগত চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক জায়নবাদী কট্টর ইহুদী আন্দোলনকে কোন ক্রমেই পাকিস্তান সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা চলবে না। আর পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যে কোন বিপদাশংঙ্কা থেকেও হওয়া যাবে না উদাসীন।

সামনে এগিয়ে আরববিশ্ব ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি বলেন, "অতএব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের অতি দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পাকিস্তানের চেতনাগত সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি আগামী দিনগুলোতে আমাদের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে দাড়াবে। সুতরাং ভারতের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বরং পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সেই ঐতিহাসিক চিরশত্রুতার মনোভাবকে আমাদের পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে হবে। ঐতিহাসিক এ শত্রুতাই আমাদের পুঁজি। আন্তর্জাতিক ফোরাম ও বৃহৎ শক্তিগুলোতে নিজেদের প্রভাব সৃষ্টি করে তাদের সকল ক্ষমতা ভারতের সপক্ষে

কাজে লাগাতে হবে। আর, পাকিস্তানের উপর হানতে হবে চরম আঘাত। এ কাজ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে, গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। - (জেরুজালেম পোষ্ট, ১৯ আগষ্ট, ১৯৬৭ ইং, দৈনিক নওয়ায়ে, ওয়াক্ত, লাহোর, পৃঃ ১, তারিখ, ২২শে মে, ১৯৭২ ইং ও ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ইং)

বিন গোরিয়ান পাকিস্তানী চেতনা ও সামরিক শক্তি বলতে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা প্রখ্যাত ইহুদী সমরবিদ প্রফেসর হার্টার-এর উক্তিতে খুজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা পোষণ করে। আর এ ভালোবাসার ভিত্তিতেই আরবদের সাথে তাদের সম্পর্ক অটুট হয়ে রয়েছে। এ পরিস্থিতি বিশ্ব ইহুদীবাদের জন্য সীমাহীন আশংকায় পূর্ণ। ইসরাইলের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এটাই বড় বাধা হয়ে আছে। সুতরাং যে কোন মূল্যে পাকিস্তানীদের অন্তর থেকে রাসূলের ভালোবাসা মুছে ফেলার পন্থা অবলম্বন করাই হবে ইহুদীদের প্রধান দায়িত্ব"। - (নওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর। পাতা-৬, ২২শে মে, ১৯৭২ ইং এবং বৃটিশ দ্বীপ পুঞ্জের ইহুদী সংগঠনগুলোর মুখপত্র "জিউস ক্রাইস" ১৯ আগষ্ট ১৯৬৭ ইং)

বিন গোরিয়ান এর ভাষণের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাক সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মহব্বত ও জিহাদের জয্‌বা শেষ করে দেয়ার প্রয়োজন ও পরিকল্পনার সাথে কাদিয়ানীদের খত্‌মে নবুওয়ত অস্বীকার এবং ইসলামী জিহাদের হুকুম রহিত করার চেতনায় কী পরিমাণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চিন্তা ও শক্তির মূল ভিত্তি রাসূলে খোদা (সঃ)-এর মহব্বত ও এশ্‌ক থেকে সৈন্যদের অন্তরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত সম্প্রদায়টিই যে পাক-ভারত বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে ইহুদীদের নির্বাচিত ও আদরনীয় সম্প্রদায় হবে এটাই তো স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ইহুদীচক্র পূর্বপাকিস্তান সংকটের সময় প্রথম বারের মতো পাকিস্তান বিরোধী তৎপরতার সুবর্ণ সুযোগ পেলো। তখন ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবাইবান শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি প্রয়োজনের সময় অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার কথাও বলেছিলেন।

এ কথাটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর দেয়া এক বিবৃতিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে যা তিনি '৭০-এর নির্বাচন প্রসংগে প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, বিগত '৭০-এর নির্বাচনে ইসরাইলী অর্থ পাকিস্তানে এসেছে এবং নির্বাচনী অভিযানে তা ব্যয়িত হয়েছে। এ

টাকা কাদিয়ানীদের হাত না হয়ে তো আসতেই পারে না। পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র তেল আবিবে হয়েছে যার রহস্য মিসরীয় দৈনিক আল-আহরাম-এর সম্পাদক হোসেইন হায়কালকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পাক-প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন। সে ষড়যন্ত্র কী করে পাকা-পোক্ত হলো? পাকিস্তানের সাথে তো ইসরাইলের একমাত্র কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মাধ্যম ছাড়া আর কোনই সংযোগ-সম্পর্ক নেই।

কাদিয়ানীরা যদি জায়নবাদী উগ্র ইহুদী চক্রের ক্রিড়নক না হতো, যদি মুসলিম বিশ্ব ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা অত্যন্ত ঘৃণিত না হতো তাহলে ইসরাইলের দুয়ার কিছুতেই তাদের জন্য উন্মুক্ত হতো না। এ প্রসংগ এলেই কাদিয়ানীরা বার বার শুধু ইসলামের তাবলীগ দাওয়াত ও প্রচারের আড়ালে পরিচয় গোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে বরাবরই রয়ে গেছে যে, কাদিয়ানীদের এ তাবলীগ কি ইসরাইলের ঐ ইহুদীদের সাথে চালানো হচ্ছে? যারা বিদ্বেষী জায়নবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দেশ-মাতৃকা ছেড়ে এসেছে। সমস্ত সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে অন্তরে ধারণ করে ইসরাইলে এসে দলা পাকিয়েছে। নাকি কাদিয়ানীদের ইসলাম (?) প্রচার ওসব আরব শিশুদের উপর চলছে যারা জন্মগতভাবেই হযরত রাসূলে করীম(সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে শামিল আর মুসলমান হওয়ার অপরাধেই তারা ইহুদী ইসরাইল সরকারের সকল প্রচার নির্যাতন সইছে।

'৬৫ ও '৭৩ সালে ইসরাইল যখন তার পশ্চিমা বন্ধুদের সহায়তায় আরবদের উপর পৈশাচিক আক্রমন চালায় এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত করে তখন ইসরাইলের সাথে নিজেদের বন্ধুত্বের প্রমাণ পেশ করার এবং পুরোনো সম্পর্ক ও ভালোবাসার দাবী পূরণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলো কাদিয়ানীরা। উভয়ে মিলে তারা তখন ইসলামী বিশ্বের প্রতি তাদের আক্রোশ মেটানোর সুযোগ গ্রহণ করে। কাদিয়ানীদের মাধ্যমে আরব গেরিলা ও গণবাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ চালানো হয়। বিপ্লবী আরব সংগঠনগুলোর মধ্যে মুসলমানের পরিচয়ে ঢুকে কাদিয়ানীরা অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে কাদিয়ানীরা ইসরাইলের এমন বিশ্বাসী মিত্রে পরিণত হয় যা বৃটিশ আমলে ইংরেজ শাসকদের সাথে তাদের ঘনিষ্টতার সাথেই তুলনীয়। আর এসব সৌহার্দ সম্প্রীতির মূল কারণই হচ্ছে আরবদের

ধ্বংস সম্পর্কে কাদিয়ানীদের নেতা মির্জা গোলাম আহমদের তথাকথিত একটি এলহাম। যে এলহামে আরবদের পূর্ণ ধ্বংসের পর আহমদীয়া বা কাদিয়ানী ধর্মের চরম উন্নতি ও উত্থানের সংবাদ দেয়া হয়েছে। মূলতঃ এই এলহামের মাধ্যমে মির্জার পুত্রকে ইসলাম ও আরব বিরোধী মনোভাব পোষনের সবক দেয়া হয়েছে। এলহামটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে এবং এতদসংক্রান্ত সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে শামদেশ। সাহেবজাদা সাহেব (অর্থাৎ পীর সিরাজুল হক কাদিয়ানী) তখন আমার ওয়াদাকৃত পুত্র হবেন। তার সাথেই এসব ঘটনাবলীকে খোদা সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। এসব ঘটনার পরে আমাদের মতবাদের উন্নতি হবে এবং শাসকশ্রেণী আমাদের মতাদর্শে দীক্ষিত হবেন। তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই ব্যক্তিটিকে চিনে নিও"। - তাযকিরা-ই-মির্জা, ওহী ও এলহাম সংগ্রহ মুদ্রণ, পৃঃ ৭৯৯।

এসব এলহামের ব্যাপারেই আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন ঃ "গোলামদের এলহাম থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন, জাতিকে ধ্বংস করতে এরা চেঙ্গিস খানের অনুরূপ।"

উসমানীয় খেলাফত ও তুর্কী

(পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এডওয়ার্ড ম্যাকলিগন-এর উদ্দেশ্যে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের, আল-ফযল পত্রিকা বলে ঃ

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলে দিতে চাই যে, তুর্কীদের সাথে ধর্মীয়ভাবে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কেবল এ বিষয়ে বাধ্য যে, যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর স্থলাভিষিক্ত থাকবেন আমরা তাকে নেতা মানবো এবং পার্থিব ক্ষেত্রে আমরা তাকে আমাদের বাদশাহ ও সুলতান বলে বিশ্বাস করবো, যার শাসনের আওতায় আমরা বসবাস করি। অতএব আমাদের খলীফা হচ্ছেন হযরত মসীহ মওউদ-এর দ্বিতীয় খলিফা আর আমাদের বাদশাহ্ হলেন সম্মানিত রাজা সাহেব। তুরস্কের সুলতান কখনোই খলীফাতুল মোসলিমিন নন। - (সাধারণ বিভাগ কাদিয়ান-এর ঘোষনাপত্র, আল-ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, খণ্ড-৭, সংখ্যা-১৬১, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২০)।

(লীডার পত্রিকা, এলাহাবাদ। ২১ জানুয়ারী ১৯২০ এ খেলাফত কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণটি সম্মানিত ভাইসরয় সমীপে পেশ করা হয়, এতে স্বাক্ষরকারীদের সূচীতে মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর নামের পূর্বে জনৈক মওলবী মুহাম্মদ আলী কাদিয়ানীর নাম উল্লেখ করা

হয়েছে। মওলবী মুহাম্মদ আলীর নামের সংগে "কাদিয়ানী" শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য। এমনিতে কাদিয়ানের বাসিন্দা হওয়ার অর্থ এই নয় যে লোকটি আহমদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আহমদী হলে তিনি তুর্কী সুলতানকে মুসলিম জাতির খলীফা স্বীকার করতেন না। এ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, মওলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরী কাদিয়ানীদের অনুসারী নন। কাদিয়ানের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাদিয়ানী-এ জন্যেই হতে পারেন না, যেহেতু তিনি তুর্কী সুলতানকে মুসলমানের খলীফা স্বীকার করেন।

উসমানী খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা এবং আরবদের সাথে তুর্কীদের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কাদিয়ানী ও ইংরেজরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি ভালো ভাবে আন্দাজ করা যায়। দামেশ্‌ক থেকে প্রকাশিত 'আল-কাদিয়ানীয়্যাহ্' নামক সাময়িকীতে কাদিয়ানীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার উপর আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের শ্যালক ওলীউল্লাহ্ জয়নুল আবেদীনকে উসমানীয় রাজধানীতে প্রেরণ করে। সেখানকার ৫ম ডিভিশনের কমান্ডার জামাল পাশার মাধ্যমে সে ১৯১৭ সালে কুদস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের প্রভাষক নিযুক্ত হয়। এরপর ইংরেজ সৈন্যরা যখন দামেশ্‌কে প্রবেশ করে তখন ওলীউল্লাহ্ তার আলখেল্লা খুলে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইংরেজ সৈন্যদের সদস্য হিসাবে যোগ দেয়। আরবদের তুর্কীদের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলে সংঘর্ষ বাধানোই ছিল তার মূল দায়িত্ব। ইরাকীরা তার সম্পর্কে অবহিত হয়ে পড়লেও ভারত সরকার ওলীউল্লাহ্‌কে সেখানে সপদে বহাল রাখার ব্যাপারে তদবীর চালায় কিন্তু ইরাক সরকার তা মানতে রাজী না হওয়ায় সে পালিয়ে কাদিয়ান চলে আসে এবং সাধারণ বিভাগের ব্যাবস্থাপক পদে নিযুক্ত হয়। - (আজমী ইসরাইল, পৃঃ ২৭, উদ্ধৃতি ঃ আল কাদিয়ানিয়্যাহ্, দামেশ্‌ক সংস্করণ)।

এ ঘটনা উল্লেখ করার পর 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ্' সাময়িকী লিখেছে, কোন মুসলিম আরব রাষ্ট্রে মির্যায়ী বা কাদিয়ানীদের কোন জায়গা নেই বরং কাদিয়ানীদের এহেন কার্যকলাপের ফলে আরবদেশগুলোতে পাকিস্তানের প্রতিও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। খেলাফতের পতনের পর মোস্তফা কামালের যুগেও কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। এ বর্ণনা বহুল আলোচিত ও প্রসিদ্ধ যে, মোস্তফা সগীরের গ্রুপে

দু'জন কাদিয়ানী যোগ দিয়েছিলো। মোস্তফা সগীর নিজেও কাদিয়ানী চিন্তাধারার সমর্থক ছিল। মোস্তফা কামালের হত্যার জন্য তাকে নিয়োগ করা হয় কিন্তু তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাকে মৃতুদন্ড পেতে হয়।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক পত্রাবলী ও জিহাদী চেতনার বিরোধিতা প্রসংগ পূর্বের আলোচনায় এসেছে। অতিরিক্ত কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়ে লীগ অব ন্যাশনস্-এর প্রতি আবেদন ঃ

আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ হযরত মসীহ্-এর দ্বিতীয় খলীফা লীগ অব ন্যাশনস্-এর প্রতি আকুল আবেদন করেন যে, সম্প্রতি পনেরো জন পুলিশ কনষ্টেবল ও সুপারদের মাধ্যমে কাবুল সরকার দু'জন কাদিয়ানীকে ধর্মীয় বিরোধের কারণে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করেছে। অতএব, কাবুল রাজদের উপর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হোক। কেননা এ সরকার সকল ধর্মের প্রতি সমান সুবিচার করে রাজ্য পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখে না। - '(আল-ফজল', কাদিয়ান, খঃ ১২, সংখ্যা-৯৫, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯)

আমীর আমানুল্লাহ্ খান অজ্ঞতা বশতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন। মিঞা মাহমুদ আহমদ জুমার খুতবায় বলেছে, যা 'আল-ফজল' খঃ ৬, ২৭শে মে ১৯১৯ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঃ "বর্তমানে (বাদশাহ্ আমানুল্লাহের শাসনামলে) কাবুল যে যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে শুরু করেছে এটি অজ্ঞতা প্রসূত। আহমদীদের উপর সরকারের খেদমত করা ফরজ। কেননা গভর্ণমেন্টের অনুসরণ করাই আমাদের দায়িত্ব। তবে আফগানিস্তানের যুদ্ধ আমাদের জন্য অন্য এক বৈশিষ্টের দাবী রাখে। কেননা কাবুল ঐ ভূখণ্ড যেখানে আমাদের অতি মূল্যবান কিছু অস্তিত্ব ধ্বংস হয়েছে। মূল্যবান প্রাণ সংহার করা হয়েছে ... এবং বিনা কারণে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কাবুল সেই জায়গা যেখানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দুয়ার রুদ্ধ। অতএব, সত্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে এসব জালেমকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারকে সহায়তা করা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্তব্য বা

ফরজ। সুতরাং চেষ্টা কর যাতে তোমাদের মাধ্যমে সে সব শাখা সৃষ্টি হয় যে সবের সংবাদ মসীহ মওউদ দিয়েছেন।"

কাবুল যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্যে মির্জায়ীদের ভূমিকা

যখন কাবুলের সাথে যুদ্ধ হয়েছে তখনো আমাদের জামাত নিজের সামর্থ নিয়ে সাহায্য করেছে; নানাবিধ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। একটি ডবল কোম্পানী পেশ করেছে যদিও যুদ্ধের কারণে তাদের ফৌজে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি, এতে সহস্রাধিক যোদ্ধা নাম লিখিয়েছিলো। আমাদের মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং বর্তমান ইমামের ছোটভাই স্বয়ং এতে নিজেদের সেবা পেশ করেছিলেন। ছয়মাস ব্যাপী তারা ট্রান্সপোর্ট কোরে অনারারীভাবে কাজ করেন।

আফ্রীকীয় রাষ্ট্রসমূহে সাম্রাজ্যবাদী ও জায়নবাদী তৎপরতা

আফ্রিকা পৃথিবীর সে অভাগা মহাদেশ যেখান থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সবশেষে তার পাঞ্জা গুটিয়ে নিয়েছে। এখনো পর্যন্ত এর বেশ কিছু অংশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয়ে বন্দী রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার কতিপয় এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রথম ঘাঁটি তৈরীর ক্ষেত্রে কাদিয়ানীদের ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট। এরাই গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ইংরেজদের পথ পরিস্কার করে দিয়েছে। দি ক্যামব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইসলাম সংস্করণের ১৯৭০ ইং তে উল্লেখিত হয়েছে।

"The Ahmadiyya first appeared on the west African cost during the first World War, when several young men in Lagos and Free Town joined by Mail. In 1921 the first Indian Missionary arrived. Too unorthodox to gain a footing in the Muslim interior, the Ahmadiyya remain confined principally to Southern Nigeria, Southern Gola Coast Sierraleone. It strengthened the ranks of those Muslim actively loyal to the British, and it contributed to the modernization of Islamic

organization in the area. - (The Cambridge History of Islam, Vol. II, edited by Halt, Lambton, and Lemis, Cambridge University Press, 1970, P-400)

অনুবাদ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আহমদী সম্প্রদায়ের লোকেরা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকায় পৌছে; যেখানে লাউস ও ফ্রী টাউনের কতিপয় যুবক তাদের সাথে মিলিত হয়। ১৯২১ সালে প্রথম ভারতীয় মিশন সেখানে পৌছে যদিও তারা কোন আকীদা প্রচার করতে সক্ষম হয়নি, তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনবসতিগুলোতে নিজেদের কদম মজবুত করা। এ সব লোক অধিকাংশই দক্ষিণ নাইজেরীয়। এরা দক্ষিণ গোল্ডকোষ্ট এবং সিয়েরালিউনে তৎপরতা চালাতো। এরা ওসব মুসলিম সৈন্যদের শক্তিশালী করেছে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ছিল সীমাহীন অনুগত। এছাড়া এতদঞ্চলে তারা ইসলামকে নতুন নতুন চাহিদার বেড়াজালে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়।

এ উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ১৯২১ পর্যন্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায় দক্ষিণ গোল্ডকোষ্ট এবং সিয়েরালিউনেই অধিকহারে জমে রয়েছে। এবং গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হিন্দুস্তানের মত এখানকার মুসলমানদেরকেও বৃটিশ ভক্তি ও জিহাদের হুকুম রহিত করার বাণী প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত রাখার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিককালে "আফ্রিকা স্পিক্স" নামে কাদিয়ানীরা মির্জা নাসের আহমদ-এর আফ্রিকা সফরের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা আফ্রিকায় কাদিয়ানীদের অপতৎপরতার বাঙ্ময় সাক্ষী। এতে নিম্নলিখিত কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ One of the main points of Gholam Ahmad's has been rejection of "Holy War's" and forcible conversion." - (Africa Speaks, Page-93, Published by Majlis Nusrat Islam, Tahrik-E-Jadid, Rabwah)

অর্থাৎ, গোলাম আহমদের গুরুত্বপূর্ণ আকীদা সমূহের অন্যতম হলো পবিত্র জেহাদের অস্বীকার। মরিশাস একটি আফ্রীকীয় দ্বীপ। ১৯৬৭ সালে এখান থেকে "দি মুসলিম ইন মরিশাস" নামক একটি বই (জনাব মোমতাজ উমরিয়্যত কৃত) প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী। কৃতি লেখক বইটিতে সেখানকার কাদিয়ানীদের ঘৃণিত অপতৎপরতার উল্লেখ করেছেন যা মুসলমানদের মর্মপীড়ার কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে লেখক মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত একটি মামলার উল্লেখ করেছেন। লেখকের দাবী অনুযায়ী এই "রোজহিল মসজিদ মামলা"কেই মরিশাসের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মামলা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যে মামলার শুনানী ও সাক্ষী দীর্ঘ দুই বছর যাবত সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করতে থাকে। এবং ১৯শে নভেম্বর, ১৯২০ সালে প্রধান বিচারক সরাই হেরচিজ্যোডরে এ রায় দেন যে, "মুসলমান ভিন্ন জাতি আর কাদিয়ানী ভিন্ন জাতি"।

বইটি পড়লে এ কথাও জানা যায় যে, এখানেও তাদের আগমন বৃটিশ সেনাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েই ঘটেছিলো। লেখকের ভাষায় ঃ কাদিয়ানী ধর্মমতে বিশ্বাসী দু'জন সৈন্য বৃটিশ ফৌজের সংগে এখানে এসেছিলো। তাদের নাম দ্বীন মোহাম্মদ ও বাবু ইসমাঈল খান। এরা ১৭শ রয়েল ইনফেন্ট্রীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। ১৯১৫ পর্যন্ত এরা এদের তাবলীগী কার্মকান্ড (?) পরিচালনা করতে থাকে। - (বিস্তারিত দ্রঃ আল-মিম্বার, লায়েলপুর, খঃ ৯-২২, পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)

দু'বছর পূর্বে আফ্রিকায় তাবলীগের নামে যে দু'টি স্কীম "নুসরত জাহান রিজার্ভ ফান্ড" এবং "এগিয়ে চল স্কীম" নামে চালু করা হয় এর পরিকল্পনা গৃহিত হয় লন্ডনে আর এর একাউন্টগুলো খোলার পিছনে মীর্জা নাসের আহমদের ভূমিকা ছিল প্রধান। - (আল ফজল, রবওয়াহ, ২৯ জুলাই, ১৯৭২ ইং)

আফ্রিকায় নিজেদের তৎপরতা চালু রাখার ব্যাপারে কাদিয়ানী মুবাল্লিগরা বৃটেনস্থ আফ্রিকীয় দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং তাদের অনেক তথ্য প্রদান করে। বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতর কাদিয়ানীদের মিশনগুলো হেফাজত করে থাকে।

কিছু লোক একবার বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের নিকট এ বিষয়টি প্রকাশ করে যে, কাদিয়ানীদের তৎপরতা আফ্রিকা মহাদেশের বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলোতেই বেশী কেন, তাছাড়া বৃটিশ সরকার

কাদিয়ানীদের মিশনগুলোর হেফাজত কেন করে এবং অন্য যে কোন মিশনের তুলনায় কাদিয়ানীদের জন্য বৃটেনের আন্তরিকতা বেশী কেন? তখন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয় যে, সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যাবলী ও তাবলীগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক নয়। এ উত্তরের মর্ম ছিলো খুবই স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কোন দেশে বা নতুন উপনিবেশে তার রাজনৈতিক স্বার্থকেই বড় করে দেখে থাকে। এ ক্ষেত্রে খৃস্টান মিশনারীদের তুলনায় যখন কাদিয়ানীরাই বেশী উপকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে তখন কাদিয়ানীদের প্রতি বেশী মনযোগী হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আফ্রিকায় জায়নবাদী ইহুদীদের সুসজ্জিত সেনাদল

বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা ছাড়া কাদিয়ানীরা আফ্রিকায় জায়নবাদী ইহুদীচক্র ও ইসরাইলের সপক্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত সেনাদল বলে প্রমাণিত। ১৩ই জুলাই ১৯৭৩ থেকে ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ পর্যন্ত মীর্জা নাসের আহমদ বিভিন্ন দেশে যে সফর করে তার উদ্দেশ্যও ছিলো নিরেট রাজনৈতিক। লন্ডন মিশনের 'মাহমুদ হলে' যে গোপন বৈঠক সমূহ অনুষ্ঠিত হয় এ সবের উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরাইলী সম্প্রসারণবাদের পূর্ণতা বিধান। - (মাসিক আল-হক, খঃ ৯, পৃঃ ২৫)

আল-ফজল, রবওয়াহ ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই সংখ্যায় লন্ডন মিশনের প্রেস সেক্রেটারী খাজা নযীর আহমদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম আফ্রিকার এসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে দেখা করা হয়েছে যে সব দেশে মীর্জা নাসের আহমদ সফর করে এসেছিলেন। প্রেস সেক্রেটারী লিখেন ঃ "পশ্চিম আফ্রিকার যে ছয়টি রাষ্ট্রের দূতদের নিজেদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করার জন্য সম্মানিত জনাব মীর্জা বশীর আহমদ খান রফীক (ইমাম, মসজিদে ফজল, লন্ডন) তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে লন্ডনে নিযুক্ত গানার মাননীয় রাষ্ট্রদূত এইচ, ভি, এইচ সিকীর সাথে সাক্ষ্যাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন পাকিস্তানী দূতাবাসের সিনিয়র সেক্রেটারী জনাব

চৌধুরী হেদায়েতুল্লাহ্ ও অধম খাজা নযীর আহমদ, প্রেস সেক্রেটারী মসজিদে ফজল, লন্ডন। - (আল-ফজল, রবওয়াহ, ২৮শে জুন, ১৯৭২)

আফ্রিকায় এহেন তৎপরতার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সম্পর্কে তখন ধারনা করা যায় যখন দেখা যায় যে আফ্রিকায় বিশ্ব ইহুদী সংস্থা (WZO) এবং এর সমস্ত এজেন্সী এমনকি ইসরাইলী "জিউস এজেন্সী" স্বয়ং তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার ক্রীড়নকরূপে কাদিয়ানীদের ব্যবহার করছে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে। আরবদের জন্য যা নিতান্ত উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় যে সব আফ্রিকী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সে দেশের সরকার বিরোধী শিবিরের সাথে মিলিত হয়ে কাদিয়ানীরা সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

লক্ষ কোটি টাকার পুঁজি

আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহে এসব তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার পুঁজি কোত্থেকে আসে? এটি একটি দূর্বোধ্য ধাঁধাঁ। যে ধাঁধাঁ আরব বিশ্বের স্বনামধন্য লেখক চিন্তাবিদ মোহাম্মদ মাহমুদ সাওওয়াফকেও চিন্তায় ফেলে দিতে সক্ষম হয়। তিনি তার সাম্প্রতিক বই "ইসলামী জাগরণ প্রতিরোধে সাম্রাজ্যবাদের নীল নক্শা"-এর ২৫৩ পৃষ্টায় লিখেছেন ঃ এই কাফের জামাতটি সর্বদাই পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এসেছে। সদা-সর্বদা ইসলামের দুশমনি করাই তাদের মূল কাজ। বিশেষতঃ আফ্রিকার মাটিতে তাদের জঘন্য তৎপরতা সর্বাপেক্ষা জোরদার। পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা থেকে এ প্রসংগে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। এর সাথে কাজ্জাব মীর্জা গোলাম আহমদের একটি বইও রয়েছে। সে নিজেকে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী বলে দাবী করে থাকে। বইটির নাম "শুভবার্তার পায়রা"। কুফর ও গোমরাহীতে পূর্ণ এই বইটি সে এলাকায় বিপুল পরিমাণে বন্টন করা হয়েছে।

মুসলমানদের একজন বড় দাওয়াত সৈনিক ও ধর্মীয় নেতা লিখিত এই পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, "এখানে কাদিয়ানীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা আমার ও সকল মুসলমানের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে

উঠছে। ওরা এতদঞ্চলে বেহিসাব অর্থ ছড়াচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ অর্থ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার মিশনারীগুলোর পক্ষ থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্রে আমি খবর পেয়েছি যে, হাবশার আদ্দিস আবাবায় কর্মরত একটি কাদিয়ানী মিশনের বার্ষিক বাজেট ৩৫ মিলিয়ন ডলার। আর এই মিশনটি কেবল ইসলামের শত্রুতার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লামা সওয়াফ তার বইয়ে যে মিশনটির বার্ষিক বাজেট ৩৫ মিলিয়ন ডলার উল্লেখ করেছেন বিগত সময়ে আদ্দিস আবাবাসহ গোটা হাবশা অঞ্চলে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের জন্য এর ভূমিকা না জানি কতই জঘণ্য ছিল? এ রহস্য উদঘাটিত হলে জুবিলী ফান্ড স্কীমের জন্য মির্জা নাসের আহমদের দেড় কোটি টাকার আবেদন এর প্রেক্ষিতে নয় কোটি টাকা জমা হওয়ার সম্ভাব্যতার গোলক ধাঁধাঁ উন্মোচিত হয়ে যেতে পারে। যে কাহিনী তিনি নিজেই তার অনুসারীদের (১৯৭৪ সালের ৫ই মার্চের আল-ফজল, রবওয়াহ) শুনিয়েছেন। উল্লেখিত বর্ণনায় শুধু একটি কথাই পরিস্কার হয়ে যায় যে, আজ পর্যন্ত আফ্রিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাঞ্জা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়ার এবং বিশ্ব ইহুদী চক্রের ষড়যন্ত্রে নিপতিত থাকার বহু কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো মুসলমান পরিচয়দানকারী জাতীয় গাদ্দার কাদিয়ানীদের সীমাহীন জঘণ্য অপতৎপরতা।

উপমহাদেশে মুসলমানদের উন্নয়ন ও কল্যাণকামী সংগঠনসমূহ বনাম কাদিয়ানীদের তৎপরতা

এখন আমরা উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, মুসলমানদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যাপৃত সংগঠনসমূহ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করা, একটি কাদিয়ানী রাষ্ট্র কায়েম, অগত্যা উপ-মহাদেশ পূনঃ একত্রীকরণ সম্পর্কিত জঘণ্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও মারাত্মক পরিকল্পনা প্রসংগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের পুর্নজাগরণের লক্ষ্যে যতগুলো আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখিত বিবরণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে কাদিয়ানীরা কেবল ইংরেজদের সন্তুষ্টি

বিধানের জন্যেই এগুলোর বিরোধিতা করেনি বরং এ ধরনের প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষতি সাধনের জন্য কাদিয়ানীরা ইংরেজদের সপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, গোপন তথ্য পাচার করে, আন্দোলন গুলোর সর্বনাশ করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। জিহাদ ও ইংরেজ সাম্রাজ্য তাদের প্রশ্নে ভারত ও বহির্বিশ্বে কাদিয়ানীদের কর্মতৎপরতার বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। একদিকে যেমন এসব গোয়েন্দা তৎপরতা আরব এবং মুসলিম বিশ্বে চালু থেকেছে অপরদিকে পাক-ভারতীয় উলামায়ে কেরাম যখন ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' সাব্যস্ত করে জুমার নামায ইত্যাদি বিষয়ে মত প্রকাশ করলেন তখন মির্জা সাহেব এসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে ইংরেজ কর্মকর্তাদের নামে পত্র ছাড়লেন। যাতে তিনি ইংরেজ সরকারকে একটি পলিসি বাতলে দিয়েছিলেন, যাতে করে জুমার মতো একটি পবিত্র দিবসকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা যায়। ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণাকারী উলামায়ে কেরামকে গালাগাল করে তিনি এ পত্র বা বিজ্ঞাপন বৃটেনে প্রেরণ করেন। - (তাবলীগ রেসালত, খঃ ৫/৮ প্রচারপত্র সংগ্রহ, ফারুক প্রেস, কাদিয়ান)

অপর একটি প্রচারপত্র (বিঃ দ্রঃ) সরকারের সমীপে মীর্জা সাহেব তার এ ধরনের আরেকটি গোয়েন্দা তৎপরতার কথা অত্যন্ত গর্বভরে পেশ করেছেন। সে বলে, আমাদের প্রতিবেদনে এমন সব অজ্ঞ মুসলমানের নাম ঠিকানা আমরা উল্লেখ করেছি যারা তাদের মনের গভীরে ইংরেজ রাজ্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং ভারতবর্ষকে দারুল হরব বলে বিশ্বাস করে। যদিও এরা ততটা সচেতন নয় তথাপি খারাপ মুসলমানদের একটা তালিকা ইংরেজ বাহাদুরের সামনে আমরা পেশ করে দিয়েছি যা অন্য সময় কাজে লাগতে পারে। - (তাবলীগ রেসালত খঃ ৫, পৃঃ ১১)

মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত আন্দোলনগুলোর সাথে গাদ্দারী করার উদাহরণস্বরূপ আঞ্জুমানে ইসলামীয়া, লাহোরের সেই স্মারক লিপিটির উল্লেখ করা যায়, যেটি মুসলমানদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলনের প্রসংগে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মুসলমানদের এসব দাবী

দাওয়ার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন মীর্জা সাহেব। সে এ ধরনের তৎপরতার নিন্দা করে বলেছিল যে, ইংরেজদের অন্তরে বিশ্বস্ততার ছাপ অংকিত করা প্রয়োজন। আঞ্জুমানে ইসলামীয়ার উচিৎ এ ধরনের তৎপরতা ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের উলামাদের নিকট থেকে এমন সব ফতোয়া সংগ্রহ করা যেগুলোতে আমাদের মুরুব্বী ও অনুগ্রহকারী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিপক্ষে সুস্পষ্ট রায় থাকবে। জিহাদ নিষিদ্ধ করে লিখিত ফতোয়া উলামাদের সীল স্বাক্ষরসহ "মকতুবে উলামায়ে হিন্দ" নামে বই আকারে প্রকাশ করাও একান্ত প্রয়োজন। - (ইসলামী আঞ্জুমানের প্রতি আকুল আবেদন, বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খণ্ড, সফীরে হিন্দ প্রেস, অমৃতসর)

১৯০৬ সালে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লীগের লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। শুধুমাত্র এ কারণেই মীর্জা সাহেব মুসলিম লীগে কেবল যোগ দিতেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেনি বরং রীতিমত এর নিন্দা করে। তার দুশ্চিন্তা ছিল যে, আগামী দিন এ লীগই আবার ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারে। – (সরকারের মনযোগ দেয়া উচিত, কৃত-মীর্জা গোলাম আহমদ এবং সীরাতে মসীহ মওউদ কৃত-মীর্জা বশীরুদ্দীন, পৃঃ ৪৩-৪৪)

একই মনোবৃত্তি তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীদের মাঝেও বিরাজিত ছিল যেমন, ১৯৩১ সালে কাশ্মীর কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং সর্বশেষ মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের গোপন তৎপরতায় এর ব্যর্থ হওয়া। তাছাড়া আল্লামা ইকবালের এ কমিটি থেকে অব্যাহতি গ্রহণ পূর্বক কমিটি ভেঙ্গে দেয়া, যার আলোচনা সামনে আসবে। এ সবই এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। বিশ্বস্তসূত্রে আল্লামা ইকবালের এ কথা জানাও হয়ে গিয়েছিলো যে ঃ কাশ্মীর কমিটির সভাপতি (মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমূদ) এবং সেক্রেটারী (আবদুর রহীম) এরা দু'জনই ভাইসরয় এবং অন্যান্য উর্ধতন বৃটিশ কর্মকর্তাদের নিকট গোপন তথ্য পাচারের মতো 'সৎ কর্মটি'ও নিয়মিত করে থাকেন। – (পাঞ্জাবের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ, পৃঃ ২১০, আবদুল্লাহ্ মালিক)

এসব গোয়েন্দা তৎপরতা কাদিয়ানীদের "পবিত্র কর্মকান্ডে"র এতই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, শুধুমাত্র উপমহাদেশেই নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বে তখনকার সময় থেকে আজ পর্যন্ত গোয়েন্দাবৃত্তির জাল বিস্তৃত রয়েছে। আজ পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ ব্যাপী কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলাম বিরোধী চক্রের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক হিসেবে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত পরিচালিত এ সব ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা ও এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রসংগ সংক্ষিপ্তভাবে সামনে আলোচিত হবে। মোটকথা, আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ মুসলমানের জাগরণ সম্পর্কিত প্রতিটি প্রয়াসের কদিয়ানীরা বিরোধিতা করতো। কারণ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণকে কাদিয়ানীরা খুবই ভয় করতো। কেননা মুসলমানরা সজাগ হলে, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে কাদিয়ানীদের মিশন ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাসূলে আরাবী (সঃ) উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ভারতীয় নবীর জন্য অপর একটি উম্মত সৃষ্টির প্রয়াসও বানচাল হয়ে যাবে। - (হরফে ইকবাল, পৃঃ ১৪১-১৪২)

মুসলমানদের সাথে দ্বীনী, সামাজিক ও পারস্পরিক সকল সম্পর্ককে সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্তকারী ধর্মে উপমহাদেশের মুসলমানদের অপরাপর আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগই আর কতটুকু ছিল? জনৈক কাদিয়ানী বলেছিলো যে, মসীহ মওউদের উদ্দেশ্য যখন কেবলই ইসলাম প্রচার তাহলে অন্যান্য মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনের সাথে আমাদের সহযোগিতা করাই তো উচিৎ। তখন সাইয়্যেদ সরওয়ার শাহ্ কাদিয়ানী কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত 'আল-ফজল'-এর ২য় খণ্ড, ৭২ পৃঃ তাং ২০শে জানুয়ারী, ১৯১৫ সালে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ প্রস্তাবের খণ্ডন করে শপথ করে বলে যে, হযরত মসীহ মওউদের জীবনে অ-আহমদীদের সাথে কী সম্পর্ক ছিল? তিনি অ-কাদিয়ানীদের নিকট হতে কোনদিনও চাঁদা সংগ্রহ করেননি। এই যদি আহমদী মতবাদ হতো তাহলে মসীহ এর যুগে আরো যত ধরনের আন্দোলন উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে এ সবের প্রতিই মসীহ মওউদের সমর্থন ও এতে আনন্দ প্রকাশ করতে হতো। তিনি এগুলোর

জন্য চাঁদা দিতেন। কিন্তু জীবনে কোনদিন তিনি এমন করেননি। কোন মুসলমান এতিম বা বিধবার জন্য চাঁদা করা হলে মীর্জা বশীরুদ্দীন বলতেন, মুসলমানদের সাথে মিশে চাঁদা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। - ('আল-ফজল', কাদিয়ান, খণ্ড ঃ ১০, পৃঃ ৪৫, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২২)

অখণ্ড ভারত

হিন্দু এবং কাদিয়ানী উভয়েরই পারস্পরিক দায়বদ্ধতার অনুভূতি

রাজনীতির ক্ষেত্রে কাদিয়ানী ও ইংরেজদের সখ্যতা তো বরাবরই ছিলো কিন্তু আযাদী সংগ্রামের এক পর্যায়ে যখন উপমহাদেশের উপর থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাঁধন ঢিলে হয়ে এলো তখন মীর্জা মাহমুদ (যিনি তখন মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দ্বিতীয় খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলো) কংগ্রেসের সাথে দহরম মহরম শুরু করে। অপরদিকে হিন্দু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরাও কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীদের তাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে উপযোগী বলে মনে করে নেয়। এবং মুসলিম সমাজের পঞ্চম বাহিনীরূপে কাদিয়ানীদের সহায়তা ও তাদের পক্ষে ওকালতী শুরু করে দেয়।

পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু, যিনি নিজেকে একজন স্যোশ্যালিষ্ট ও নাস্তিক বলে প্রকাশ্যে দাবী করতেন, তিনিও এমন একটি ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করতে এগিয়ে এলেন যে ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভূক্ত বলে প্রমাণ করতে প্রাণপাত করে থাকে। নেহেরুর মতো ব্যক্তির সাথে কাদিয়ানীদের সম্পর্কও গোপন থাকেনি, নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় "মুসলমান ও আহমদইজম" শীর্ষক ধারাবাহিক তিনটি প্রবন্ধ লিখেন এবং আল্লামা ডঃ ইকবালের সাথে এ বিষয়ে বিতর্কের পর্যায়েও গিয়ে পৌছেন। এ সব বিতর্ক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এ সবের পুনরুল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন।

মোটকথা, ইকবাল নেহেরুকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ সব লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করায় মুসলমানের জন্য তো উপকারী হতে পারেই না, এরা

আপনাকেও কোন সহযোগিতা করতে পারবে না। এ কথা শোনার পর পন্ডিত নেহেরু নীরবতা অবলম্বন করেন। এরপর নেহেরু যখন প্রথমবারের মত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা হিসেবে লন্ডন গমন করেন তখন দেশে ফিরে এসে তিনি এ মন্তব্য করেন যে, যতদিন পর্যন্ত এ দেশে কাদিয়ানীরা তৎপর থাকবে ততদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হওয়া খুবই দুরূহ। কাদিয়ানীদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নেহেরুর সামনে উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্তই হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাঙ্গন ও অনৈক্য সৃষ্টির ব্যাপারে কাদিয়ানীদেরকেই সর্বাপেক্ষা যুতসই সম্প্রদায় বলে মনে করতো। তবে নেহেরুর ধারণা পাল্টে গেলেও গোটা হিন্দু জাতি এখনো অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে নিজেদের বিশ্বস্ত গোয়েন্দা চক্র বলে মনে করে থাকে। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যও হিন্দুরা কাদিয়ানীদেরই ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করে আসছে। যখন কাদিয়ানী ও হিন্দুদের পরস্পরের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি উভয়েরই বুঝে এলো এবং তার পাশাপাশি ইংরেজ প্রভুদেরও তল্পী তল্পা গুটিয়ে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো বলে মনে হলো তখন হঠাৎ করেই কাদিয়ান হয়ে উঠলো হিন্দুবাদী তৎপরতার কেন্দ্রস্থল। কাদিয়ানীদের মুখপত্র "পয়গামে সুলেহ" লাহোর, ৩রা জুন, ১৯৩৯ সংখ্যার উদ্ধৃতি অনুসারে ২৯শে মে ১৯৩৬ যখন পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু লাহোরে এলেন তখন কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীরা তাদের খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমূদের নির্দেশে এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌র ভাই চৌধুরী আসাদুল্লাহ খানের (সদস্য পাঞ্জাব কাউন্সিল)-এর নেতৃত্বে তার উষ্ণ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে। এর পর থেকেই কাদিয়ানী-কংগ্রেস সম্পর্ক নতুন ভাবে পাকা পোক্ত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে।

পবিত্র মক্কার উৎসমূল থেকে উম্মতের প্রাণ প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে, গোটা মুসলিম জাতিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করার যে কর্মটি কাদিয়ানওয়ালারা করেছে এতে হিন্দুদের চেয়ে বেশী আনন্দিত আর কারা হবে? তাছাড়া ইহুদীরা যেভাবে বায়তুল মোকাদ্দেসকে বাদ দিয়ে "সামাবিয়্যা"কে তাদের কেবলা বানিয়ে নিয়েছে এমনিভাবে

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তন করে তাদের রুখ মক্কা থেকে কাদিয়ানের দিকে ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। আর এহেন অপকর্মের প্রশংসায় প্রখ্যাত হিন্দু নেতা ডঃ শংকর দাস “বন্দেমা তরমে” লিখেছেন ঃ “ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সামনে যদি কোন আশার আলো থেকে থাকে তবে সেটা নিঃসন্দেহে আহমদী আন্দোলন। এটি একটি মহাবাস্তব যে মুসলমানেরা যতই আহমদী মতবাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে, ততই তারা কাদিয়ানকে মক্কা বলে ভাবতে থাকবে। আরব্য সভ্যতা ও প্যান-ইসলামিজম থেকে মুসলমানদের মুক্ত করতে আহমদী আন্দোলনের জুড়ি নেই। একজন হিন্দু মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে যেমন তার শ্রদ্ধা রামকৃষ্ণ, গীতা ও রামায়ণ থেকে উঠে গিয়ে সে শ্রদ্ধা হযরত মুহাম্মদ (সঃ), কোরআন মজীদ এবং আরব ভূমির প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনিভাবে কোন মুসলমান যখন আহমদী হয়ে যায় তখন তার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি তার ভক্তি কমে আসে এবং পূর্বে যেমন সে আরব ভূমিকে রসূলের পূণ্যভূমি বলে মনে করতো তখন সে কাদিয়ানকেই তেমন মনে করতে থাকে। একজন আহমদী সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, আত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সে কাদিয়ানের দিকে ফিরবে। অতএব কংগ্রেস ও হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট এতটুকুই আশা করে যে তারা হরদুয়ারা (হিন্দুদের তীর্থস্থান) যাত্রায় শরীক না হলেও অন্ততঃ তারা কাদিয়ান যাত্রা করুক”। - (গান্ধীজির পত্রিকা “বন্দে মাতরম” ২২শে এপ্রিল, ১৯৩২ ইং সূত্র, কাদিয়ানী মাযহাব)

‘পয়গামে সুলেহ’ পত্রিকার খঃ ২, পৃঃ ৬৯, ২১ এপ্রিল ১৯৪৫ সংখ্যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হিন্দু পত্রপত্রিকা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ সব চিন্তা ভাবনা ভারতীয় মুসলমানদের পরিস্কার ভাষায় বলে দিচ্ছে যে বিগত দিনগুলোতে কাদিয়ানের হিটলার (মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ) ও জাওয়াহের ‘(জওয়াহের লাল নেহেরু)-এর মধ্যে কানকথা হচ্ছিলো যে কাদিয়ানের খলীফা মুসলমানের শক্তিকে খর্ব করার ব্যাপারে কী ভূমিকা পালন করবে আর এ কাজের বিনিময়ে কংগ্রেস তাকে কি দেবে?”

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার কারণ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব মুহূর্তটি পর্যন্ত কাদিয়ানীরা যেভাবে প্রাণপণে এর বিরোধিতা করেছে যার প্রমাণ সামনের উদ্ধৃতি গুলোতে মিলবে। এ ব্যাপারে তো কাদিয়ানীদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল যে, ইংরেজদের স্নেহছায়াকে তারা আল্লাহর রহমত বলে দাবী করতো যেন কোনদিন ভারতীয়দের মাথার উপর থেকে তা সরে না যায়। তথাপি বাস্তবে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য ভারত দিগন্তে অস্ত যাওয়া শুরু করলো তখন তাদের পূর্ণ প্রয়াস ছিল যাতে করে ইংরেজ উত্তর ভারতে কোন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম না হতে পারে। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মত ছিল অখণ্ড ভারতের পক্ষে। আর এ মনোভাবের মৌলিক কারণ ছিল যে, ইসলাম বিরোধী এই ধর্মমত প্রচারের জন্য যে দেশ কাদিয়ানীদের প্রয়োজন তা একটি অমুসলিম রাষ্ট্র হলে খুবই সুবিধা হয়। তাছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের শিকার করাও খুব আরামের কাজ। অন্তত মুসলিম দেশ হলেও চলে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হলে কাদিয়ানীদের জন্য হয় খুবই বিপদ। কাফের বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বসে সরকারের পূর্ণ আনুগত্যের পথ ধরে মুসলমানদের ঈমান বিনষ্টকারীদের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম একটি ইসলামী রাষ্ট্র যেন জঙ্গলাকীর্ণ একটি ক্ষেত, যেখানে সহজে চাষ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। আর এ ধরণের মনোভাবের কিছুটা আন্দাজ নিম্নোক্ত কথাগুলো থেকে করা যায়। মির্জা সাহেব বলে ঃ "আমরা যদি এখন (বৃটিশ রাজত্ব) থেকে বের হয়ে পড়ি তাহলে মক্কা শরীফ বা কনস্টান্টিনোপলেও আমাদের জীবন কাটানো দায় হবে"। - (মলফুজাতে আহমদিয়া খঃ- ১ পৃঃ- ১৪৬)

তবলীগে রেসালত - (খঃ- ৬, পৃঃ ৬৯)-এ সে লিখে ঃ

"আমি আমার কাজ মক্কা মদীনা, রোম, শাম, ইরান, বা কাবুল কোথাও এমন সুন্দর ভাবে চালাতে পারবোনা যেমন ভাবে এই ইংরেজদের শাসনের আওতায় এখানে চালিয়ে যাচ্ছি। যাদের সাম্রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য আমি দোয়া করে থাকি।"

"এ কথাটি ভেবে দেখ যদি তোমরা ইংরেজ সরকারের ছায়া থেকে বের হয়ে যাও তাহলে আর কোথায় যাবে? প্রতিটি ইসলামী জনপদ

"এ কথাটি ভেবে দেখ যদি তোমরা ইংরেজ সরকারের ছায়া থেকে বের হয়ে যাও তাহলে আর কোথায় যাবে? প্রতিটি ইসলামী জনপদ তোমাদের হত্যা করার জন্য দাঁতে দাঁত ঘসছে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তোমরা কাফের এবং মুরতাদ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছ।" - (তবলীগে রেসালত খ- ১০ পৃ- ১৩২)

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪এর 'আল ফজল' এ মুসলমানদের তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, "কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই আমাদের মতবাদ প্রচারের খোলাখুলি অনুমতি পাওয়া যাবে না।" আমাদের উদ্দেশ্য পুর্ণ হওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা। এ ধরনের দেশে আমাদের পরিণতি হবে ইরানে মীর্জা আলী মোহাম্মদ বাব, তুরস্কে বাহাউল্লাহ এবং আফগানিস্তানে কাদিয়ানী প্রচারকদের পরিণতির মতো।" এক ব্যক্তি মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদকে কাদিয়ানীদের বৃটিশ প্রেস তাদের জন্য প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল সহায়তা এমনকি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে সৈন্য ভর্তির মতো ভূমিকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে তার মসিহ মওউদের বরাত দিয়ে বলে ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়া জমাত রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিরক্ষা প্রাচীর (বৃটিশ সাম্রাজ্য) দাঁড় করে রাখা প্রয়োজন। যাতে করে শাসন ক্ষমতা এমন কোন শক্তির হাতে না চলে যেতে পারে, যা আহমদীয়াদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর (মুসলিম শক্তি) হবে।" - (আল ফজল কাদিয়ান, ৩রা জানুয়ারী ১৯৪৫)।

এ সবই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতার মূল কারণ।

ভারত বিভাগের বিরোধী মুসলমান

এতে সন্দেহ নেই যে আহমদীয়রা ছাড়া বেশ কিছু মুসলমানও ভারত বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু উপরোল্লিখিত কথায় প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আহমদীয়দের বিরোধিতা ও অন্যান্য মুসলমানের বিরোধিতার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়ে গেছে। মুসলমানের বিরোধিতা ছিল মুসলমানদেরই স্বার্থে। যে সব মুসলিম নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন তারা তাদের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে এতে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থহানীর আশংকা রয়েছে – অপরদিকে পাকিস্তান

পন্থী মুসলমানরাও তাদের যুক্তি পেশ করেছেন এই বলে যে, এতে সমস্ত মুসলমানদেরই লাভ রয়েছে। মোটকথা, উভয় পক্ষের সামনে মুসলিম স্বার্থই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কর্মপন্থা ভিন্ন ছিল, যা রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে এ ভিন্ন মত হয়ে থাকে। যারা বিরোধিতা করেছেন তারা এলহাম বা ওহীর দাবীদার ছিলেন না। তাদের যুক্তিকে তারা "আল্লাহর ইচ্ছা" বা তথাকথিত কোন নবীর নবুওয়তের দাবী বলেও আখ্যায়িত করেননি। এদের উভয় দলেরই ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামের সাম্য ও ন্যায় বিচারের নীতির প্রতি অবিচল আস্থা ছিল। তারা খেলাফতে রাশেদার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলমানের জন্যই তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান যখন হয়েই গেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীরাও এই নবজাতক রাষ্ট্রটির স্থায়িত্ব, সুখ সমৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ নিরাপদ অবস্থার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন। তবে আহমদী জমাতের ভূমিকা ছিল এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কেবল রাজনৈতিক ভাবেই অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা ছিলনা, ধর্মীয়ভাবেও তারা চাইতো অখণ্ড ভারত। মীর্জা মাহমুদ বলতো ঃ আল্লাহ তালার ইচ্ছা ভারতকে অখণ্ড রাখা। মীর্জা গোলাম আহ্মদের নবুওয়তের দাবীও এটাই। এমনি ভাবে তারা অখণ্ড ভারতের কল্পনাকেই এলহাম ও আল্লাহর ইচ্ছার মর্যাদা দিয়ে প্রতিটি কাদিয়ানীকে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য করেছে। আর এ পর্যন্ত যত লোক অখণ্ড ভারতের বিরোধিতা করেছে, তারা সবাই যেন আল্লাহর ইচ্ছার বিপক্ষে তৎপর ছিল।

আহমদীদের নিকট অখণ্ড ভারত এজন্যই অপরিহার্য ছিল, কেননা তারা নিজেদের মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন একটি সম্প্রদায় বলে মনে করে। যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিপক্ষে থেকে তারা অমুসলিম শক্তির সহায়তাকেই তাদের স্বার্থরক্ষার উপায় বলে মনে করে। আজো তারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করছে এবং অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা পূর্বের মতোই সচেষ্ট। কেননা, সেক্যুলার ভারতকে তারা তাদের মিশন পরিচালনার জন্য বেশী সুবিধাজনক ও নিরাপদ বলে মনে করে।

আর মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী এ ধরনের কল্পনাকে পবিত্রতার পোষাকও পরিয়ে রেখেছে।

অতঃপর ৩রা এপ্রিল ১৯৪৭ সালে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের ভাতিজার বিয়ের সময় রাবওয়া'র প্রাক্তন খলিফা মির্জা বশিরুদ্দীন মাহমুদ তার একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে। এবং এ স্বপ্নটির তাবীর বা ব্যাখ্যা মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের আলোকে তুলে ধরে। এ সময় চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান উপস্থিত ছিলো।

সে বলেছিলো ঃ মসীহ মাওউদ (মির্জা গোলাম আহ্‌মদ) এর সাথে সম্পৃক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রতি আমার যতদূর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তাছাড়া মসীহ মওউদ (মির্জা গোলাম আহ্‌মদ) এর নবুওয়াত দ্বারা আল্লাহ তালার যে উদ্দেশ্য রয়েছে, এর উপর আমি যতটুক চিন্তা গবেষণা করেছি, তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, হিন্দুস্থানে আমাদের অন্য সকল সম্প্রদায়ের সাথে মিলে মিশে থাকতে হবে এবং হিন্দু ও খৃষ্টানদের সাথে অংশীদারের মতো হতে হবে।

বাস্তবিকই হিন্দুস্তানের মত শক্তিশালী কর্মক্ষেত্র যে সম্প্রদায়ের ভাগ্যে জুটে তার সাফল্যের ব্যাপারে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আর আল্লাহ্ তালা যেহেতু আহমদী মতাদর্শের জন্য হিন্দুস্তানের মত এত বৃহৎ একটি কর্মক্ষেত্র দান করেছেন, অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এ ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিণতিতে এ কথাই আশা করা যায় যে, সারা ভারতবর্ষকে আল্লাহ্ পাক একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করতে চান। এবং সকলের গলায়ই আহমদী মতাদর্শের হার পরাতে চান। সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে করে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ মিটে যায় আর অন্যান্য সকল ধর্মমত ও আদর্শ মিলে মিশে দুধ চিনির মত একাকার হয়ে পড়ে। এতে মাতৃভূমি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। এ কাজটি যদিও অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এর ফলাফল খুবই বিরাট। আল্লাহ তা'লা চান যে এদেশ ও জাতি ঐক্যবদ্ধ হোক আর এ বৃহৎ এবং ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে আহমদী মতাদর্শ সম্প্রসারিত হোক। এ স্বপ্নে এই ইংগিতও রয়েছে যে (সম্ভাব্য) সাময়িকভাবে যদিও এ ক্ষেত্রে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায় বা স্বল্প সময়ের জন্য দু'টো জাতি দূরে সরে

থাকে কিন্তু এ অবস্থা হবে নিতান্তই সাময়িক। মোট কথা, আমরা চাই অখণ্ড ভারত। এর জন্যই আমাদের সকল প্রয়াস। যে ভূমিতে সকল জাতি ও সম্প্রদায় দুধ চিনির মত একাকার হয়ে যাবে। - (দৈনিক আল-ফজল, কাদিয়ান, ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ ইং)

আমি আগেই বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'লার মর্জি হলো ভারতকে অখণ্ড রাখা। তবে নানা জাতির মধ্যকার সহিংস মনোভাবের দরুণ বাধ্য হয়েই অল্প দিনের জন্য এটিকে খণ্ডিত করতে হলো। এ কথা ভিন্ন যে, আমরাও দেশের বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নিয়েছি যদিও সন্তুষ্টচিত্তে নয়, বাধ্য হয়ে। এখন পুনরায় চেষ্টা চালিয়ে যাব কোন না কোন উপায়ে দেশকে অখণ্ড অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে। - (মিয়া মির্জা মাহমূদ খলীফায়ে রবওয়াহ্, আল-ফজল, ১৭ই মে ১৯৪৭ ইং)

ভ্যাটিকান ষ্টেটের আবদার এবং পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণে বিশ্বাসঘাতকতা

আহমদীয়া সম্প্রদায় দেশ বিভাগের বিরোধী ছিল কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভাগ যখন হয়েই গেলো তখন আহমদীয়রা পাকিস্তানের ক্ষতিসাধনের জন্য আরো একটি মারাত্মক প্রয়াস চালালো। যদ্দরুণ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তান থেকে কেটে ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়। একটু বিস্তারিত বলতে গেলে সে ঘটনাটি বিবৃত করতে হয় ঃ সীমান্ত নির্ধারণ কমিটি যখন তার কাজ করছিলো, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব যুক্তি ও দাবী পেশ করছিলেন, তখন কাদিয়ানীরা বাউন্ডারী কমিশনের সামনে একটি আবেদনপত্র পেশ করার মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের চেয়ে ভিন্ন আরেকটি ভূমিকায় নেমে পড়ে।

কাদিয়ানীদের আবদার ছিল 'কাদিয়ান' নামক স্থানটিকে ভ্যাটিকান ষ্টেট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। আলোচিত আবেদন পত্রে কাদিয়ানীরা তাদের মোট জনসংখ্যা, তাদের ভিন্ন ধর্ম; নিজেদের সেনা শক্তি এর বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণ সহ অন্যান্য সকল তথ্য সবিস্তার উল্লেখ করে। এতে ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, বাউন্ডারী কমিশন তাদের দাবী অনুযায়ী ভ্যাটিক্যান ষ্টেট প্রদান না করলেও তাদের এলাকায়

মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে কাদিয়ানীদের জন্য গুরুদাসপুরের খুবই গুরুত্বপূর্ন অঞ্চলটিকে পাকিস্তান থেকে কেটে ভারতেই যোগ করে দিল। স্মারক লিপিতে আর কিছু হোক না হোক কাশ্মীরকে খন্ডিত করে ভারতে রেখে দেয়ার একটা সুযোগ ভারতের হাতে এসে যায়। এমনি ভাবে কাশ্মীর ভারতের সাথে রয়ে যাওয়ার দূর্ভাগ্য বরণ করে। গণশিক্ষা বিভাগের সাবেক ডাইরেক্টর সৈয়দ মীর নূর মোহাম্মাদ তার দিনলিপি মার্শাল, ল থেকে মার্শাল 'ল পর্যন্ত রচনায় এই ঘটনাটি এ ভাবে উল্লেখ করেনঃ কিন্তু এই কথায় এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এওয়ার্ডের উপর একবার দস্তখত হয়ে যাওয়ার পর ফিরোজপুর জেলার বিষয়টিতে ১৭ থেকে ১৯শে আগষ্টের মধ্যবর্তী সময়টিতে রদবদল সংঘটিত হয়েছে। এবং রেডক্লিফের নিকট থেকে পরিবর্তিত এওয়ার্ড নেয়া হয়েছে।

৮ই আগষ্ট রেডক্লিফ যে এওয়ার্ডে স্বাক্ষর করেন এতে কি গুরুদাসপুরের বিভক্তির উল্লেখ ছিল? না এওয়ার্ডের এ অংশটিতেও মাউন্ট ব্যাটেন পরিবর্তন সাধন করেছিলেন? জনশ্রুতি এটাই আর ফিরোজপুর জেলার ফাইল এ কথারই সায় দেয়। এওয়ার্ডের একাংশে যদি রদবদল সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে এর অন্যান্য অংশের বিষয়টিও উড়িয়ে দেয়া যায় না। পাঞ্জাব সীমান্ত নির্ধারণ কমিটির মুসলিম সদস্যরা যখন রেডক্লিফের সাথে এ বিষয়ে, সর্বশেষ আলাপ আলোচনা করে এলেন তখন তাদের সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট জেলা গুরুদাসপুর অবশ্যই পাকিস্তানের ভাগে আসছে। কিন্তু যখন এওয়ার্ড প্রকাশিত হলো তখন দেখা গেলো যে ফিরোজপুরের কতিপয় মহকুমা যেমন পাকিস্তানকে দেয়া হলোনা ঠিক তেমনি গুরুদাসপুর জেলাও (কেবল শুকুরগড় মহকুমা ছাড়া) পাকিস্তানের ভাগে এলোনা। কমিশনের সামনে কৌসুলীদের বিতর্কের কোন রেকর্ড নেই। এ কথাও বলা কঠিন যে, কমিশনের সামনে কাশ্মীরের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট মহকুমার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিলো কিনা? সম্ভবত হয়নি। কেননা এ দিকটি ছিল কমিশনের বিচার্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। এটাও সম্ভব যে এ দিকটির ব্যাপারে

রেডক্লিফ কিছুই জানতেন না। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন খুব ভালো করেই জানতেন যে পাঠানকোট মহকুমা একটু এদিক সেদিক হলে কোন কোন ধরনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। আর এ কারণেই তিনি কংগ্রেসের সপক্ষে থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার বেঈমানীতে প্রবৃত্ত হলেন। এ কথা সামনে রেখে ভাবতে গেলে, এ বিষয়টি মোটেও অসম্ভব মনে হবে না যে, রেডক্লিফ এসব ব্যাপারে কিছুই টের পাননি। আর পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর এসব কান্ডকারখানা মাউন্ট ব্যাটেন খুব চাতুর্য্যের সাথে চালিয়ে গেছে। গুরুদাসপুর জেলা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে যে, এ ব্যাপারে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানও একটি দুঃখজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তখন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আহমদীয়া জামাতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সম্প্রদায় রূপে উপস্থাপন করেন। (অথচ মুসলিম লীগ তখন মুসলিম সর্বসাধারণের অভিন্ন প্রতিনিধিত্ব করছিলো) আহমদীয়া সম্প্রদায় ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানে মিশে যাওয়ার পক্ষেই ছিল কিন্তু তখন মূলনীতি ছিল এই যে, মুসলমান একদিকে আর অন্য সকল ধর্মাবলম্বী অপরদিকে। তখন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক নিজেদের অমুসলিম বলে প্রকাশ করার অর্থ ছিল মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানো। যদি আহমদীয়রা সেদিন নিজেদের মুসলমানরূপে প্রকাশ করতো তাহলেও গুরুদাসপুরের ভাগ্যে হয়ত এখন যা হয়েছে তা-ই হতো কিন্তু এ ভাবে প্রকাশ্যে নিজেদের অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয়াটা বাস্তবিকই একটি অদ্ভুত ব্যাপারই ছিল। - (দৈনিক মাশরিক, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ইং)

এ প্রসঙ্গে এখন সীমানা নির্ধারণ কমিটির সদস্য জাস্টিস মোহাম্মদ মুনীরের একটি উদ্ধৃতিও লক্ষ্য করুন ঃ "এবার গুরুদাসপুরের কথাই ভেবে দেখুন! এটা কি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা ছিল না? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ জেলায় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল নিতান্তই মামুলি পর্যায়ের কিন্তু পাঠানকোট মহকুমাটি যদি পাকিস্তানে আলাদাভাবে যুক্ত না করে গুরুদাসপুরের অংশরূপে গ্রহণ করা হতো

তাহলে গোটা জেলায়ই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিপুলহারে বৃদ্ধি পেতো।

উপরন্তু মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মহকুমা শুকুরগড়কে বিভক্ত করার প্রয়োজনটা দেখা দিলো কেন? প্রয়োজন যদি ছিলই তবে এলাকার প্রাকৃতিক সীমান্ত রাবীনদী বা এর শাখাটিকে সীমানা রূপে গ্রহণ করা হলো না কেন? এটা না করে শাখানদীটির পশ্চিম দিকে ঐ জায়গাটিকে সীমান্তরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে এ শাখাটি কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। তবে কি কাশ্মীরকে ভারতের সাথে আটকে রাখার কুমতলবেই তখন গুরুদাসপুরকে ভারতে রেখে দেয়া হয়েছিলো? আলোচনার সূত্র ধরেই এখানে আমি অত্যন্ত দুঃখজনক একটি ঘটনার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, এ কথাটি সবসময়ই আমার জন্য ছিল অবোধগম্য যে, আহমদীরা আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যাবস্থা কেন করলো। যদি মুসলিম লীগের ভূমিকার সাথে আহমদীরা একমত না হতে পারতো তবে (অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও) তাদের আলাদা প্রতিনিধি নিয়োগের সম্ভাবনাটা গ্রহণ করে নেয়া যেতো। তারা হয়ত ভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে মুসলিম লীগের ভূমিকাটিকে শক্তি প্রদান করতে চাইতো। কিন্তু তারা যে কাজটি করলো সেটি হলো এই যে, শুকুরগড় এর বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য পরিসংখ্যান ইত্যাদি পেশ করে আহমদীরা এ দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করলো যে, উচ্ছ খাল ও বসন্ত্র খালের মধ্যবর্তী এলাকা যদি ভারতের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে ভীনখাল ও বসন্ত্র খালের মধ্যবর্তী এলাকাটি এমনিতেই ভারতভূক্ত হয়ে যায়, কেন না পূর্বোক্ত খাল দুটোর মধ্যবর্তী এলাকাটি অমুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ। অত সব দলীল যুক্তি সত্ত্বেও এ অঞ্চলটি পাকিস্তানেই এসেছিলো। তবে গুরুদাসপুরের ব্যাপারে আহমদীরাও সময় যে গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি করেছিলো তা আমাদের মাহাফ্যাসাদে ফেলে দেয়।

- (দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৭ই জুলাই, ১৯৬৪ ইং)

এ ঘটনায় সর্বাপেক্ষা আফসোসের বিষয় ছিল এই যে, একদিকে কাদিয়ানীরা রেডক্লিফ কমিশনের সামনে পৃথক রাষ্ট্রের আবেদন পেশ করছিলো অপর দিকে সেই চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানই পাকিস্তানের হয়ে

ওকালতী করছিলেন। যাকে কাদিয়ানী খলিফার একজন বিশ্বস্ত ও নিঃশর্ত অনুসারী হিসেবে কাদিয়ানী সমাজই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যার বিশ্বাস ছিল যে অখণ্ড ভারতেই আল্লাহ্‌র একান্ত ইচ্ছা। মসীহ মওউদের নবুওয়াতেরও এটাই দাবী। এমন একজন লোককে পাকিস্তানের পক্ষে উকীল নির্ধারণ করা যার মনে প্রাণে পাকিস্তানের জন্মের প্রতি অসমর্থন ও ঘৃণা ছিল, এটা কি মস্তবড় একটি বোকামী নয়? আর দেশবিভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতি এত অনীহা আর অশ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ কেইসের ওকালতী গ্রহণ কি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের মোনাফেকের প্রমাণ বহন করে না? যাহোক চৌধুরী সাহেব একদিকে পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারনের ওকালতী করছিলেন আর অপর দিকে তারই পরম মান্যবর নেতা মির্জা মাহমুদ পৃথক 'কাদিয়ান রাষ্ট্র' কায়েমের জন্য স্মারক লিপি পেশ করলেন - এ ধরনের দু'ধারী তরবারীর আঘাতে গুরুদাসপুর জেলার তিনটি মহকুমা কেটে পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সাথে জুড়ে দেয়া হলো। আর এ পথেই রচিত হলো কাশ্মীরের গলায় ভারতীয় শাসনের জিঞ্জির পরানোর নীল নক্‌শা।

রাজনৈতিক অভিলাষ ও পরিকল্পনা: রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতা

এবার আমরা এ প্রশ্নটির পর্যালোচনা করবো যে, দৃশ্যতঃ একটি খাঁটি ধর্মীয় জামাত বলে কথিত সংগঠন এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক অভিলাষ ও তৎপরতা কি?

কাদিয়ানীরা একই সময়ে একাধিক রূপ নিয়ে কাজ করতে পারে। একদিকে ধর্ম প্রচারের ব্যানারে, নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় সংস্থা রূপে নিজেদের প্রকাশ করে অপরদিকে তাদের রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা ও কর্মসূচীও খুবই শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রূপে চালিয়ে যায়। যদি কোথাও সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানেরা তাদের বিকৃতি ও অপতৎপরতার খোজ-খবর নেয় তবে তারা নিজেদেরকে একটি মজলুম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গোটা বিশ্ব বিবেকের করুণা ভিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে চিৎকার জুড়ে দেয়। তখনকার পরিস্থিতিতে লন্ডনে বসে চৌধুরী ফাফরুল্লাহ্ খানের বিলাপ-আলাপ তার গোটা পাশ্চাত্য জগতে এর জন্য ডাক চিৎকার এ টেকনিকেরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

ধর্মীয় নয় নিরেট রাজনৈতিক সংগঠন

ধর্ম ও রাজনীতির দ্বিমুখী অভিনয়ে মূল চেহারা আড়াল হয়ে যায়। আর মূল বিষয়ে অজ্ঞ পৃথিবী মনে করে যে, এ হলো পাকিস্তানের "ধর্মীয় গোড়ামীর"র ফসল সংখ্যালঘু একটি নিরপরাধ সম্প্রদায়কে নিষ্পেষনের বাহানা। কিন্তু মূল ঘটনা ও বাস্তবতা কি? নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি ও পাকিস্তানী রাজনীতিতে এ সম্প্রদায়ের কার্যকরী ভূমিকা থেকে এর একটু সামান্য আন্দাজ সকলেরই করা উচিৎ। ১৯২২ সালে প্রদত্ত এক জুমার খুতবায় মির্জা মাহমূদ আহমদ বলেছিলেন ঃ জানা নেই কখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের হাতে দুনিয়ার দায়িত্বভার সোপর্দ করা হয়, তবে বিশ্বকে সামাল দেয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

- (আল-ফজল, ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ২৯শে মার্চ, ১৯২২)

এর আগে ১৪ই ফেব্রুয়ারী '২২ সালের আল-ফজলে মির্জা মাহমূদ আহমদের এ বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়, "আমরা আহমদী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই"।

১৯৩৫ সালে বলেছেন ঃ " আমাদের বাদশাহী কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের রাস্তা থেকে এ কাঁটা দূর হবে না"। - (আল ফজল, ৮ই জুলাই, ১৯৩৫ ইং)

১৯৪৫ সালে তিনি তার রাজনৈতিক অভিলাষ এভাবে প্রকাশ করেন ঃ "যতদিন পর্যন্ত আহমদী জামাত রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী না হয় ততদিন পর্যন্ত এই দেয়ালটি (ইংরেজ শাসন) টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য"। - (আল-ফজল, কাদিয়ান, ৩রা জানুয়ারী, ৪৫ ইং)

১৯৪৫ এর পর ক্ষমতা লাভের এই অভিলাষ সাধারণ ভাবেই লেখালেখিতে প্রকাশ পেতে থাকে। জাস্টিস মুনীরও তাঁর রিপোর্টের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর শুরু পর্যন্ত আহমদীদের বিভিন্ন লেখায় এ কথা প্রকাশ পায় যে, তারা বৃটিশ সরকারের স্থান দখল করার স্বপ্ন দেখছিলো"। - (পাঞ্জাবের দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ২০৯)

এসব অভিলাষের উপর থেকে ৬৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আহমদী জামাতের প্রথম ইউরোপীয় কনভেনশনে পূর্ণরূপে পর্দা উন্মোচিত হয়।

স্যার জাফরুল্লাহ এ কনভেনশনের উদ্বোধন করেন। দৈনিক জং রাওয়ালপিন্ডি ৪ঠা আগষ্ট সংখ্যা, ৬৫, বর্ষ-৭, সংখ্যা-৩০৯ প্রথম সংস্করণে সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ লন্ডন ৩রা আগষ্ট (জং প্রতিনিধি) আহমদীয়া জামাতের প্রথম ইউরোপীয় কনভেনশন জামাতের লন্ডন মারকাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সমগ্র ইউরোপীয় এলাকার কাদিয়ানী মিশনের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক স্যার জাফরুল্লাহ খান। ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত কনভেনশন চলবে। জামাত এ পর্যন্ত ৭৫ টি রাষ্ট্রে তার মিশন খুলতে সক্ষম হয়েছে। বৃটেনে আহমদী কেন্দ্রের সংখ্যা আঠারো। কনভেনশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা এ কথার উপর জোর দেন যে, আহমদী সম্প্রদায় ক্ষমতায় গেলে বিত্তবানদের উপর যেন অতিরিক্ত করারোপ করা হয়, নতুন করে গোটা সম্পদের পুনবর্ন্টন করা হয়, সাহুকারী এবং সুদপ্রথা বিলোপ করা হয়। মদপানও যেন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

কাদিয়ানীদের ক্ষমতারোহনের পর যে সব পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, কোন অরাজনৈতিক সংগঠন কি এ ধরনের সংস্কার বা সম্ভাবনার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে?

পাকিস্তানে কাদিয়ানী রাজ্যের পরিকল্পনা

৫২ সালের শুরুর দিকে মির্জা মাহমুদ এ ঘোষণা করিয়ে দিয়েছিলেন যে, "আমরা যদি সাহস করি এবং সুসংগঠিত হয়ে পরিশ্রম করি তাহলে ৫২ সালেই বিপ্লব ঘটাতে পারি। (একটু এগিয়ে বলেন) ৫২ সাল পার হতে দেবেন না যখন আহমদী মতাদর্শের ভীতি দুশমনের মনে এমনভাবে অংকিত হয় যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, আহ্মদী মতাদর্শ নিপাত করা সম্ভব নয় এবং তারা বাধ্য হয়ে আহমদী মতাদর্শের কোলে এসে পতিত হয়"। - (আল-ফজল, ১৬ জানুয়ারী, ৫২)

উল্লেখ্য যে, এ ঘোষণাটি রবওয়ায় অনুষ্ঠিত কাদিয়ানী রাজনৈতিক, সামরিক ব্যক্তিত্ব ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে করানো হয়েছিলো। পরামর্শটি ঘোষণা আকারে প্রচারিত হওয়ার ১৫ মাসের

ভেতরই ৫৩ সালে কাদিয়ানীদের তথাকথিত বিপ্লবটি পাঞ্জাবের দাঙ্গা আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

এ প্রসঙ্গে মির্জা নাসের আহমদের ঘোষণাদি, দশ হাজার ঘোড়ার প্রস্তুতি এবং এমনি ধরনের আরো কতিপয় পরিকল্পনার কথা এত অধিক পরিমাণে পত্র পত্রিকায় এসেছিল যে, কারোই অজানা নেই।

রাজনৈতিক অভিলাষ সম্পর্কিত এই ছিল একটি সাধারণ ঝলক। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে কাদিয়ানীদের ক্ষমতা লাভের আগ্রহের কথা নিম্নলিখিত আকারে অতি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

(১) যে কোন উপায়ে দেশের পরিপূর্ণ শাসন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

(২) অন্ততঃ পক্ষে একটি প্রদেশ বা অঞ্চলকে কাদিয়ানী ষ্টেট বা প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে হবে।

(৩) দেশের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, উপায় ও উপকরণকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের অবলম্বন করে নিতে হবে।

(৪) সমস্ত প্রশাসনিক পদগুলো নিজেদের কব্জা করতে হবে।

স্যার জাফরুল্লাহ্ খানের ভূমিকা

এই পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক অভিলাষ অর্জনের সূচনা চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান তার মন্ত্রিত্বের আমলে অত্যন্ত জোরে সোরে করেন। চৌধুরী সাহেব নিতান্ত গর্বের সাথে বলতেন যে, তিনি চীনেই যান আর আমেরিকায় সর্বত্র কাদিয়ানী ধর্মের প্রচার করতে থাকবেন। তিনি তার দলের আমিরকে একচ্ছত্র অধিপতি মনে করতেন। তিনি কাদিয়ানীত্বকে শুধু খোদার লাগানো বৃক্ষই মনে করতেন না, বরং মনে করতেন যে, মির্জা গোলাম আহমদের অস্তিত্বকে বাদ দিলে ইসলামের জীবিত ধর্ম হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না। এসব ধরনের মনোভাব তিনি ঘরোয়া বৈঠকেই শুধু নয়, বরং সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও কাদিয়ানীত্বের প্রচার সমাবেশও প্রকাশ্যে করতেন। - ('আল ফজল', ৩১শে মে, ১৯৫২)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এমন লোকের হাতে যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদটি অর্পণ করা হয়, যার তত্ত্বাবধানে সারা বিশ্বে দূতাবাস

প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজটিও যুক্ত ছিল, তখন শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাব্বীর আহমদ ওসমানী মরহুম তখনকার প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন যে, যদি এহেন গুরুত্বপূর্ণ পদে এ ধরনের লোককে অধিষ্ঠিত করার বিষাক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বিষের পেয়ালা পান করার জন্য তৈরি থাকা উচিত।

কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই উপদেশ কার্যকর হতে পারেনি এবং আমাদেরকে বিষের মাত্র একটি পেয়ালা নয়, একাধিক পেয়ালা পান করতে হয়। উল্লেখিত গুণধর চৌধুরী সাহেব ভারত বিভাগের প্রাক্কালেও নিজের সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহারের মাধ্যমে কাদিয়ানীদের স্বার্থে কাজ করেছেন। কিন্তু বিভক্তির পর এ তৎপরতা অধিকতর বাড়িয়ে দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্বের আশ্রয়ে তিনি বিদেশে কাদিয়ানী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তখন থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত এরা পাকিস্তানের দৌত্য উপকরণের মাধ্যমে নিজেদের ভ্রান্ত প্রচারণার নামে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গোয়েন্দাবৃত্তি ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অর্জন করে যাচ্ছে। এ ধরণের কাদিয়ানী চাটুকারেরা নির্দয়ভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটিয়েছে। যখনই এ ধরনের সংবাদ এসেছে মুসলমানদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ঝড় বয়ে গেছে এবং জাতীয় পরিষদে পর্যন্ত এ সম্পর্কে আওয়াজ তোলা হয়েছে।

১৯৫৩ সালে এমনি ধরনের দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার মত দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে সাওয়াদে আ'জম অন্যান্য দাবী ছাড়াও স্যার জাফরুল্লাহ ও অন্যান্য কাদিয়ানীকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণের উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু আমরা তাদের বৈদেশিক মনিব তথা সাম্রাজ্যবাদের হাতে এতই অসহায় হয়ে পড়েছিলাম যে, শত শত মুসলমানদের শাহাদত বরণের পরেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন স্যার জাফরুল্লাহর অপসারণের ব্যাপারে এই অকাট্য অভিমত প্রকাশ করেন বা করতে বাধ্য হন যে, তিনি এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন না।

এ লোকটিই পররাষ্ট্রমন্ত্রীত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার দুঃখজনক ভূমিকার একটি দিক ইতিমধ্যেই লন্ডনে ৫ই জুন, ৭৪-এ তার প্রেস কনফারেন্সের আকারে প্রকাশ পায়। এই প্রেস কনফারেন্সের খবর পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রেস বিবিসি ও ভারতের আকাশবাণী এই প্রেস কনফারেন্সের শিরোনামে তেমনি প্রচারণা অভিযান চালায়, যেমন অভিযান চালানো হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পূর্বাহ্নে। যা হোক, এটা এ সম্পর্কিত একটা উদাহরণ ছিল যে, প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে এ সব লোকের হাতে দেশ ও জাতির স্বার্থের কতটা ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

সমস্ত বিভাগ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদসমূহ দখল করার পরিকল্পনা

কাদিয়ানীদের মনে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রশাসনিক পদ দখল করার এই অভিযান ও নাজুক পরিস্থিতির বিষয়টি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের রচনাবলী, ঘোষণা ও সরকারী বিভাগসমূহ কব্জা করার পরিকল্পনার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মির্জা মাহমুদ নিজের দলের উদ্দেশ্যে বলেন, "যে পর্যন্ত সমস্ত বিভাগে আমাদের লোক না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা দ্বারা পরোক্ষভাবে কাজ নেয়া যাবে না। যেমন, প্রধান প্রধান বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, রেলওয়ে, ফাইনান্স, কাস্টমস, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি। এই আটটি বড় বড় বিভাগের মাধ্যমে দল নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। আমাদের দলের যুবকরা বিপুল পরিমাণে সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে। ফলে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের সংযোগ অনেক বেশী। এর দ্বারা আমরা আমাদের অধিকার রক্ষার স্বার্থ উদ্ধার করতে পারব না। অন্যান্য বিভাগ শূন্য পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে আপনারা নিজেদের ছেলেদেরকে চাকরি করাবেন, কিন্তু সেই চাকরিটি এভাবে কেন করাবেন না যাতে দল লাভবান হতে পারে? পয়সাও এমনভাবে রোজগার করতে হবে যাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের লোক থাকে এবং সর্বত্র যাতে আমাদের আওয়াজ পৌঁছাতে পারে। - (মির্জা মাহমুদ আহমদের ভাষণ, আল-ফজল, ১১ জানুয়ারী, ১৯৫২)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদের তাৎপর্য ও বিচ্ছিন্নতার দাবীর যুক্তি

এই প্রকৃষ্ট পরিকল্পনা দেখে এবং সরকারী বিভাগগুলোতে কাদিয়ানীদের জনসংখ্যার তুলনায় বহুগুণ বেশী অধিকার করে থাকার দরুণ যথার্থভাবেই মুসলমানরা উদ্বিগ্ন। তাদের অতীত আচরণ পর্যবেক্ষণ করার পর যদি তারা এই দাবী উত্থাপন করতো যে, আগামী দশ বছরে দেশের প্রত্যেক বিভাগেই কাদিয়ানীদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হোক, তাহলেও এ দাবী একান্ত ন্যায়-সংগত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এর চেয়ে স্বল্পতর দাবী করছে যে, কাদিয়ানীদেরকে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হোক। এর যৌক্তিকতার ভিত্তি শুধু এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয় যে, কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে কোন অমুসলমানকে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করা যায় না, বরং এ দাবী এ কারণেও করা হচ্ছে যে, (১) এসব লোক (কাদিয়ানী) বিগত ইংরেজ আমলে মুসলমানদের অসর্তকতার সুযোগে এবং ইংরেজদের অসাধারণ আনুকূল্যের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের নামে মুসলমানদেরই চাকরির কোটা জবর দখল করেছে। (২) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কর্মকর্তাদের অসর্তকতা ও বোধবৈকল্যের সুযোগে এই সামান্য লগিষ্ঠ জনসংখ্যার হার অপেক্ষা বহু গুণ বেশী চাকুরী কব্জা করে নিয়েছে।

(৩) এ দলের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকেরা নিজেদের ধর্মের লোকদেরকে চাকুরী দিয়ে এবং নিজেদের আওতায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অধিকারকে পদদলিত করতে এতটুকু ত্রুটি করেনি।

(৪) এর ফলে দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ—সামরিক, শৈল্পিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, পরিকল্পনা, প্রচার মাধ্যম প্রভৃতির উপর তারাই ইজারাদারী অর্জন করে নিয়েছে এবং দেশের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় অমুসলমানের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে।

(৫) এ গ্রুপের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের প্রভাব বলয়ে নিজেদের পদ ও পদবীকে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার-প্রসারের জন্য ব্যবহার করেছে এবং সে সব দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে যা তাদের

ইমাম ও খলীফা '৫২ সালে তাদেরকে দিয়েছিলেন যে,"কাদিয়ানী কর্মকর্তা কর্মচারীরা নিজ নিজ বিভাগে সংঘবদ্ধভাবে কাদিয়ানীত্বের প্রচার করবে"। - (আল ফজল, জানুয়ারী, ৫২)

(৬) উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল কাদিয়ানী ব্যক্তিবর্গ দেশ ও জাতির স্বার্থের সাথে বরাবরই গাদ্দারী করেছে। এ প্রসঙ্গে এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী ও অন্যান্য কতিপয় জেনারেলের ভূমিকা জাতি ও সরকারের সামনে রয়েছে। পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কর্মকান্ড সবাই অবহিত।

এ সমস্ত কারণে উচ্চ দায়িত্বশীল পদে কাদিয়ানীদের বহাল থাকা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতেই নয়, বরং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বৈষয়িক, সামাজিক, রাজনৈতিক, স্বার্থ রক্ষা এবং দেশ ও জাতির অস্তিত্বের জন্যও আশঙ্কার কারণ।

সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কাদিয়ানী জামাতের রাজনৈতিক সংগঠন পাকিস্তান সরকারের মোকাবেলায় একটি সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নেয়। রাবওয়া এলাকায় নির্ভেজাল কাদিয়ানী জনপদ তৈরি করে তাতেই সে সরকার পদ্ধতির কেন্দ্র গড়ে নেয়। যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থায় জামাতের নেতাকে বলা হয় 'আমীরুল মুমেনীন' যা মুসলমানদের শাসনকর্তার নির্ধারিত পদবী। এই 'আমীরুল মোমেনীনে'র অধীনে রাবওয়ায় কাদিয়ানী ষ্টেটের যথারীতি 'নাজারত' বা মন্ত্রণালয় রয়েছে। যেমন, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক নাজারত, তথ্য ও প্রচার বিষয়ক নাজারত, গণসংযোগ বিষয়ক নাজারত, ধর্ম বিষয়ক নাজারত। এসব নাজারত কোন দেশ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভাগসমূহের মতই কাজ করছে। এই সরকার পদ্ধতিতে কাদিয়ানীদের সেবক নামে একটি সামরিক ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে, এই খোদ্দামুল আহ্‌মদিয়ায় ফুরকান বেটালিয়ন-এর সাবেক সিপাহী ও কর্মকর্তা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আহমদিয়া (কাদিয়ানী) নেতাদের বিশ্বাস, এখন তাদের জন্য পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সাবেক খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমূদ তার বার্ষিক সম্মেলনে ঘোষণা

করেছিল যে, "আমরা কৃতকার্য হব আর তোমরা অপরাধীদের মত আমাদের সামনে উপস্থাপিত। তখন তোমাদের পরিণতিও তাই হবে যা মক্কা বিজয়ের দিন আবু জাহ্ল ও তার দলের হয়েছিল।"

বেলুচিস্তান অধিকারের পরিকল্পনা

তখনো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরও অতিবাহিত হয়নি। ২৩শে জুলাই, ১৯৪৮ তারিখে কাদিয়ানী খলীফা কোয়েটায় এক ভাষণ দেয় যা ১৩ই আগষ্ট '৪৮ তারিখে 'আল ফজল' নামক সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়।

"বৃটিশ বেলুচিস্তান যা এখন পাকী বেলুচিস্তান। তার মোট জনসংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় লাখ। এ জনপদটি যদিও অন্যান্য প্রদেশের জনসংখ্যা অপেক্ষা কম, কিন্তু একটি ইউনিট হিসাবে এর গুরুত্ব অনেক। পৃথিবীতে যেমন ব্যক্তিবর্গের মূল্য হয়ে থাকে, তেমনি ইউনিটেরও মূল্য থাকে। উদাহরণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনষ্টিটিউশন। যেখানে রাজ্যগুলো সিনেট সদস্য নির্বাচন করে। সেখানে এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় হয় না যে, কোন রাজ্যের জনসংখ্যা ১০ কোটি কি এক কোটি। সব রাজ্য থেকেই সমসংখ্যক সদস্য নেয়া হয়। মোটকথা, পাকী বেলুচিস্তানের জনসংখ্যা ৫.৬ লাখ।

আর যদি বেলুচ প্রদেশকে সংযুক্ত করে নেয়া হয়, তাহলে এর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১১ লাখ। কিন্তু যেহেতু এটি একটি ইউনিট কাজেই এর গুরুত্ব বিপুল। অধিক জনসংখ্যাকে কাদিয়ানী বানানো কঠিন, কিন্তু অল্প লোককে কাদিয়ানী বানানো কঠিন নয়। সুতরাং আমাদের দল যদি এদিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে, তবে এ প্রদেশটিকে খুব শীঘ্রই কাদিয়ানী করে নেয়া যেতে পারে। মনে রাখবে, তাবলীগ বা প্রচার ততক্ষণ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের BASE সুদৃঢ় হবে। BASE ভিত্তিমূল মজবুত হলেই তাবলীগ বিস্তার লাভ করে। সুতরাং প্রথমে BASE টাকে মজবুত করে নাও। কোথাও না কোথাও নিজেদের BASE তৈরী করে নাও, তা যে কোন দেশেই হোক। আমরা যদি প্রদেশকে (বেলুচিস্তানকে) কাদিয়ানী বানিয়ে নেই, তাহলে একটি প্রদেশ তো অন্ততঃ এমন হয়ে যাবে, যাকে আমরা নিজের প্রদেশ বলতে পারব। আর এমনটা অতি সহজেই হতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীর

কাদিয়ানী মহোদয়রা যে কাদিয়ানী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে তার ব্যাখ্যাকল্পে তারা প্রথম থেকেই কাশ্মীরকেও একটা উপযুক্ত স্থান বলে মনে করে। এই আগ্রহের কিছু কিছু কারণ 'তারীখে আহমদিয়াত' গ্রন্থের প্রণেতা দোস্ত মোহাম্মদ শাহ্ ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩৪৫-৩৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে –

(ক) কাদিয়ানী প্রদেশটি জম্মু কাশ্মীরের পাশে অবস্থিত যা তাদের পয়গম্বর-এর জন্মস্থান 'দারুল-আমান' মক্কা-মদীনার সমতুল্য বরং সেগুলোর চাইতেও উত্তম বলে সাব্যস্ত করে। - (আল ফজল, ১১, ডিসেম্বর, ৩২, মির্জা মাহমুদের বক্তৃতা ও হাকীকাতুর রু'ইয়া, পৃষ্ঠা ৪৬, মির্জা মাহমুদ)

আর কাদিয়ানীদের ধারণা হল এই যে, মির্জা গোলাম আহমদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাদিয়ান কাদিয়ানীরা অবশ্যই পাবে। তিনি নিজেদের শিশুদেরকে প্রাথমিক পাঠক্রমে এ বিষয়টিই যেন বদ্ধমূল করতে থাকেন—যে, "কাদিয়ান থেকে হিজরতের ব্যাপারটি হবে সাময়িক। শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় আসবে যখন কাদিয়ান অঞ্চল কাদিয়ানী জামাত ফেরত পেয়ে যাবে। - রাহে ঈমান ৯৮ পৃষ্ঠা। শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞানের সংকলন।

কাদিয়ান ও জম্মু-কাশ্মীরের ভৌগলিক সংযোগ বহাল রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে বাউন্ডারী কমিশন বরাবরে কাদিয়ানীদের স্মারকলিপি দেয়ার কারণেই গুরুদাসপুর জেলাকে পাকিস্তান থেকে কেটে দেয়ায় ভারতের কাশ্মীর দখল করার সুযোগ হয়ে যায়।

(খ) কাদিয়ানীদের ধারণা, কাশ্মীরে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কাদিয়ানীদের প্রভাব বেশী। মির্জা মাহমূদের বক্তব্য মতে সেখানে প্রায় আশি হাজার কাদিয়ানী রয়েছে।

(গ) তাদের মসীহে মওউদের বক্তব্য অনুযায়ী কাশ্মীরে প্রথম মসীহ (হযরত ঈসা-আঃ) এর সমাধি অবস্থিত এবং দ্বিতীয় মসীহ অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারীর বিরাট জনসংখ্যা সেখানে বসবাস করছে। সুতরাং যে দেশে দু'জন মসীহের দখল থাকবে সেটি শাসন করার অধিকার শুধুমাত্র কাদিয়ানীদেরই রয়েছে।

(ঘ) মহারাজা রনজিত সিং নওয়াব ইমামুদ্দীনকে গভর্ণর নিয়োগ করে কাশ্মীরে পাঠালে মির্জা গোলাম আহমদের পিতাও তার সাথে ছিল।

(ঙ) মির্জা গোলাম আহমদের ১ম খলীফা হাকীম নুরুদ্দীন তথা ২য় খলীফা মির্জা মাহমুদের শিক্ষক ও শ্বশুর দীর্ঘকাল কাশ্মীরে ছিলেন। যা হোক, একক জনবসতির স্বল্পতার দরুন যেভাবে বেলুচিস্তানের উপরেও তাদের নজর পড়ে, তেমনি প্রত্যেক যুগে কাশ্মীরের উপরেও তাদের নজর। কোন সাধারণ মানবিক সহানুভূতি কিংবা মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছার দরুণ পড়েনি, বরং তা পড়েছে বিগত ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কারণে। এ প্রসংগে কাশ্মীরকে কাদিয়ানী ষ্টেট বানাবার প্রথম যড়যন্ত্র করা হয়।

১৯৩০ সালে বৃটিশ মনিবদের ইঙ্গিতে যা ডঃ ইকবাল মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মুসলমানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ করে দেন। বস্তুতঃ এখান থেকেই আল্লামা ইকবাল তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আঁচ করতে পেরে কঠোরভাবে সে আন্দোলনের মোকাবেলা করেন।

১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ ও ফোরকান বেটালিয়ন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তৃতীয় মাসে অর্থাৎ '৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের দাবী জানায় এবং '৪৮ সালে এ ব্যাপারে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন কাদিয়ানী উম্মত ফোরকান বেটালিয়ন নামের এক প্লাটুন সৈন্য তৈরি করে জম্মু সেক্টরে মোতায়েন করে। ইতি পূর্বেকার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কাদিয়ানীদের পক্ষে মুসলমানদের কোন সংগ্রাম বা বিপদাপদে অংশ গ্রহণের ভাগ্য হয়নি। কিন্তু এবার ওরা কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য ফোরকান বেটালিয়ানের নামে প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে। তখন পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চিফ ছিল জেনারেল ডগলাস গ্রেসী। সে না ছিল কাশ্মীর যুদ্ধের পক্ষে, না পাকিস্তান বাহিনীকে কাশ্মীরে ব্যবহার করতে চাইছিল। বরং এমনও বলা যেতে পারে যে, সে কোন কোন সামরিক খবরাখবর ভারতের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল স্যার অক্সম লেক পর্যন্ত পাচার করতে থাকে। কিন্তু অপর দিকে একই ইংরেজ কমান্ডার ইন চিফ জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি স্বাধীন বাহিনীকে প্রকাশ্য যুদ্ধের

অনুমতি দিয়ে দেয়। এই জেনারেল ডগলাসই সেনাধ্যক্ষ্য হিসাবে ফোরকান বেটালিয়নকে কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ সূচক বাণী পাঠায় যা দোস্ত মোহাম্মদ শাহ্ কাদিয়ানী রচিত 'তারিখে আহমদিয়ত' নামক গ্রন্থের ৬৭৪ পৃষ্ঠায় এবং প্রচার ও দাওয়াত বিষয়ক নাজারত কর্তৃক প্রকাশিত ট্রিকেটে উদ্ধৃত রয়েছে। ফোরকান ফোর্স কাশ্মীরের এ যুদ্ধের সময় কি ধরনের সেবা দান করেছিল এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এই জেহাদের পরে যখন এই সংগঠনের কৃতকর্ম নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং পত্র-পত্রিকায় কাশ্মীরী নেতা আল্লাহ রাক্ষা সাগের ও জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের সেক্রেটারী আফতাব আহমদের বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে, তখন সে সময়কার সামরিক কর্মকর্তা ও সরকারের মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয়। সর্দার আফতাব আহমদের মূল বিবরণটি ছিল এরূপ ঃ "এই ফোরকান বেটালিয়ন যা কিছু করেছে এবং ভারতের যে খেদমত সম্পাদন করেছে; মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর জওয়ানদেরকে যেভাবে ভারতের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে সে জন্য যদি রক্তের অশ্রুও ঝরানো হয়, তবুও কম হবে। যে পরিকল্পনাই তৈরি হত সঙ্গে সঙ্গে তা ভারতের হাতে পৌঁছে যেত, মুজাহেদরা যেখানেই অবস্থান নিত শত্রুরা সাথে সাথে তার খবর পেয়ে যেত, মুজাহেদরা যেখানেই এম্বুশ নিত ভারতের বিমান সেখানেই পৌঁছে যেত।

২রা জানুয়ারী, ১৯৫০ আল-ফজল, ৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম অনুযায়ী মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ এসব বিবৃতি বক্তৃতায় বিলাপ জুড়ে দিলেন, "আমরা যদি গাদ্দারই হতাম, তবে সরকার আমাদেরকে সেখানে বসিয়ে রাখল কেন? আর এভাবে তৎকালীন সরকার এবং জেনারেল গ্রেসীর গাদ্দারীকে ধামাচাপা দেয়ার সিগন্যাল দিয়ে দিলেন। সুতরাং তখন জেনারেল গ্রেসী তাৎক্ষণিকভাবে তাড়াহুড়ো করে ফোরকান ফোর্সকে রহস্যজনকভাবে ভেঙ্গে দিলেন এবং অপর দিকে জেনারেল গ্রেসী নিজে আফতাব আহমদ খানের অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু মির্জা বশীরুদ্দীনের বক্তব্য অনুযায়ী সরকারের চাপের মুখে অভিযোগ অস্পষ্টভাবে খণ্ডন করলেও পরে একমাস যেতে না

যেতেই আবারো অভিযোগ আরোপ করে বসে। - (আল ফজল, ২রা জানুয়ারী, ১৯৫০, পৃঃ ৪,মির্জা বশীরুদ্দীনের বক্তব্য)

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, অভিযোগ যদি ভুল হয়ে থাকত, তবে তাড়াহুড়ো করে ফোরকান ফোর্সকে ভেঙ্গে দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আর যদি অভিযোগ ভুল হত, তবে অভিযোগকারীরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার কিংবা সেনাবাহিনী প্রধান তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করালনা কেন? পাকিস্তানী সেনা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও বিকল্প বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? এসব প্রশ্ন আজো পর্যন্ত উত্তর সাপেক্ষ রয়ে গেছে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের জেনারেল সেক্রেটারী আফতাব আহমদ সাহেবের তখনকার কথাগুলো এখনও সত্যের সন্ধান দান করে যে, কাদিয়ানীরা ৩০ বছর যাবৎ (বর্তমানে ৬৪ বছর যাবৎ) আজাদ কাশ্মীরের পথে বাধা হয়ে রয়েছে।

ফোরকান ফোর্স একটি কাদিয়ানী বেটালিয়ন ও বিকল্প সেনা সংগঠন

ফোরকান ফোর্স তখন ভেঙ্গে দেয়া হলেও রাবওয়া ভিত্তিক বিকল্প সরকার কমকর্তারা মনে করতে থাকে যে, জনসাধারণের স্মৃতি-শক্তি বরাবরই দুর্বল হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে বাস্তবদৃষ্টিও থাকে অতি অল্প। কাজেই পরবর্তীতে অন্য কোন আকারে সেটিকে বহাল রাখা হয়। বর্তমানে এই ফোর্স 'আতফালুল আহমদিয়া' (কাদিয়ানী শিশু), 'খুদ্দামুল আহমদিয়া' (কাদিয়ানী সেবক), 'আনসারুল্লাহ্' (খোদার আনসার), প্রভৃতি আধা সামরিক সংগঠনের আকারে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জাস্টিস মুনীর '৫৩ সালের দাঙ্গার তদন্ত রিপোর্টের ২১১ পৃষ্ঠায় ফোরকান ফোর্সের অস্তিত্ব ছাড়াও কাদিয়ানী ষ্টেটের স্বনির্মিত সচিবালয়ের তথ্য এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

কাদিয়ানীরা একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল দল। তাদের সদর দফতর রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কাদিয়ানী জনপদে। সেখানে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ। যেমন, পররাষ্ট্র বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, প্রচার গণসংযোগ বিভাগ প্রভৃতি। অর্থাৎ, সেসব বিভাগ যা একটি নিয়মিত সচিবালয় সংগঠনের

হয়ে থাকে তা সবই সেখানে আছে। তাদের কাছে স্বেচ্ছা সেবকদের একটি বাহিনীও রয়েছে। তাকে "খোদ্দামে দ্বীন' বলা হয়। ফোরকান বেটালিয়ন তাদের দ্বারাই গঠিত এবং এটি একটি নির্ভেজাল কাদিয়ানী বেটালিয়ন। - (তদন্ত রিপোর্ট, পৃঃ ২১১)

৬৫ সালের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তানী বাহিনী, মুজাহেদীন ও শহীদদের মোকাবেলায় এই চির ধিকৃত ফোরকান ফোর্সকে ৬৬ সালে এভাবে পেশ করা হয়, যখন পাকিস্তান বাহিনীর নির্ভিক মুজাহেদদেরকে পদক দান করা হতে থাকে, তখন 'আল-ফজল'-এ এভাবে ঘোষণা প্রচার করা হয়- "ফোরকান ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে সব কাদিয়ানী ৪৫ দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ৪৮ (যুদ্ধ বিরতির দিন) পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী রশিদ বানিয়ে তাতে সই করে স্থানীয় কাদিয়ানী জামাতের আমীরের স্বাক্ষর করিয়ে মালিক মোহাম্মদ রফিক, সদর দফতর আরবী রাবওয়া বরাবরে পাঠিয়ে দেবে। যে কর্মকর্তাকে এড্রেস করতে হবে সে জায়গাটি খালি রাখতে হবে। এসব রশিদ রাবওয়া থেকে (পদক) রাওয়ালপিন্ডি যাবে, রাওয়ালপিন্ডি থেকে তাদের কাশ্মীর মেডেল রাবওয়ায় আসবে এবং তার সংবাদ আল ফজলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। অতঃপর এসব পদক রাবওয়ায় সেসব কাদিয়ানীকে বিতরণ করা হবে। - (আল ফজল, ২৩শে মার্চ, ১৯৬৬)

৬৫-সালের যুদ্ধে এতীম শিশু এবং বিধবাদের মোকাবেলায় তথাকথিত কাশ্মীর মেডেলের কাহিনী কি ৬৫-সালের শহীদান কিংবা তাদের কোরবানীর প্রতি উপহাস ছিল না?

৬৫-এর মুজাহেদীনের মোকাবেলায় ১৮ বছর পর ফোরকান ফোর্সের কাদিয়ানীদের কাশ্মীর পদক প্রাপ্তির কাহিনী মূলতঃ সেই ভয়াবহ স্কেন্ডেলের উপর থেকে যবনিকা উত্তোলন করা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ। আমরা প্রতিরক্ষা বিভাগের সংবেদনশীলতা ও পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। কাশ্মীর সম্পর্কে ফোরকান ফোর্সের এই ছিল প্রাসঙ্গিক আলোচনা। প্রকৃত কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে দৃশ্যতঃ এই সাধারণ বিষয়গুলোও লক্ষ্যণীয় যে, পাক-

ভারত যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাশ্মীর ও কাদিয়ানের সাথে সংযুক্ত সীমান্তসমূহের প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার সাধারণতঃ কাদিয়ানী জেনারেলদের হাতে থাকে কেন? ৬৫ সালের যুদ্ধের পূর্বে ও তার পরেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে স্যার জাফরুল্লা ও অন্যান্য কাদিয়ানী নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে কাশ্মীর অভিযান এবং তার জন্য যথাযথ সময়-সুযোগের প্রতি ইঙ্গিত দান সংক্রান্ত বার্তা এবং কাশ্মীর বিজয়ের সুসংবাদ কেন দেয়া হচ্ছিল?

- কাদিয়ানীরা ভারত বিভাগকালে মন্ত্রীপরিষদের কাছে পৃথক অধিকার দাবী করে পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল।
- পাকিস্তান একটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির দেশ। এর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে জেহাদের আকীদা প্রাণশক্তির কাজ করে। কিন্তু যে দল জেহাদে বিশ্বাস করে না তারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে নির্বাহী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তার ফলে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। সামাদানী ট্রাইবুনালে কাদিয়ানী সাক্ষী মির্জা আবদুস সামী প্রভৃতির বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে যে, তারা ৭১-এর যুদ্ধকে জেহাদ বলে গন্য করে না।
- পূর্ব পাকিস্তানের পতনে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে নিয়োজিত পদস্থ কাদিয়ানীদের মৌলিক অংশ রয়েছে। তার বহু তথ্য সময় মত পেশ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে ইয়াহইয়া ও মুজিবুর রহমানের মাঝে স্যার জাফরুল্লার টানা পোড়ন অর্থহীন ছিল না।
- কাদিয়ানীদের হিংসা তৎপরতার ফলেই ৫৩ সালে প্রথম বার দেশকে মার্শাল ল'য়ের অভিশাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- কাদিয়ানীরা রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্রে শুধু সক্রীয় অংশ গ্রহণই করেনি, বরং তার ভিত্তিমূলেই ছিল তারা। বিচার বিভাগীয় তদন্তে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সার-সংক্ষেপ

এসব প্রকৃষ্ট প্রমাণাদির বিস্তারিত পাঠ করলে পর কাদিয়ানী মতবাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিই যথাস্থানে পরিপূর্ণ এবং তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে। এসব কারণেই মুসলমানদের সমস্ত সম্প্রদায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাদিয়ানী মতবাদকে ইসলামের বিদ্রোহী এবং এর অনুসারীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত সাব্যস্ত করেছে। এই আন্দোলনের অবস্থা ও পরিণতি এবং প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমস্ত মুসলমানের জানা।

কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার দাবী নতুন নয়। বরং আল্লামা ইকবাল পাকিস্তান সৃষ্টির বহু পূর্বে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে, কাদিয়ানীদের কর্মপন্থা এবং ইসলামী জগত সম্পর্কে তাদের আচরণসমূহ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কাদিয়ানীরা যখন ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারাদিতে পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তখন আবার রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্থির হবে কেন? সুতরাং কাদিয়ানীদেরকে আলাদা করে দেয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। সরকার যদি এই দাবী স্বীকার না করে, তাহলে মুসলমানরা সন্দেহ করতে বাধ্য হবে যে, সরকার এই নতুন ধর্মের পৃথকীকরণে বিলম্ব করছে। - (স্টেটসম্যানকে লেখা চিঠি, ১০ই জুন, ১৯৩৫)

আল্লামা ইকবাল সরকারের কর্মপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করে আরো লিখেছেন, সরকারের জন্য যদি এই দলের সেবা উপকারী হয়ে থাকে তবে তার প্রতিদান দেবার অধিকার সরকারের অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু এই মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে এ বিষয়টি উপেক্ষা করা দুষ্কর যার সামষ্টিক অস্তিত্ব তার জন্য আশঙ্কাজনক।

এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্তসমূহের আলোকে পাঠকবর্গের প্রতি এই নিবেদন করা আমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করি যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের এই পঞ্চম বাহিনীর তৎপরতার উপর শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই নয়, বরং এই দলকে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত

করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। অন্যথায় কাদিয়ানীরা সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহের সহায়তায় দেশ ও জাতির জন্য স্থায়ী আশঙ্কা হয়ে থাকবে এবং খোদা নাখাস্তা দেশ ও জাতিকে এমন দুর্ঘটনারও সম্মুখীন হতে পারে বর্তমানে আরব ইসলামী উম্মাহর সামগ্রিক জীবনে যেমন ইসরাঈল ক্যান্সারের আকার ধারণ করেছে।

সর্বশেষ নিবেদন

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ!

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আমাদের আবেদন কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র উপর কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নমূলক আচরণের কাহিনী এতই দীর্ঘ যে, দু' শতাধিক পৃষ্ঠা লেখার পরেও বার বার আমাদের একথাই মনে হচ্ছে যে, এ প্রসঙ্গে যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সামনে পেশ করা প্রয়োজন ছিল, তার বিরাট একটা অংশই বাকী রয়ে গেছে। মুসলিম উম্মাহ্ প্রায় ৯০ বছর যাবৎ কাদিয়ানীদের উৎপীড়ন ও ষড়যন্ত্র সহ্য করে আসছে। এই ধর্ম মতের পক্ষ থেকে ইসলামের নামে ইসলামের মূলকর্তনের যে দীর্ঘ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে তার মামুলী কিছু নমুনা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসকে তুলাধূনা করা হয়, কোরআনের আয়াতসমূহের সাথে প্রকাশ্য উপহাস করা হয়, মহানবী (সঃ)-এর হাদীসকে বানানো হয় খেলনা, নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের মহান দল, আহলে বাইত এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বসমূহের উপর প্রকাশ্যে কাঁদা ছোড়া হয়, ইসলামী প্রতীকসমূহকে অপমান করা হয়, সর্বোপরি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত চরিত্রকে সেই রহমতুললিল আলামীনের (সঃ) পাশাপাশি দাঁড় করাতে, বরং বলতে গেলে তার চেয়েও উত্তম সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়। অথচ সেই নবীর(সঃ) যার মহিমা ও মহত্ত্বের সামনে ফেরেশতারা পর্যন্ত সম্মানে মাথা নত করে এবং তাঁর নামের কারণে মানবতার সম্মান, তাঁর করুণা ও দয়ার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

কাদিয়ানী ধর্মমত এই রহমতুললিল আলামীন (সঃ)-এর ভক্ত অনুসারীদের প্রতি দীর্ঘ ৯০ বছর যাবৎ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে সব সময় ইসলামের রূপ ধরে মুসলিম উম্মাহর বুকে ছুরিকাঘাত করতে এবং ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিক আশ্রয় সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে তাওহীদবাদীদের গণহত্যা ও মুসলিম নারীদের অবমাননায় ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়েছে। সে নিজেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি অংশ হিসাবে প্রকাশ করে ইসলামের শত্রুদের এমনি সব সেবা দান করেছে যা কোন প্রকাশ্য শত্রুর পক্ষে সম্ভব হতে পারত না।

মুসলিম উম্মাহ্‌ দীর্ঘ নব্বই বছর যাবৎ কাদিয়ানীবাদের এসব উৎপীড়ন সহ্য করে আসছে। এসব উৎপীড়নের দরুনই সমস্ত মুসলমান এবং পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল মরহুম সমকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানী ধর্মের অনুসারীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুসলমানের জাতিসত্তা থেকে আলাদা করে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি এমনি এক সরকারের আমলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যে কাদিয়ানীবাদের ভিত নিজ হাতে রচনা করেছিল এবং যে নিজের স্বার্থে কাদিয়ানীবাদের পিঠ চাপড়ানোর পলিসি অবলম্বন করে রেখেছিল। সুতরাং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ এবং বিশেষ করে আল্লামা ইকবালের আমলে সমস্ত ফরিয়াদ সরকারের চৌকাঠে মাথা কূটে ফিরে এসেছে। মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ অসহায়। কাদিয়ানীবাদের অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া তাদের কোন উপায়ই ছিল না।

বর্তমানে পাকিস্তানের সেই স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাকিস্তানের আকারে আমাদের সামনে উপস্থিত। এখানে আমরা কোন বহিরাগত সরকারের অধীন নই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সুদীর্ঘ সাতাশ বছর অতিবাহিত হবার পরেও আমরা ইসলামী উম্মাহর অপরিহার্য প্রয়োজন, তার দীর্ঘ দিনের দাবী এবং ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ সে সমস্ত চাহিদা পূরণ কতে পারিনি। অথচ এরই মধ্যে কাদিয়ানীদের হাতে শত শত আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনাদের হাতে অর্পিত হয়েছে এবং শুধু পাকিস্তানই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ, চিরনিদ্রায় শায়িত মুসলমানদের আত্মারা পর্যন্ত আপনাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে যারা গোলামীর অন্ধকার রাতে কাদিয়ানীদের বিছানো কাঁটার ঘায়ে প্রাণ দিয়েছিল। যারা ন্যায় ও সত্যের জন্য আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ তাদের সে ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না এবং যারা দীর্ঘ সাতাইশ বছর যাবৎ এই মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যা তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত এবং যা দু'শ বছরের গোলামীর পর মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হিসাবে অর্জিত হয়েছে।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ!

মুসলমানরা কখনো কারো প্রতি অত্যাচার করতে চায় না; মুসলমানদের দাবী শুধু এতটুকু যে, সেই কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হোক যারা নিজেরাই প্রকাশ্যভাবে ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে গেছে, যারা ইসলামের সর্বসম্মত আকীদা-বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। যারা শত কোটি মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। তাদের উপাসনালয় মুসলমানদের থেকে আলাদা, তাদের সাথে ও মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে শাদীর সম্পর্ককে উভয় পক্ষ থেকেই অবৈধ ও নাজায়েজ গণ্য করা হয়। এমন কি আদালতও এ ধরণের বিয়ে শাদীকে বেআইনী বলে সাব্যস্ত করেছে। মুসলমানরা কাদিয়ানীদের এবং কাদিয়ানীরা মুসলমানদের জানাযায় অংশ গ্রহণকে জায়েজ বলে মনে করে না এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে স্বধর্মীদের মত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং সংসদের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার পদক্ষেপ কোন অদ্ভুত কিংবা বিস্ময়কর কোন পদক্ষেপ হবে না, বরং এটা হবে একটা প্রকাশ্য বাস্তবতার প্রতি সরকারী স্বীকৃতি, যা ইতিপূর্বে মুসলিম বিশ্বে নিজেকে স্বীকার করিয়েও নিয়েছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার প্রস্তাব এমন কোন প্রস্তাব নয় যা কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা

রাজনৈতিক লড়াই সাময়িকভাবে দাঁড় করিয়ে থাকবে, বরং এটি কোরআন করীমের বহু সংখ্যক আয়াতের, মহানবী (সঃ)-এর অসংখ্য বাণীর, মুসলিম উম্মাহ্র সমস্ত সাহাবী, তাবেঈন, ফেকাহবিদ ও মুহাদ্দেসীনের, ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত আদালত ও সরকারের বিশ্ব ধর্মমতের যাবতীয় ইতিহাসের, পৃথিবীর বর্তমান শতাধিক কোটি মুসলমানের, পাকিস্তানের প্রাথমিক স্বপ্নদ্রষ্টাদের, স্বয়ং কাদিয়ানী পুরোহিতদের স্বীকারোক্তিমূলক বয়ান-বিবৃতির এবং তাদের নব্বই বছর কালের কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্ত। এর অস্বীকৃতি একান্তভাবেই দুপুরের সূর্যালোকের অস্বীকৃতির অনুরূপ।

যেহেতু কাদিয়ানী জামাতগুলো নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করে মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, সেহেতু তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে এখন শত্রুতা ও বিরোধের এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে, যেমনটি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে নেই। এমনি পরিস্থিতির এছাড়া আর কোন সমাধান নেই যে, সরকারীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হোক। অতঃপর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মত কাদিয়ানীদের জানমালের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্বও মুসলমানদেরই উপর অর্পিত হবে। মুসলমানরা নিজের দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের সাথে সর্বদা নিতান্ত উদারতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছে। সুতরাং কাদিয়ানীদেরকে সরকারী পর্যায়ে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার পর দেশে তাদের জানমালের নিরাপত্তা অধিক নিশ্চিত হবে এবং বিদ্বেষের যে আগুন মাঝে-মাঝেই শিখায়িত হয়ে উঠে তা দেশের নিরাপত্তার জন্য কখনোই হুমকি সৃষ্টি করবে না।

অতএব, আমরা আপনাদের প্রতি আল্লাহ্র নামে হাশর দিনের শাফাআতকারী মুহাম্মদ মোস্তফা(সঃ)-এর মহিমার নামে, কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং মুসলিম উম্মাহ্র এজমার নামে, ন্যায় ও সত্য, বিশ্বাস ও সততার নামে, পৃথিবীর শতাধিক কোটি মুসলমানের নামে এই আবেদন জানাচ্ছি যে, মুসলিম মিল্লাতের এই দাবী পূরণের ব্যাপারে কোন রকম চাপের মুখে প্রভাবিত হবেন না এবং আল্লাহ্ ও তার রসূলের সন্তুষ্টির

কথা ভাববেন, যাঁর শাফাআতই হাশরের ময়দানে আমাদের শেষ ভরসা।

আমরা যদি আমাদের এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্ কখনোই আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমতা ও অধিকার ঢলে পড়ে, কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তের দাগ মৃত্যুর পরেও মুছে যায় না। আল্লাহ্ আপনাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তের তওফীক দান করুন। (প্রস্তাবের উদ্যোক্তাবৃন্দ)

খত্‌মে নবুওয়ত তথা নবুওয়তের সমাপ্তি সম্পর্কে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ইসলামাবাদ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিশেষ কমিটির প্রস্তাবের মতন আইনে সংশোধনী বিল এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টোর ভাষণের মতন পেশ করা হচ্ছে, যা তিনি ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজীতে দিয়েছিলেন, যখন পার্লামেন্ট খত্‌মে নবুওয়ত সংক্রান্ত বিষয়ের সমাধানে বিল পাস করে।

প্রস্তাব

জাতীয় সংসদের সমস্ত পরিষদ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য পাঠানো হোক।

সমস্ত পরিষদ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি নিজের সহায়ক কমিটি ও নিম্ন কমিটির পক্ষ থেকে তার সামনে উপস্থাপিত কিংবা জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে তাকে পাঠানো প্রস্তাবসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করতে, কাগজ-পত্রাদির পর্যালোচনা করতে এবং আঞ্জুমানে আহমদিয়া (কাদিয়ানী সংগঠন) রাবওয়াহ্‌সহ আঞ্জুমানে আহমদিয়া এশাআতে ইসলাম লাহোর-এর প্রধানগণও অন্যান্য সাক্ষী সাবুদের পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষনের পর সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করছে–

(ক) পাকিস্তানের আইনে নিম্নলিখিত সংশোধন করা হোক ঃ

(১) ১০৬(৩) ধারায় কাদিয়ানী জামাত ও লাহোরী জামাতের ব্যক্তিবর্গের (যারা নিজেদেরকে আহমদী বা কাদিয়ানী বলে থাকে) উল্লেখ করা হোক।

(২) ২৬০ ধারায় একটি নতুন অংশের মাধ্যমে অমুসলিমের সংজ্ঞা সংযোজিত করা হোক। উল্লেখিত সুপারিশগুলো প্রবর্তন করার জন্য বিশেষ কমিটির পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের খসড়া সংযোজিত হল।

(খ) সমগ্র দন্ডবিধি পাকিস্তানের ২৯৫-এফ ধারায় নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা অন্তর্ভূক্ত করা হোক –

ব্যাখ্যা ঃ কোন মুসলমান যে আইনের ২৬০ ধারার (৩)-এর ব্যাখ্যা মোতাবেক মুহাম্মদ(সঃ)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে কিংবা আমল অথবা প্রচার করবে সে এই ধারার আওতায় শাস্তির যোগ্য হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যথা জাতীয় রেজিস্ট্রেশন এক্ট ১৯৭৩ ও নির্বাচনী তালিকাসমূহের নিয়মবিধির ১৯৭৪-এ নির্বাচিত আইনগত ও নীতিমালার সংশোধন করা হোক-

(৫) পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিক তা সে যে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত হোক তার জান-মাল, স্বাধীনতা, মান-সম্ভ্রম ও মৌলিক অধিকারসমূহের পুরোপুরি নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

(জাতীয় সংসদে পেশ করার জন্য) ·

ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের আইনে অধিকতর সংশোধন কল্পে

একটি বিল

সর্বত্র এটা যুক্তি সংগত যে, এসব সংযোজিত উদ্দেশ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের আইনে অধিকতর সংশোধনী আনয়ন করা হোক।

অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হল ঃ

(১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনের সূচনা- (১) এই এক্টকে (সংশোধনী দুই) এক্ট ১৯৭৪ নামে অভিহিত করা হবে। (২) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(২) আইনের ১০৬ ধারার সংশোধন–ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের আইনে যাকে এ আইনের পরবর্তী আইন বলা হবে ১০৬ ধারার (৩) অংশে সম্প্রদায় শব্দের পর শব্দাবলী ও বন্ধনী "এবং কাদিয়ানী জামাত অথবা লাহোরী জামাতের ব্যক্তিত্ব (যারা নিজেদের আহমদী বলে থাকে)" সংযোজিত করা হবে।

(৩) আইনের ২৬০ ধারার সংশোধনী-আইনের ২৬০ ধারায় (২) অংশের পর নিম্নলিখিত নতুন অংশ সংযুক্ত করা হবে। অর্থাৎ

"(৩) যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ) যিনি সর্বশেষ নবী তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে একান্ত নিঃশর্ত ঈমান স্থাপন না করবে কিংবা মুহাম্মদ (সঃ)-এর পর যে কোন অর্থে অথবা যে কোন প্রকার নবী হওয়ার দাবী করবে অথবা যে ব্যক্তি এ ধরনের দাবীদারকে নবী কিংবা ধর্মীয় সংস্কারক বলে স্বীকার করবে সে আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমান নয়।"

উদ্দেশ্য ও অস্তিত্বের বিবরণ

যেমন সমস্ত পরিষদের বিশেষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে সাব্যস্ত হয়েছে–এই বিলের উদ্দেশ্য হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের আইনে এভাবে সংশোধন করা যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাতেমুন্ নবিয়্যীন হওয়ার ব্যাপারে একান্ত ও নিঃশর্তভাবে ঈমান আনে না কিংবা যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে নবী হওয়ার দাবী করে অথবা যে ব্যক্তি এ ধরনের নবুওয়তের দাবীদারকে নবী বা ধর্মীয় সংস্কারক স্বীকার করে-'তাকে অমুসলিম সাব্যস্ত করা হোক'।

- (আবদুল হাফীজ পীরজাদা (ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর ভাষণ

জনাব স্পীকার!

আমি যখন বলি যে, এই সিদ্ধান্ত সমগ্র পরিষদের সিদ্ধান্ত, তখন তাতে আমার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য বিষয়টির উপর জোর দিচ্ছি। আমরা এ বিষয়টি সম্পর্কে সমস্ত সদস্যের সাথে বিস্তারিত মতবিনিময় করেছি। তাদের মধ্যে সমস্ত পার্টির ও সমস্ত মতাদর্শের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আজকের দিনে

যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, এটি একটি জাতীয় সিদ্ধান্ত, এটি পাকিস্তানের জনসাধারণের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের মুসলমানদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও তাদের জযবার প্রতিফলন ঘটায়। আমি চাই না, শুধু সরকারই এই সিদ্ধান্তের কৃতিত্বের অধিকারী গণ্য হোক কিংবা আমি চাইনা, কোন এক ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রশংসার অধিকারী হোক-আমার বক্তব্য হল এই যে, এই কঠিন সিদ্ধান্ত বরং আমার মতে একাধিক দিক দিয়ে অতি কঠিন সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যতীত গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারত না।

এটি একটি পুরানো বিষয়; নব্বই বছরের পুরনো। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এ সমস্যাটি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। এতে আমাদের সমাজে তিক্ততা ও বিভেদ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত এ বিষয়টির কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদেরকে বলা হয় যে, এই সমস্যা পূর্বেও সৃষ্টি হয়েছিল। একবার নয়, বরং কয়েক বার।

আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, অতীতে এ সমস্যাকে যেভাবে আয়ত্বে আনা হয়েছিল, তেমনিভাবে এখনও তেমনি পদক্ষেপে একে আয়ত্বে আনা যেতে পারে। আমি জানি না, এ সমস্যা সমাধানে অতীতে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি জানি, ১৯৫৩ সালে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বর্বরোচিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। যা এ সমস্যার সমাধানে নয়, বরং সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে করা হয়েছিল। কোন সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়া হলে তার সমাধান হয় না। কিছু বিজ্ঞব্যক্তিবর্গ যদি সরকারকে এই পরামর্শ দিতেন যে, জনসাধারণের উপর কঠোরতা আরোপ করে এ সমস্যার সমাধান করা হোক এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে পদদলিত করে দেয়া হোক, তাহলে হয়তো বা এভাবে একটা অস্থায়ী সমাধান বেরিয়ে আসত, কিন্তু তা সমস্যার সঠিক ও যথার্থ সমাধান হত না। সমস্যা চাপা পড়ে অবশ্য দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত, কিন্তু সমস্যা শেষ হত না।

আমাদের সাম্প্রতিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল সমস্যার স্থায়ী সমাধান সন্ধান করা। আর আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে, আমরা সঠিক ও নির্ভুল সমাধান সন্ধান করতে গিয়ে কোন ত্রুটি করিনি। একথা সত্য যে, মানুষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, অস্বাভাবিক অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে, আইন-শৃংখলা ও শান্তির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। জান

মালের ক্ষতি হয়েছে। উদ্বেগেরও কারণ হয়েছে। গোটা জাতি বিগত তিনটি মাস উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ও আশা-নিরাশার অবস্থায় কাটিয়েছে। নানা রকম গুজব বিপুল পরিমাণে ছড়িয়েছে। আমি এখন আর সে সব পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা, ২২ ও ২৩শে মে'তে কি ঘটেছিল। আমি বর্তমান সমস্যার কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এ সমস্যাটি কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং কেমন করে তা দাবানলের মত সমগ্র দেশকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছিল। এখন আমার জন্য আর সমস্যার গভীরে যাওয়া সংগত হবে না। কিন্তু আমি অনুমতি চাইব এই বিজ্ঞ পরিষদের দৃষ্টি আমার সেই বিবৃতির প্রতি আকৃষ্ট করার যা ১৩ জুন তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দিয়েছিলাম।

সে বিবৃতিতে আমি পরিস্কার ভাষায় পাকিস্তানের জনগণকে বলেছিলাম যে, এ সমস্যাটি মৌলিক ও নীতিগতভাবে ধর্মীয় সমস্যা। পাকিস্তানের ভিত্তি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য অস্তিত্ব লাভ করেছিল। যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া যেত যাকে প্রদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা ও আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করত, তাহলে তাতে পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য এবং তার চেতনা আহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। যেহেতু এ সমস্যাটি একান্তই ধর্মীয় ছিল, কাজেই আমার সরকারের জন্য কিংবা একজন ব্যক্তি হিসাবে আমার জন্য ১৩ জুনে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সঙ্গত ছিল না।

লাহোরে এমন কয়েক ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন যারা এ সমস্যার দরুণ উত্তেজিত ছিলেন। তারা আমাকে বলছিলেন যে, আপনি আজই এ মুহূর্তেই এবং এখানেই সে ঘোষণা কেন দিচ্ছেন না, যা পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান কামনা করে? তারা একথাও বলছিলেন যে, আপনি যদি এ ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে আপনার সরকার বিপুল প্রশংসা অর্জন করতে পারে এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনি অসাধারণ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করতে পারেন। তারা বললেন, আপনি যদি জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের এই সুযোগ নষ্ট করেন তবে জীবনের একটা সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। আমি আমার সেই বন্ধুদেরকে বললাম এটি একটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক ব্যাপার। এ সমস্যা দীর্ঘ নব্বই বছর যাবৎ উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এটি পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করা এবং কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া

আমার জন্য সঙ্গত ছিল না, তাই আমি তাদেরকে বললাম, আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। পাকিস্তানের একটি জাতীয় সংসদ রয়েছে যা দেশের সমস্যা ও বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার সর্ববৃহৎ সংস্থা। আমার মতে এই সমস্যা সমাধান করার জন্য জাতীয় সংসদই উপযুক্ত স্থান। আর সরকারী দলের নেতা হিসাবে আমি সংসদ সদস্যদের উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করব না। এ সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকে আমি সংসদ সদস্যদের বিবেকের উপর ন্যস্ত করছি। তাদের মধ্যে আমার দলের সদস্যও রয়েছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির সদস্যগণ আমার এ কথার সমর্থন করবেন যে, যেখানে কয়েক বার তাদেরকে ডেকে নিজের পার্টির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছি, সেখানে এ সমস্যার ব্যাপারে আমি আমার দলের একজন সদস্যের উপরও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিনি একমাত্র অবকাশ ছাড়া যখন এ বিষয়ে খোলাখুলি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জনাব স্পীকার!

আমি আপনাকে একথা বলা সঙ্গত মনে করি না যে, এ সমস্যার দরুণ আমি প্রায়ই উদ্বিগ্ন থেকেছি এবং রাতের পর রাত আমার ঘুম হয়নি। এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার পরিণতি সম্পর্কে আমি যথাযথ অবহিত রয়েছি। এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আমি জানি, যার প্রভাব দেশের প্রতিরক্ষার উপরও পড়তে পারে। এটা কোন সাধারণ সমস্যা নয়। কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, পাকিস্তান এমন একটি দেশ যেটি উপমহাদেশের মুসলিম আশা-আকাঙ্খার দরুণ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারা একটা পৃথক দেশ কামনা করছিল। এ দেশের অধিকাংশ নাগরিকের ধর্ম ইসলাম। কাজেই আমি এই সিদ্ধান্তকে গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রবর্তন করতে গিয়ে নিজেদের কোন নীতিরই বিরোধিতা করছি না। পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রথম নীতি হল এই যে, ইসলাম আমাদের দ্বীন (ধর্ম)। ইসলামের খেদমত আমাদের পার্টির জন্য প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দ্বিতীয় নীতি হল এই যে, গণতন্ত্র আমাদের পলিসি। সুতরাং আমাদের জন্য এ সমস্যাটি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে পেশ করাই ছিল সঠিক পন্থা। এরই সঙ্গে আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে, আমরা নিজেদের পার্টির সে নীতিরও পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করব যে, পাকিস্তানের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি সমাজতন্ত্রের উপর হবে। আমরা সমাজতান্ত্রিক নীতিমালাকে সমর্থন করি। এই যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তাতে আমরা

নিজেদের কোন নীতি থেকেই বিচ্যুত হইনি। আমরা আমাদের পার্টির তিনটি নীতির উপর পরিপূর্ণভাবেই স্থির রয়েছি। আমি একাধিক বার বলেছি যে, ইসলামের মৌলিক ও উচ্চতর নীতিমালা সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী নয় এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে বৈষয়িক আধিপত্যকে খতম করারও বিরোধী নয়।

এ সিদ্ধান্ত ধর্মীয়ও বটে এবং অধর্মীয়ও বটে। ধর্মীয় এই হিসাবে যে, এ সিদ্ধান্ত যে সমস্ত মুসলমানকে প্রভাবিত করে যারা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু। আর অধর্মীয় এই হিসাবে যে, আমরা আধুনিক যুগে বসবাস করি। আমাদের আইন কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়, বরং আমরা পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে একই রকম অধিকার দান করেছি। প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর এই অধিকার রয়েছে যে, সে গর্ব ও প্রত্যয়ের সাথে নির্ভয়ে নিজের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস পালন করতে পারবে। পাকিস্তানের আইনে পাকিস্তানের নাগরিকদেরকে এ বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আমার সরকারের জন্য এখন এ বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিকের অধিকারের হেফাজত করতে হবে। এটা একান্ত প্রয়োজন। আর আমি এ ব্যাপারে কোন রকম সংশয়ের অবকাশ রাখতে চাই না যে, পাকিস্তানের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ আমাদের নৈতিক ও পবিত্র ইসলামী দায়িত্ব।

জনাব স্পীকার!

আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দান করতে চাই, এবং এই পরিষদের বাইরের প্রতিটি লোককে বলে দিতে চাই যে, এই দায়িত্ব পুরোপুরি ও যথাযথভাবে পালন করা হবে। এ ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমরা কোন রকম হস্তক্ষেপ, সংস্কৃতি হনন কিংবা কোন শ্রেণী বা নাগরিকের অপমান-অসম্মান সহ্য করব না।

জনাব স্পীকার!

বিগত তিন মাসে এই বিরাট গোলযোগের সময় কিছু গ্রেফতারী হয়েছে, কিছু লোককে জেলে পাঠানো হয়েছে এবং আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেগুলোও আমাদের কর্তব্য ছিল। আমরা এদেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের ব্যাপকতা দেখতে চাইনি। তাও আমাদের কর্তব্য ছিল। কর্তব্যের খাতিরেই আমাদেরকে তা করতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত পরিষদ যখন সর্বসম্মতিক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তখন আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তার সাথে বলতে চাই যে, আমরা সমস্ত বিষয়ে

তাৎক্ষনিক ও দ্রুত বিবেচনা করব। আর যখন এ বিষয় সংক্রান্ত অধ্যায়টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমাদের পক্ষে তাদের জন্য সহানুভূতিমূলক আচরণ করা সম্ভব হবে। আমি আশা করি, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু লোকের ব্যাপারে সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা হবে যারা এ সময় উত্তেজনামূলক পন্থা অবলম্বন করে এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

জনাব স্পীকার!

যেমনটা আমি নিবেদন করলাম, আমাদের আশা করা উচিত যে. আমরা এ অধ্যায়টি বন্ধ করে দিয়েছি এটা আমার সাফল্য নয়, সরকারেও সাফল্য নয়, বরং এ সাফল্য পাকিস্তানের জনগণের যাদের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভূক্ত। আমি গোটা পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি উপলব্ধি করছি যে, এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেয়া সম্ভব হতনা। যদি না সমগ্র পরিষদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত দলের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব ব্যাক্ত করা না হত। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও আমাদের মাঝে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান ছিল। আইন হল আমাদের দেশের মৌলিক বিধান। এ আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে দীর্ঘ সাতাশ বছর কেটে গেছে। আর তখনকার সময়টি পাকিস্তানের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় সময় ছিল,যখন এ আইনটিকে সমস্ত পার্টি গ্রহণ করে নেয় এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সেটি মঞ্জুর করে নেয়। এই মনোভাবের আওতায় আমরা এই কঠিন সিদ্ধান্তটিও নিয়ে নিতে পেরেছি।

জনাব স্পীকার!

হয়তো বা ভবিষ্যতে আমাদেরকে আরো কঠিন জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র মতে যখন থেকে পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এ বিষয়টি ছিল সর্বাধিক জটিল। আগামী দিনগুলোতে আরোও কঠিন বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারে যেগুলো সম্পর্কে কোন কিছুই বলা যায় না, কিন্তু অতীতের দিকে লক্ষ্য রেখে, এ বিষয়টি ঐতিহাসিক দিকগুলোকে যথাযথ পর্যালোচনা করে আমি আবারো বলতে চাই, এটি ছিল সর্বাধিক কঠিন বিষয়। প্রতিটি ঘরে ঘরে এর প্রভাব ছিল, প্রত্যেকটি পল্লীতে এর প্রভাব ছিল এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর এর প্রভাব ছিল। ক্রমান্বয়ে এ বিষয়টি জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করছিল। আমাদেরকে বিষয়টির সমাধান করতেই

হত, আমাদেরকে তিক্ত বাস্তবতার সম্মুখীন হতেই হত। আমরা এ বিষয়টিকে হাইকোর্ট কিংবা ইসলামী মতাদর্শ পরিষদের হাতে অর্পণ করতে পারতাম কিংবা ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সামনে তুলে ধরতে পারতাম। বলা বাহুল্য যে, সরকার এবং এমনকি ব্যক্তিও সমস্যাকে পেছনে ফেলে রাখতে জানে। কোন বিষয়কে যেমনটি তেমনি রেখে দিতে পারে। অথচ বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য গতানুগতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমরা এ বিষয়টিকে সেভাবে সমাধান করতে চেষ্টা করিনি, বরং চিরকালের জন্য বিষয়টির সমাধান করার প্রেরণা পোষণ করেছি। এই প্রেরণার আওতায় জাতীয় পরিষদ একটি কমিটির আকারে গোপন বৈঠক করতে থাকে। গোপন বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় পরিষদের সামনে একাধিক কারণও ছিল। জাতীয় পরিষদ যদি গোপন বৈঠক না করত, তাহলে জনাব, আপনি কি মনে করেন, এসব সত্য বিষয় ও তথ্যগুলো আমাদের সামনে আসতে পারত? তাছাড়া জনগণও কি এমন স্বাধীনভাবে নিঃসংকোচে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করতে পারত? তারা যদি জানতেন যে এখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বসে আছে। তাদের কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং তাদের বয়ান-বিবৃতিগুলো সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তাহলে সংসদ সদস্যবর্গ এমন আস্থার সাথে ও খোলা মনে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারতেন না। যেমনটা তারা গোপন বৈঠকে করতে পেরেছেন। আমাদেরকে এসব গোপন বৈঠকের কার্যক্রমের প্রতি দীর্ঘকাল যাবৎ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে কোন কথাই গোপন থাকে না। কিন্তু সে সব বিষয় প্রকাশের একটা সময় রয়েছে। যেহেতু সংসদের কার্যক্রম গোপন থাকে এবং আমরা সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে এবং সাথে সাথে আমাদের সামনে উপস্থিত কৃত লোকদেরকেও এই নিশ্চয়তা দিয়ে ছিলাম যে, যা কিছু আমাদের সামনে তারা বলছে সেগুলো রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবেনা কিংবা তাদের বয়ান-বিবৃতিগুলোকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হবেনা। আমার মতে পরিষদের জন্য অপরিহার্য বৈঠকে কার্যক্রমসমুহ একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রকাশ না করাই কর্তব্য ও সংগত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের পক্ষে সে সব গোপন বৈঠকের কার্যক্রমগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কারণ এর

রেকর্ড গুলোর প্রকাশ হওয়াও অপরিহার্য। আমি বলি না যে, এসব গোপন বৈঠকের রেকর্ডগুলো দাফন করে দিতে হবে; কখনো নয়। আমি যদি একথা বলি, তা একটি অবাস্তব কথা হবে। আমি বরং একথা বলছি, এ অধ্যায়টি শেষ করার জন্য এবং অন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার জন্য, নতুন উচ্চতায় আরোহন করার জন্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য, পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য শুধু এ বিষয় সম্পর্কেই নয়, বরং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও আমাদেরকে গোপনীয়তা রাখতে হবে। আমি পরিষদের সামনে একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এ বিষয়ের সমাধানকে অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে মতবিনিময়, সমঝোতা ও আলাপ-আলোচনার জন্য শুভ লক্ষণ হিসাবে গণ্য করতে হবে। আমাদের আশা রাখতে হবে যে, এ সমাধানটি আমাদের জন্য আনন্দের কারণ। এখন আমরা এগিয়ে যাব এবং সমস্ত নতুন জাতীয় সমস্যাকে পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাবের আওতায় সমাধান করব।

জনাব স্পীকার!

আমি এর বেশী আর কিছুই বলতে চাই না। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমার যে অনুভূতি ছিল, তা বর্ণনা করলাম। আমি আরেক বার এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, এটা একটা ধর্মীয় ব্যাপার। এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আর এটা গোটা পরিষদেরই সিদ্ধান্ত; গোটা জাতির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তটি জনসাধারণের আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আমার ধারণা মতে এ পরিষদের পক্ষে এর চেয়ে উত্তম কোন সিদ্ধান্ত নেয়া মানব ক্ষমতার ঊর্ধের বিষয় ছিল। তাছাড়া আমার ধারণায় এ বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের জন্য এর চাইতে কম কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না।

এমনও কিছু লোক থাকতে পারে, যারা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হবে না; আমরা এমন আশা করতে পারি না যে, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তে সবাই খুশী হতে পারবে, যা বিগত নয় বছর যাবৎ সমাধান হচ্ছিল না। বিষয়টি যদি সহজ-সরল হত এবং সবাইকে খুশী বা সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব হত, তাহলে এ বিষয়টি বহু পূর্বেই সমাধান হয়ে যেত পারত। কিন্তু তা হতে পারেনি। ১৯৫৩ সালেও তা সম্ভব হয়নি। যারা বলে যে, বিষয়টি ১৯৫৩ সালেই সমাধান হয়ে গিয়েছিল, তারা আসল পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি। আমি একথা স্বীকার করি, এবং ভাল করেই জানি যে, এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এ সিদ্ধান্তে একান্ত উৎফুল্ল

হবে। এখন আমার পক্ষে সে সব লোকের অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি একথা বলব যে, এটা তাদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের অনুকূল যে, বিষয়টির সমাধান হয়ে গেছে। আজ ওরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, এ সিদ্ধান্ত ওদের অপছন্দ হতে পারে, ওদের জন্য এ সিদ্ধান্ত অসহ্য হবে, কিন্তু বাস্তবতার পেক্ষাপটে এবং ধরে নেয়ার পর্যায়ে নিজেকে সে সব লোকের মধ্যে গণ্য করতে গিয়ে আমি বলব, তাদেরকেও এ ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, এ সিদ্ধান্তের দ্বারা এ সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেছে এবং তাদের আইনগত অধিকার লাভের নিশ্চয়তা অর্জিত হয়ে গেছে। আমার মনে আছে, বিরোধী দলের মধ্য থেকে মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী যখন এ আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন যারা এ সিদ্ধান্তের দরুণ প্রভাবিত হবে। পরিষদ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দানে সংকল্পবদ্ধ। এটা সমস্ত দলেরই কর্তব্য। এটা সরকারের কর্তব্য, বিরোধী দলের কর্তব্য এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য যে, সে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান হেফাজত করবে। সহানুভূতি হল ইসলামের শিক্ষা। মুসলমানরা সহানুভূতির ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। ইসলাম শুধু যে সহানুভূতির তাবলীগই করেছে তাই নয়, বরং সমস্ত ইতিহাসে ইসলামী সমাজ সহানুভূতিমূলক আচরণ করেছে। ইসলামী সমাজ সেই তমসাচ্ছন্ন যুগেও ইহুদীদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে, যখন খৃষ্টবাদ ইউরোপে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ইহুদীরা ওসমানী সালতানাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ইহুদীরা যদি অন্যান্য শাসক সমাজ থেকে আত্মরক্ষা করে আরব ও তুর্কীদের ইসলামী সমাজে আশ্রয় নিতে পেরে থাকে, তাহলে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের রাষ্ট্রও ইসলামী রাষ্ট্র। আমরা মুসলমান, আমরা পাকিস্তানী। আর সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত ব্যক্তি এবং পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিকের একই রকম নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

জনাব স্পীকার!

এরই সাথে আমার বক্তব্য শেষ করছি। শুকরিয়া।

পাকিস্তান সরকারের প্রত্যয়ন ১৯৮২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে কিছু দিন থেকে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। এসব সন্দেহ-সংশয়ের অবসান কল্পে মাননীয় প্রেসিডেন্ট গত মাসের ১২ তারিখে সংবিধানের সংশোধনী (স্থিতি)-এর ফরমান ১৯৮২(প্রেসিডেন্টের নির্দেশ নং-৮/১৯৮২) জারী করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অধিকতর প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় যে, জনকল্যাণ আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী ও স্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮১ (নং-২৭/১৯৭৪)-এর এক নম্বর ছকে সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট বাবদ ১৯৭৪ (নং-৪৭/১৯৭৪)-এর সমন্বয়ে যেসব সংশোধনীর আওতায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৭৩-এ কাদিয়ানীদের অবস্থান সম্পর্কে কার্যকর করা হয়েছে তাতে কোন ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়নি এবং হবেও না। আর সেগুলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৭৩-এর অংশ হিসাবে বলবৎ থাকবে। তদুপরি কাদিয়ানী গ্রুপ কিংবা লাহোরী গ্রুপের লোকদের (যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে অভিহিত করে) 'অমুসলিম' হিসাবে অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না। তারা যথারীতিই অমুসলিম রয়েছে। বিশ্লেষণমূলক ফরমানের পর সাধারণ পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে বাদানুবাদের অবসান ঘটাই উচিত ছিল, কিন্তু তারপরেও কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে বাস্তবতার গতি পরিবর্তিত করে এ সম্পর্কে অস্থিরতা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে তৎপর দেখা যায়। এসব লোকের অপতৎপরতাকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ বিষয়টি অধিকতর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

মজলিসে শুরার বিগত সম্মেলনে রাজা মোহাম্মদ জাফরুল হক ভারপ্রাপ্ত আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনকল্যাণ পরিষদের সদস্য কারী সাঈদুর রহমান ও মওলানা সামীউল হকের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে উত্থাপিত মুলতবী প্রস্তাব সম্পর্কে ১২ই এপ্রিল, ১৯৮২ তারিখে এক বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করেন।

মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়টির প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট ১৯৭৪ (নং-৪৯/১৯৭৪)-এর মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ২২০-এ উপধারা(৩) সংযোজন করা হয়েছে এবং কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর্টিক্যাল ১০৬-এর ৩ উপধারায় প্রাদেশিক পরিষদসমূহে অমুসলিম আসনসমূহের বন্টনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত আইনগত অবস্থানকে স্বীকার করতে গিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রতিনিধিত্ব এক্ট ১৯৭৬-এর ৪৭ (ক) ধারা সংযোজন করেছে যার সম্পর্ক হল অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে। এই নতুন ৪৭(ক) ধারায়ও কাদিয়ানী গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে অমুসলিমদের দলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তনও কাদিয়ানীদেরই আইনগত অবস্থান অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবেই নির্ধারণ করে দেয়ার জন্যই সূচিত হয়েছে। তেমনিভাবে সংসদীয় পরিষদসমূহ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের (নির্বাচন)-এর ফরমান ১৯৭৭ (৫ নং ঘোষণা ১৯৭৭-এর পরবর্তী প্রেসিডেন্টের ফরমান)-এও প্রেসিডেন্টের ফরমান ১৭/১৯৭৮ সংশোধন করে জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন সম্পর্কে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে 'মুসলমান' ও 'অমুসলমান'-এর পৃথক পৃথক দল বা গ্রুপ সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে কোন লোক তখন পর্যন্ত কোন সংসদের নির্বাচনের জন্য যোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার নাম 'মুসলমান' কিংবা 'অমুসলমান'-এর আসনসমূহ সংক্রান্ত পৃথক নির্বাচনী তালিকার মধ্যে কোন একটিতে নির্দিষ্ট করে অন্তর্ভূক্ত হবে।

অতঃপর অস্থায়ী সংবিধান সংক্রান্ত ফরমান ১৯৮১ জারী করার সময়ও কাদিয়ানীদের আলোচ্য অবস্থান অমুসলিম হিসাবেই বলবৎ রাখা হয়। সুতরাং অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশের আর্টিক্যাল-২-এ ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৭৩ (যা হালফিল স্থগিত)-এর কিছু কিছু আর্টিক্যালকে অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশের অংশে পরিণত করার সময় ২৬০ নং আর্টিক্যালকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই প্রকৃষ্ট আইনগত অবস্থান সত্ত্বেও কোন কোন মহলে কাদিয়ানীদের আইনগত অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তার অবসানকল্পেই ১৯৮১ সালে জারীকৃত অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশে আর্টিক্যাল নং-১ এফ

সংযোজন করতে হয়েছে। যার আলোকে সাব্যস্ত হয় যে, ১৯৭৩-এর সংবিধান ও আলোচ্য অধ্যাদেশসহ প্রণীত যাবতীয় আইন এবং অন্যান্য সমস্ত আইন সংক্রান্ত পান্ডুলিপিতে মুসলমান ও অমুসলমান বলতে তাই উদ্দেশ্য হবে যার উল্লেখ ১৯৮১ সালে জারীকৃত অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশের উদ্ধৃতিতে ১৯৮২ সালে জারীকৃত সংশোধিত সংবিধান অধ্যাদেশ (স্থিতি)তে করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে জারীকৃত অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশের ১ নং এফ আর্টিক্যালে মুসলমান ও অমুসলমানের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে কাদিয়ানী গ্রুপ ও লাহোরী গ্রুপের লোকদেরকে (যারা নিজেদেরকে 'আহমদী' নামে অভিহিত করে) অমুসলিমদের শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় সমন্বিত আইন (সংশোধিত/স্থিতি অধ্যাদেশ ১৯৮১-এর ছক নং-২৭-এ সংশোধিত সংবিধান এক্ট বাবত ১৯৭৪ নম্বর ৪৯ বাবত ১৯৭৪)-এর অন্তর্ভূক্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, সাধারণভাবে নির্ধারিত প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন মন্ত্রণালয় সময় সময় একটি রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন প্রবর্তন করিয়ে থাকে যার মাধ্যমে সেসব আইনের সংশোধন করে প্রচলিত আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং যা তার উদ্দেশ্যে করেছে তা বাতিল করে দেয়া হয়। এতএব প্রচলিত এই ব্যবস্থা বা কর্মপন্থার প্রেক্ষাপটে উপরোল্লিখিত সমন্বিত আইন (সংশোধিত/স্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮১ জারী করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় সাধারণ আইন, বাবৎ ১৮৯৭ এবং ৬ এফ ধারার উদ্ধৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এমন যে কোন সংশোধনী যা কোন সংশোধিত আইনের মাধ্যমে অন্য কোন আইনে কার্যকর করা হবে সংশোধিত আইনের মাধ্যমে বাতিল করা সত্ত্বেও কার্যকর থাকে। তবে শর্ত হল এই যে, সংশোধিত আইনের বাতিল করণের সময় সেটি যথারীতি কার্যকর থাকতে হবে। এতে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সংশোধনকারী আইনের বাতিল করণ সত্ত্বেও তার মাধ্যমে অস্তিত্বপ্রাপ্ত সংশোধনী জীবিত ও সক্রিয় থাকে এবং সংশোধিত আইনের থাকা না থাকা এ ধরনের সংশোধনীর স্থায়িত্বের পক্ষে সমান। কাজেই এ কথা বলা যথার্থ হবে না যে সংশোধনী সে অবস্থাতেই বহাল থাকবে যখন সংশ্লিষ্ট সংশোধিত আইনের অস্তিত্ব বহাল থাকবে। সংশোধিত আইন রহিত করা হোক কিংবা বলবৎ থাকুক, সংশোধনী যে কোন অবস্থায়

কার্যকর থাকে। সুতরাং সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট ১৯৭৪-এর সমন্বিত আইন(দ্বিতীয় সংশোধনী/স্থিতি) অধ্যাদেশ-১৯৮১-এর ১ম ছকে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে উল্লেখিত সংশোধিত আইনের দ্বারা কৃত সংশোধনীর উপর কোন প্রভাব পড়বে না এবং সেটি যথারীতি বহাল ও প্রচলিত থাকবে। এসব বিষয় সত্ত্বেও এ বিষয়টিকে আবারো রাজনৈতিক রূপ দেয়ার এবং সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সুতরাং যেমনটি পবিত্র হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, সে সমস্ত স্থান থেকেও বেঁচে থাকা প্রয়োজন যেখানে অপবাদ আরোপের আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখিত সংশয় ও দুর্বোধ্যতার অবসানকল্পে সরকার আরো একটি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দেশের প্রেসিডেন্ট একান্ত পরিস্কার, প্রকৃষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যাদেশ জারী করেছেন যাকে প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ নং ৮/১৯৮২ নামে অভিহিত করা হয়। এর হুবহু পাঠ নিম্নরূপ ঃ

যেহেতু সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট ১৯৭৪(নং-৪৯ বাবৎ ১৯৭৪)-এর মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৭৩-এ সংশোধনী আনা হয়েছিল যাতে প্রাদেশিক সংসদগুলোতে প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানী গ্রুপ কিংবা লাহোরী গ্রুপের লোকদেরকে (যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে থাকে) অমুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং যাতে একথা প্রতিপন্ন করা যায় যে, কোন ব্যক্তি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খত্মে নবুওয়তের উপর পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করবে না কিংবা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই শব্দ (শেষ নবীত্ব)-এর যে কোন রকম ব্যাখ্যার দিক দিয়ে নবী বা পয়গম্বর হওয়ার দাবী করবে অথবা এ ধরনের কোন দাবীদারকে পয়গম্বর কিংবা ধর্মীয় সংস্কারক বলে মান্য করবে, সংবিধান অথবা আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান নয়।

এবং যেহেতু প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর মাধ্যমে অন্যান্য সমূদয় বিষয়ের মতই জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে কাদিয়ানী গ্রুপ ও লাহোরী গ্রুপের ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে (যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে থাকে) যথাযথ প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্দেশ প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এবং যেহেতু অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ ১৯৮১ (অধ্যাদেশ সি,এম,এল,এ, নং-১/১৯৮১) উল্লেখিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট এ ধরনের নির্দেশসমূহকে নিজের অংশ সাব্যস্ত করেছিল-

এবং যেহেতু উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশে পরিস্কারভাবে 'মুসলিম' শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে এমন ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ ও একত্ববাদ, খাতেমুন্নবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খত্মে নবুওয়তের উপর পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত বিশ্বাস পোষণ করে এবং পয়গম্বর কিংবা ধর্মীয় সংস্কারক হিসাবে এমন কোন ব্যক্তির উপর ঈমান রাখে না এবং তাকে মানেও না যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে এ (নবী) শব্দে যে কোন রকম মর্ম কিংবা ব্যাখ্যার দিক দিয়ে পয়গম্বর হওয়ার দাবী করেছে অথবা দাবী করবে। আর 'অমুসলিম' শব্দের দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে মুসলমান নয়। যাদের মধ্যে খৃষ্টান, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ কিংবা পার্সী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি, কাদিয়ানী গ্রুপ বা লাহোরী গ্রুপ (যারা নিজেদেরকে আহমদী নামে অভিহিত করে থাকে) কিংবা কোন বাহাঈ ও জাদওয়ালী জাতি সম্প্রদায়ের যে কোন একটার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত-

এবং যেহেতু উল্লেখিত সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট বাবৎ ১৯৭৪ সংবিধানের মাঝে উল্লেখিত সংশোধনী অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করে নিয়েছিল।

এবং যেহেতু সমন্বিত আইন অধ্যাদেশ ১৯৮১ (নং-২৭/১৯৮১) সর্বজন স্বীকৃত কর্মপন্থা অনুযায়ী এবং আইন সংকলন থেকে উল্লেখিত এক্টসহ এমন সব আইনকে বের করে দেয়ার জন্য জারী করা হয়েছিল যেগুলো তাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে নিয়েছিল।

এবং যেহেতু উল্লেখিত অধ্যাদেশে যেমন প্রকৃষ্টভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, উল্লেখিত এক্ট কিংবা সংশোধিত আইনের মাধ্যমে উল্লেখিত সংবিধান কিংবা অন্যান্য আইনের মতন বা পাঠে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তাতে উল্লেখিত অধ্যাদেশ জারী করার দরুণ কোন প্রভাব পড়েনি।

অতএব, এখন ৫ই জুলাই ১৮৯৭-এর ঘোষণা অনুসারে এবং এ প্রসঙ্গে তাকে বৈধকরণকারী সমস্ত সংবাদপত্রকে ব্যবহার করতে গিয়ে

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইনগত পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা এবং তার অধিকতর প্রত্যয়নকল্পে নিম্নলিখিত ফরমান জারী করেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনের সূচনা ঃ- (১) এই সংবিধান সংশোধনী ফরমান (স্থিতি)-এর অধ্যাদেশ ১৯৮২ নামে অভিহিত হবে। (২) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। স্থিতি ঃ এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হচ্ছে এবং অধিকতর প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সমন্বিত আইনসমূহ (সংশোধিত ও স্থিতি) অধ্যাদেশ ১৯৮১ (নং ২৭/১৯৮১)-এর ১ম ছকে সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট বাবৎ ১৯৭৪ (নং ১৯ বাবৎ ১৯৭৪)-এর সমন্বয়ে যার প্রেক্ষিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ১৯৭৩-এর সংবিধানে উল্লেখিত সংশোধনী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।

(ক) উল্লেখিত সংশোধনীর ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়নি এবং হবেও না যা উল্লেখিত সংবিধানের অংশ হিসাবে বহাল রয়েছে। কিংবা

(খ) কাদিয়ানী গ্রুপ অথবা লাহোরী গ্রুপের লোকদের (যারা নিজেদেরকে 'আহমদী' বলে থাকে) অমুসলিম হিসাবে অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়ওনি এবং হবেও না; ওরা যথারীতি অমুসলিমই রয়েছে।

উপরোল্লিখিত মতন বা পাঠের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিম হিসাবে কাদিয়ানীদের আইনগত অবস্থান সর্বস্বীকৃত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোন কোন মহল এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে যে, উপরোল্লিখিত প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ ও অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ ১৯৮১ যেহেতু অস্থায়ী আইনগত পদক্ষেপ তাই এগুলো রহিত হয়ে যাবার পর মুসলমান ও অমুসলমানের সংজ্ঞা যা অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশের ১ নং আর্টিকেল এফ-এ বর্ণনা করা হয়েছে তাও শেষ হয়ে যাবে এবং যেহেতু সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট, বাবৎ ১৯৭৪ (নং ৪৯/১৯৭৪) যার ভিত্তিতে ১৯৭৩-এর সংবিধানে সংশোধনী এনে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সেটি সমন্বিত আইন অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে, তাই সংবিধান বহাল হবার পর কাদিয়ানীদের আইনগত অবস্থান তেমনি হয়ে যাবে যেসব সংবিধানের (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট ১৯৭৪ প্রবর্তনের পূর্বে ছিল।

যেমনটা বিস্তারিত বর্ণনা করা হল সংবিধানের (দ্বিতীয় সংশোধনী) এক্ট ১৯৭৪-এর ভিত্তিতে যে সংশোধনী ১৯৭৩-এর সংবিধানের ২৬০ আর্টিক্যাল ও ১০৬ আর্টিক্যালে কার্যকর করা হয়েছিল, তা যথারীতি বহাল ও জারী রয়েছে।

শেষ কথা

মহামান্য প্রেসিডেন্ট!

কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ ও আহমদীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতাসমূহকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং আইন সংশোধনের জন্য "কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ ও আহমদীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা প্রতিহত করণ ও দন্ডবিধি ১৯৮৪" নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন। অধ্যাদেশটি ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৪ তারিখে প্রবর্তিত হয়। পাকিস্তানের দন্ডবিধিতে ২৯৮ বি ধারা সংযোজন করা হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানী গ্রুপ ও লাহোরী গ্রুপের এমন যে কোন ব্যক্তিকে যে মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে কিংবা কোন আচার আচরনের মাধ্যমে মির্জা গোলাম আহমদের স্থলাভিষিক্ত কিংবা সাথীদেরকে 'আমীরুল মু'মেনীন' কিংবা সাহাবা কিংবা তার স্ত্রীকে 'উম্মুল মু'মেনীন' কিংবা তার পরিবারের লোকদেরকে 'আহলে বাইত' শব্দে অভিহিত করবে কিংবা নিজেদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলবে, তিন বছরের জেলা ও জরিমানা করা যেতে পারে।

এ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ অথবা আহমদীদের এমন প্রতিটি লোকেরও একই শাস্তি হবে যে নিজের ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে উপাসনার জন্য সমবেত করার লক্ষ্যে তেমনি আযান দেবে যেমন মুসলমানরা দিয়ে থাকে।

পাকিস্তান দন্ডবিধিতে ২৯৮ সি নামে আরো একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে যাতে করে উপরোল্লিখিত গ্রুপসমূহের মধ্য থেকে এমন প্রতিটি লোক যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যে কোনভাবে নিজে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করবে এবং নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে ইসলাম বলবে অথবা নিজের আকীদা-বিশ্বাসের তবলীগ বা প্রচার করবে অথবা অন্যান্যদেরকে নিজের ধর্ম গ্রহণ করার দাওয়াত দেবে কিংবা যে কোন ভাবে মুসলমানদের অনুভূতিকে উত্তেজিত করবে। সে এই শাস্তির যোগ্য হবে।

এ অধ্যাদেশ ফৌজদারী আইন ১৮৯৮-এর ৯৯ তম ধারারও পরিবর্তন সাধন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকারসমূহও এই এখতিয়ার লাভ করল যে, সে সরকার, এমন সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা

ও অন্যান্য পান্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে যেগুলো পাকিস্তান দন্ডবিধিতে বর্ধিত ধারার বিরোধিতা করে প্রকাশ করা হয়ে থাকবে।

এ অধ্যাদেশের আওতায় ১৯৬৩ সালের পাকিস্তান প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস অধ্যাদেশের ২৪ ধারারও সংশোধন করা হয়েছে, যাতে করে প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই এখতিয়ার লাভ করল যে, সেগুলো এমন যে কোন প্রেস বন্ধ করে দিতে পারবে যাতে পাকিস্তান দন্ডবিধির এই নতুন বর্ধিত সংশোধনীর বিরোধিতা করে কোন পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা মুদ্রণ করবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহের এ অধিকারও থাকল যে, যে সব পত্র-পত্রিকা আলোচ্য ধারার বিরোধিতা করবে সেগুলোর ডিক্লারেশন বাতিল করে দেবে এবং এমন সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারবে যেগুলো এ ধারার আলোকে ছাপা নিষিদ্ধ।

এ অধ্যাদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে। অধ্যাদেশের পাঠ নিম্নরূপ ঃ-

অধ্যাদেশ নং-২০/১৯৮৪

কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ ও আহমদীদেরকে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে আইনের সংশোধনী অধ্যাদেশ-

যেহেতু কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ ও আহমদীয়াদেরকে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত রাখার জন্য আইনের সংশোধন করাটা কল্যাণকর-

এবং যেহেতু মহামান্য প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত যে দেশে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যার প্রেক্ষিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুতরাং এইক্ষণ ৫ই জুলাই ১৯৭৭-এর ঘোষণা অনুযায়ী তাকে ক্ষমতাদানকারী সমস্ত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিম্ন বর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও প্রবর্তন করলেন।

প্রথম খণ্ড

সূচনা

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনের সূচনা ঃ

(১) এ অধ্যাদেশটি কাদিয়ানী গ্রুপ, লাহোরী গ্রুপ ও আহমদীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রতিরোধ ও দন্ড অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হবে। এবং

(২) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। অধ্যাদেশটি আদালতসমূহের নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের উপর প্রবল হবে

এ অধ্যাদেশের নির্দেশাবলী কোন আদালতের কোন নির্দেশ কিংবা সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বলবৎ থাকবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাকিস্তানের সামগ্রিক দন্ডবিধি (১৮৬০-এর এক্ট নং ৪৫)-এর সংশোধনী

৩। ১৮৬০ সালের ৪৫ তম এক্টে নতুন ধারাসমূহ ঃ
২৯৮ (খ) ও ২৯৮ (গ)-এর সংযোজন
পাকিস্তানের সমগ্র দন্ডবিধি (এক্ট নং ৪৫/১৮৬০) এর ১৫তম অধ্যায়ে ২৯৮ (ক) ধারার পর নিম্ন লিখিত ধারাসমূহের পরিবর্ধন করা হবে। অর্থাৎ-
২৯৮ (খ) ধারা কিছু মহান ব্যক্তিত্ব ও পবিত্র স্থানের জন্য নির্দিষ্ট পদবী, গুণাবলী কিংবা সম্বোধন প্রভৃতির অবৈধ ব্যবহার ঃ
(১) কাদিয়ানী গ্রুপ কিংবা লাহোরী গ্রুপ (যারা নিজেদেরকে "আহমদী" কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত করে থাকে)-এর কোন ব্যক্তি শব্দের মাধ্যমে তা মৌখিক হোক কি লিখিত অথবা দৃশ্য রেখার মাধ্যমে-
(ক) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা কিংবা সাহাবীকে ছাড়া কোন লোককে 'আমীরুল মু'মেনীন; 'খলীফাতুল মুমেনীন; খলীফাতুল মুসলেমীন; সাহাবী কিংবা 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'-এর পদবীতে সম্বোধন করবে-
(খ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহিয়সী কোন স্ত্রীকে ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে 'উম্মুল মু'মেনীন' হিসাবে গণ্য করে কিংবা সম্বোধন করে-
(গ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খান্দান (আহলে বাইত)-এর কোন সদস্যকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আহলে বাইত হিসাবে গণ্য করা কিংবা সম্বোধন করা-
(ঘ) নিজেদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' হিসাবে গণ্য করলে কিংবা অভিহিত করলে তাকে যে কোন এক প্রকার বন্দীত্বের শাস্তি এতটা সময়ের জন্য দেয়া যেতে পারবে যা তিন বছর দীর্ঘ হতে পারবে এবং সে জরিমানারও যোগ্য হবে।
(২) কাদিয়ানী গ্রুপ কিংবা লাহোরী গ্রুপ (যারা নিজেদেরকে আহমদী কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত করে থাকে)-এর কোন লোক যে শব্দের মাধ্যমে তা সে শব্দ মৌখিক হোক কিংবা লিখিত কিংবা দৃশ্যমান

রেখার মাধ্যমে নিজের ধর্মে উপাসনার জন্য আহ্বান জানাবার পন্থা কিংবা উপায়কে আযান হিসাবে অভিহিত করবে কিংবা এভাবে আযান দেবে যেমন মুসলমানরা দিয়ে থাকে তাহলে তাকে কোন এক প্রকার কারা ভোগের শাস্তি এতটা সময়ের জন্য দেয়া যেতে পারবে যা তিন বছর হতে পারবে এবং সাথে সাথে সে জরিমানা আদায়েও বাধ্য থাকবে।

২৯৮ (গ) কাদিয়ানী গ্রুপের যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলবে কিংবা নিজের ধর্মের প্রচার ও তবলীগ করবে

কাদিয়ানী গ্রুপ অথবা লাহোরী গ্রুপ (যারা নিজেদেরকে আহমদী কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত করে থাকে)-এর কোন লোক যদি নিজেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করে অথবা নিজের ধর্মমতকে ইসলাম হিসাবে অভিহিত কিংবা সম্বোধন করে কিংবা এ শব্দের মাধ্যমে তা লিখিত হোক কিংবা মৌখিক অথবা রৈখিক পন্থায় নিজের ধর্মমতের প্রচার বা তবলীগ করে কিংবা অন্যদেরকে নিজ ধর্মমত কবুল বা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেয় কিংবা যে কোন পন্থায় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে, তবে যে কোন এক প্রকার কারাবরণ শাস্তি দেয়া যাবে যা তিন বছর দীর্ঘ হবে এবং জরিমানাও দিতে বাধ্য থাকবে।

তৃতীয় খণ্ড

ফৌজদারী দন্ডবিধি ১৮৯৮

(এক্ট নং ৫/১৮৯৮-এর সংশোধিত)

৪। এক্ট নং ৫/১৮৯৮-এর ৯৯ ধারা (ক)-এর সংশোধনী সমগ্র ফৌজদারী বিধিমালা ১৮৯৮ এক্ট নং ৫/১৮৯৮-এর পরে যার উদ্ধৃতি উপরোল্লিখিত সংকলনে দেয়া হয়েছে তার ৯৯ ধারায় উপাধারা-১-এ

(ক) শব্দাবলী ও বিরতি "এ শ্রেণীর"-এর পর শব্দাবলী, সংখ্যা, বন্ধনী, বর্ণ ও যতি বা বিরতি-এ ধরনের কোন উপাদান যার উদ্ধৃতি পশ্চিম পাকিস্তান প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস অধ্যাদেশ ১৯৬৩-এর ২৪ ধারার উপধারা ১-এর "ই" অংশে দেয়া হয়েছে" অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে এবং

(খ) সংখ্যা ও বর্ণ "২৯৮-'ক'-এর পর শব্দাবলী, সংখ্যাসমূহ ও বর্ণ" কিংবা ২৯৮ খ-ধারা অথবা ২৯৮-গ ধারা অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক, মাদরাসায়ে দারুল উলুম, ৬ নং মীরপুরের মুহাদ্দিস মাওলানা আশিকুর রহমান কাসিমীর

আবেদন

বাংলাদেশে কাদিয়ানী তথা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর ব্যানারে আজ দীর্ঘ দিন যাবত সর্বব্যাপী আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে। যার কারণে প্রকৃত খত্‌মে নবুওয়ত আস্বীকারকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে কাফের ও ভন্ড এটা দেশবাসীর সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও গোটা দেশ ও জাতি-এর তীব্র প্রতিক্ষায় অপেক্ষমান ছিল যে, উক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ও খত্‌মে নবুওয়তের একজন উর্ধ্বতন দায়িত্বশীর ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি তত্ত্ববহুল গ্রন্থ উপস্থাপন করা হোক। আল্‌হামদুল্লিাহ্‌! আমার শ্রদ্ধাভাজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব, নামুসে খত্‌মে নবুওয়তকে সংরক্ষণ ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস তথা তাদের ভন্ডামীর মুখোশ উম্মোচন কল্পে "কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামক একটি তত্ত্ববহুল গ্রন্থ সংকলন করে সেই তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। এই গ্রন্থটি সম্পদ মনে করে সংগ্রহে রাখা উচিত। এর দ্বারা যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। সংকলক, সহায়কসহ সকলকে ইহ-পরকালীন কল্যাণ, মঙ্গল ও মুক্তি দান করুন। আ-মীন।

আশিকুর রহমান কাসিমী